রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিচিত্রা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিচিত্রা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০ ০০৭

প্রথম প্রকাশ :
২২শে শ্রাবণ, ১৩৬১

দ্বিতীয় প্রকাশ :
২রা আষাঢ়, ১৩৬৪

তৃতীয় প্রকাশ :
মহালয়া, ১৩৬৮
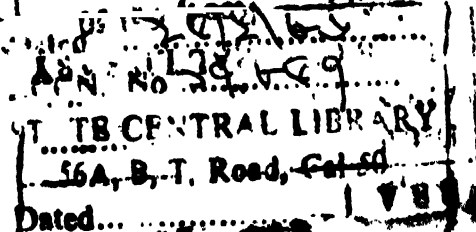
প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর :
সাধারণ প্রেস
১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

শ্রীমান্ সুধাংশুশেখর চক্রবর্তী

ও

শ্রীমতী চিরশ্রী চক্রবর্তী

চিরস্নেহনিলয়েষু

চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকা

রবীন্দ্র-বিচিত্রা এবারে পরিবর্ধিত আকারে রবীন্দ্র-সাহিত
বিচিত্রা নাম গ্রহণ করিল। ইহার বিশেষ কারণ আছে।

এতদিন গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধের
ছিল। এবারে একটি পরিকল্পনা অনুসারে ইহা বিন্যস্ত হইয়াছে

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার সম্যক ধারণা দিতে পা
এমনভাবে প্রবন্ধগুলি সজ্জিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাং
নিমিত্ত অন্য গ্রন্থে প্রকাশিত কয়েকটি নিবন্ধ এই গ্রন্থে মুদ্রিত হ
যাহাতে ইহা পাঠ করিলে পাঠক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মোটা
একটি ধারণা করিতে পারে। বলাবাহুল্য, এই ইচ্ছা সত্ত্বেও
পূর্ণাঙ্গ হয় নাই। আশা আছে, পরবর্তী সংস্করণে রবীন্দ্রনাথে
জীবন, সঙ্গীত ও চিত্রকলা সম্বন্ধে কয়েকটি নিবন্ধ গ্রথিত ক
গ্রন্থখানিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিব। তবে ইহা আশা
বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ হইল।

এই গ্রন্থ প্রকাশে অধ্যাপক শ্রীমান্ অরুণকুমার বসু এম.
পি. আর. এস-এর সাহায্য বিশেষভাবে স্মরণীয়।

গ্রন্থক

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

কয়েকটি প্রবন্ধ অন্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়ায় বাদ দে
হইল। তেমনি আবার নূতন দুটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইল। বই
কলেবর পূর্ববৎ রহিল।

গ্রন্থক

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বর্তমান সংস্করণে সাতটি নূতন প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হই

গ্রন্থক

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে বিচিত্র প্রবন্ধের সমষ্টি, তাই গ্রন্থের নাম রবীন্দ্র-বিচিত্রা।

প্রবন্ধগুলি গত ১৫।১৬ বছরের মধ্যে নানা সময়ে নানা উপলক্ষ্যে লিখিত।

'শেষের কবিতা' প্রবন্ধটির রচনাকাল খুব সম্ভব ১৯৩৮ বা ১৯৩৯ সাল।

'রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র' প্রবন্ধটি যখন লিখিত হয়, তখনো রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র পর্যায়ের পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত হয় নাই। চিঠিপত্র পাঁচ খণ্ড পড়িয়াছি কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করিতেছি না।

'জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা' প্রবন্ধটি অন্য নামে গ্রন্থান্তরে ছিল। এক্ষণে উহা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হইয়া রবীন্দ্র-বিচিত্রায় গ্রথিত হইল।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

রচনার উৎস-বিষয়ক

১। রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার

রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী কাব্যখানির জনপ্রিয়তা সার্বভৌমিক। এই জনপ্রিয়তার অনেক কারণ। রচনার সৌষ্ঠব ও কাহিনীর আকর্ষণ তন্মধ্যে প্রধান। আরও একটি কারণ, কাব্যখানি বাল্যকালেই ছেলেমেয়েদের হাতে পৌঁছয়। তরুণ মন পূর্বসংস্কার-মুক্ত, নূতন সংস্কার তখনো দাগ কাটে নি, এমন সময় এই একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য হাতে পৌঁছে যে কেবল তাদের মনোহরণ করে নেয় তা নয়, বাল্যজীবনের মধুর স্মৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কাব্যখানির স্মৃতি ও মাধুর্য পরবর্তী জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকে। কমপক্ষে আজ চল্লিশ বছর ধরে বাঙালি ছেলেমেয়েদের জীবনে কাব্যের তথা অনেকাংশে ভারতেতিহাসের প্রথম ধারণা সৃষ্টি ক'রে চলেছে রবীন্দ্রনাথের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যখানি। এ গেল হিসাব-নিকাশে লাভের অঙ্ক, ক্ষতির অঙ্কেও কিছু জমা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের আর সমস্ত কাব্য নিয়েই সমালোচকগণ আলোচনা করেছেন, তাদের অন্ধিসন্ধি ঘেঁটে রবীন্দ্রপ্রতিভার নাড়ীনক্ষত্র নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ কাব্যখানির দিকে তেমন ভাবে কারো নজর পড়ে নি বললেই চলে। কেন? প্রথম কারণ, কাব্যখানির সহজবোধ্যতা। স্বচ্ছ জল গভীর নয় মানুষের জন্মগত সংস্কার, ওর মধ্যে আর খুঁজবার আছে কি? দ্বিতীয় কারণ, বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক রূপে ওর খ্যাতি। বিদ্যালয়ে পাঠ্য হলেই বইয়ের যেন জাত যায়, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাকে গবেষণার অযোগ্য মনে ক'রে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। প্রধানত এই দুটি কারণেই কথা ও কাহিনী কাব্যখানি সমালোচকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

আজকার প্রবন্ধে কথা ও কাহিনীর অন্তর্গত কথাকাব্যের সবিচার করবার ইচ্ছা আমাদের নেই। যদিচ রসবিচারই কাব্য-

আলোচনার শেষ লক্ষ্য এবং রসের উৎকর্ষের উপরেই কাব্যের স্থায়ী নির্ভর, তবে অন্য প্রকার বিচারও সম্ভব। তুলনায় গৌণ হলেও সে বিচারের মূল্য কম নয়। অন্য নামের অভাবে তাকে বস্তুবিচার বলা যেতে পারে। আজ কথাকাব্যের বস্তুবিচার আমাদের লক্ষ্য।

আর অধিক অগ্রসর হওয়ার আগে বস্তুবিচার শব্দটির তাৎপর্য পরিষ্কার করে নেওয়া আবশ্যক। কথা ও কাহিনীর অন্তর্গত কথা-কাব্যের কবিতাগুলির বস্তু উপনিষদ, পুরাণ ও ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। মূল কাহিনী বা বস্তু কবির অভিপ্রায় ও আদর্শ -অনুসারে রূপান্তরিত হয়েছে তাঁর হাতে। ধরে নিলে অন্যায় হবে না যে, মূল কাহিনীর অনেকগুলিই মূল কবি বা ইতিহাসবেত্তার হাতে তাঁদের অভিপ্রায় ও আদর্শ -অনুসারে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছিল আমরা জানি না, জানি যা মূল কবি জানিয়েছেন। ঐ জানার মধ্যে রয়ে গিয়েছে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে লেখকদের অভিপ্রায়। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম খাটে। ঐতিহাসিক যতই নিরপেক্ষ হোন তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর কালের ব্যক্তিত্বকে ছাড়িয়ে বেশি দূর উঠতে পারেন না। এই দুই প্রকার ব্যক্তিত্বের অগোচর ও সগোচর মিশলে গড়ে ওঠে তাঁর লিখিত ইতিহাস। ঐতিহাসিক গীবন অষ্টাদশ শতকের সংশয়বাদের আবহাওয়ায় বসে রোমসাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস লিখেছিলেন বলেই তা এক বিশিষ্ট মূর্তি নিয়েছে। তিনি মেকলের কালে বসে ঐ ইতিহাস লিখলে ঘটনার ধ্রুবত্ব সত্ত্বেও তাঁর ইতিহাসের রস নিশ্চয় ভিন্ন হত। রবীন্দ্রকাব্য থেকেই একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কথাকাব্যের বন্দীবীর রচনাটির সময় ১৮৯৯ সাল আর শেষসপ্তকের অন্তর্গত তেত্রিশ-সংখ্যক শিখ কবিতাটির রচনাকাল তার অনেক পরে, ১৯৩৫ সাল (শেষসপ্তক কাব্য প্রকাশের সময়), মাঝখানে ছত্রিশ বছরের ব্যবধান। দুটি কবিতারই মূল ঘটনা বা বস্তু ইতিহাসের একই বিশেষ পর্ব থেকে গৃহীত। তবু দুয়ে

রসের প্রভেদ দেখতে পাই তার কারণ, ইতিমধ্যে কালের ব্যক্তিত্বের বদল হয়েছে, সেই সঙ্গে কবির ব্যক্তিত্বেরও। আবার কালের বদলে রসের বদল হয় নি এমন কবিতাও আছে কথাকাব্যে। পূজারিনী ও পরিশোধ দুটি কবিতাই ১৮৯৯ সালে লিখিত, যথাক্রমে এদের রূপান্তর নটীর পূজা (১৯২৬) ও শ্যামা (১৯৩৯) অনেক পরে লিখিত। দুই জায়গাতেই নাটকের অনুরোধে রূপের বদল হয়েছে, রসের বদল হয় নি। খুব সম্ভব এখানে বস্তুর মধ্যে এমন-কিছু ধ্রুবত্ব আছে যা কালের ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করতে সমর্থ। বদলের ক্ষেত্রেও যেমন কবির পরিচয় আছে, অবদলের ক্ষেত্রেও তেমনি আছে। কাব্যের মধ্যে থেকে কবির পরিচয়-সংগ্রহ শিক্ষাপ্রদ ও কৌতূহলজনক আলোচনা। এইভাবে সংগৃহীত পরিচয় তাঁর পরিজ্ঞাত জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে মিলবে, অনেক সময়ে মিলবে না। "কবির জীবনচরিতে" কবিকে সন্ধান করতে যে নিষেধাজ্ঞা তিনি প্রচার করেছেন তা কেউ শোনে নি, শুনবে এমন ভরসাও দেখি না, তবে ঐ নিষেধাজ্ঞার পরিপূরক ভাবে কবিকে কাব্যের মধ্যেও সন্ধান আবশ্যক। আর এই দুই রকম সন্ধানের ফল হচ্ছে গিয়ে কবির যথার্থ জীবনচরিত। এ ক্ষেত্রে যে-উদ্দেশ্যে আমরা কথা-কাব্যের বস্তুবিচারে উদ্যত হয়েছি তা ঐ কাব্যের মধ্যে কবির পরিচয় অর্থাৎ তাঁর অভিপ্রায় ও আদর্শের পরিচয় সংগ্রহ। "কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।" এই ঋষিবাক্য সর্বদা মনে রেখে এ কাজে অগ্রসর হতে হবে।

কথাকাব্যে চব্বিশটি কবিতা আছে, মুখপাতের কথা কও কবিতাটি ছেড়ে দিলে চব্বিশটি। কবিতাগুলির মূল কাহিনী বা বস্তু প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বা ইতিহাসগ্রন্থ থেকে গৃহীত। উপনিষদ থেকে গৃহীত একটি, ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে গৃহীত তিনটি, বৌদ্ধপুরাণ থেকে গৃহীত আটটি, রাজপুত ইতিহাস থেকে গৃহীত ছয়টি, শিখ ইতিহাস

থেকে গৃহীত চারটি এবং মারাঠা ইতিহাস থেকে গৃহীত দুটি
মূল কাহিনী বা বস্তু। কাহিনী খণ্ডের অন্তর্গত নিষ্ফল উপহার
কবিতাটির বস্তু শিখ ইতিহাস থেকে গৃহীত, রসের ও রক্তের বিচারে
কবিতাটির স্থান কথা খণ্ডে হওয়া উচিত, কেন যে কাহিনী খণ্ডে
হল জানি না। গুরুগোবিন্দ ও নিষ্ফল উপহার দুটি কবিতাই
মূলে মানসী কাব্যের অন্তর্গত, গুরুগোবিন্দ কথা খণ্ডে স্থান
পেয়েছে, অন্যটিরও স্বাভাবিক স্থান সেখানে। কবিতাগুলিকে
পরিশিষ্টে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দেওয়া হল, প্রয়োজনবোধ করলে
কৌতূহলী পাঠক দেখতে পারেন। কাহিনী খণ্ডের নিষ্ফল
উপহারকে ধরলে চব্বিশের জায়গায় পঁচিশটি হবে। বস্তুবিচার
উপলক্ষে বস্তুসাম্যে কবিতাটির আলোচনা কথাকাব্যের সঙ্গে সেরে
নেব আমরা।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন জাগে। বৈদিককাল থেকে
শুরু করে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগকে স্পর্শ করে আধুনিক যুগের
সীমান্ত পর্যন্ত চলে এসেছেন কবি। কিন্তু সাতশো বছরের পাঠান
ও মোগল পর্ব সম্বন্ধে তিনি নীরব। কোনো কোনো কবিতায়—
যেমন মানী কবিতায়, মোগল-শাসনের উল্লেখ আছে, তবে তা
নিতান্ত উল্লেখ মাত্র। সাতশো বছরের সুদীর্ঘ পর্বটা তিনি এড়িয়ে
গেলেন কেন, কিম্বা পর্বটা তাঁকে এড়িয়ে গেল কেন? প্রকৃত
উত্তর কি জানি না, তবে খুব সম্ভব শব্দের ও অর্থের বিচারে এ
নীরবতার রহস্য ভেদ সম্ভব। মোগলযুগের আবহাওয়া সৃষ্টির জ
ফার্সি শব্দের আবশ্যক। যে কারণেই হোক ফার্সি শব্দ সম্বন্ধে
রবীন্দ্রনাথের একটা অনীহা ভাব ছিল। এই হল শব্দের বিচার
অর্থের বিচার একটু গভীর। মোগল-শাসনের তাৎপর্য বা অ
সম্বন্ধে, ভারতের ইতিহাসে তার প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্বন্ধে
খুব সম্ভব তিনি অনুকূল মত পোষণ করতেন না, এ শাস
জাতিসত্তার পরিপোষক নয় বলেই হয় তো তিনি মনে করতেন

এই সঙ্গে যখন দেখতে পাই যে, রাজপুত মারাঠা ও শিখ শক্তি যারা মোগল-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, লড়াই করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে ফেলে জাতীয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে তাদের সম্বন্ধে কবির প্রশংসার অন্ত নাই— তখন এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়।

আরও একটি প্রশ্ন—বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর নীরবতার কারণ কি? খুব সম্ভব তিনি যখন লিখছিলেন, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস তখন পরিজ্ঞাত ছিল না। যেটুকু পরিজ্ঞাত ছিল সে বিষয়ে তাঁর ধারণা প্রতাপাদিত্য চরিত্র অঙ্কন থেকেই বুঝতে পারা যাবে। স্বদেশী আমলের প্রতাপাদিত্য আর তার পূর্ববর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত প্রতাপাদিত্য চরিত্রের মধ্যে এখন প্রমাণ হয়েছে যে শেষেরটাই ইতিহাস-সম্মত। তবে বাঙালি পাঠক খুশি হয় নি প্রায়শ্চিত্ত নাটকে। এই উপেক্ষিত নাটকখানি থেকে উদ্ধার পেয়ে এবং মুক্তধারা নাটকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ধনঞ্জয় বৈরাগী বাঙালির মনে গৌরবের আসন লাভ করেছে। যাই হোক কথা-কাব্যে মোগল-ইতিহাস ও বাঙলার ইতিহাসের বস্তুর অভাব লক্ষ্য করবার ও ভাববার বিষয়।

আরও একটি অনতিগৌণ বিষয়ের জন্য পাদটীকার উপরে নির্ভর অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বিদ্যুৎগতির একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ কথাকাব্য। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি উচ্চ কোটির কবিতার প্রণয়ন সত্যই বিস্ময়জনক। সাধারণভাবে রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে বর্তমান প্রসঙ্গে এই ধরণের বিচার আবশ্যক আছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

২

ব্রাহ্মণ কবিতাটির বস্তু বা মূল আখ্যায়িকা ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ড থেকে গৃহীত। মূল আখ্যায়িকা প্রথমে

থেকে গৃহীত চারটি এবং মারাঠা ইতিহাস থেকে গৃহীত দুটি মূল কাহিনী বা বস্তু। কাহিনী খণ্ডের অন্তর্গত নিষ্ফল উপহার, কবিতাটির বস্তু শিখ ইতিহাস থেকে গৃহীত, রসের ও রক্তের বিচারে কবিতাটির স্থান কথা খণ্ডে হওয়া উচিত, কেন যে কাহিনী খণ্ডে হল জানি না। গুরুগোবিন্দ ও নিষ্ফল উপহার দুটি কবিতাই মূলে মানসী কাব্যের অন্তর্গত, গুরুগোবিন্দ কথা খণ্ডে স্থান পেয়েছে, অন্যটিরও স্বাভাবিক স্থান সেখানে। কবিতাগুলিকে পরিশিষ্টে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দেওয়া হল, প্রয়োজনবোধ করলে কৌতূহলী পাঠক দেখতে পারেন। কাহিনী খণ্ডের নিষ্ফল উপহারকে ধরলে চব্বিশের জায়গায় পঁচিশটি হবে। বস্তুবিচার উপলক্ষে বস্তুসাম্যে কবিতাটির আলোচনা কথাকাব্যের সঙ্গে সেরে নেব আমরা।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন জাগে। বৈদিককাল থেকে শুরু করে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগকে স্পর্শ করে আধুনিক যুগের সীমান্ত পর্যন্ত চলে এসেছেন কবি। কিন্তু সাতশো বছরের পাঠান ও মোগল পর্ব সম্বন্ধে তিনি নীরব। কোনো কোনো কবিতায়—যেমন মানী কবিতায়, মোগল-শাসনের উল্লেখ আছে, তবে তা নিতান্ত উল্লেখ মাত্র। সাতশো বছরের সুদীর্ঘ পর্বটা তিনি এড়িয়ে গেলেন কেন, কিম্বা পর্বটা তাঁকে এড়িয়ে গেল কেন? প্রকৃত উত্তর কি জানি না, তবে খুব সম্ভব শব্দের ও অর্থের বিচারে এই নীরবতার রহস্য ভেদ সম্ভব। মোগলযুগের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য ফার্সি শব্দের আবশ্যক। যে কারণেই হোক ফার্সি শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা অনীহা ভাব ছিল। এই হল শব্দের বিচার। অর্থের বিচার একটু গভীর। মোগল-শাসনের তাৎপর্য বা অর্থ সম্বন্ধে, ভারতের ইতিহাসে তার প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্বন্ধে খুব সম্ভব তিনি অনুকূল মত পোষণ করতেন না, এ শাসন জাতিসত্তার পরিপোষক নয় বলেই হয় তো তিনি মনে করতেন।

এই সঙ্গে যখন দেখতে পাই যে, রাজপুত মারাঠা ও শিখ শক্তি যারা মোগল-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, লড়াই করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ধ্বংস করে ফেলে জাতীয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে তাদের সম্বন্ধে কবির প্রশংসার অন্ত নাই—তখন এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়।

আরও একটি প্রশ্ন—বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর নীরবতার কারণ কি? খুব সম্ভব তিনি যখন লিখছিলেন, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস তখন পরিজ্ঞাত ছিল না। যেটুকু পরিজ্ঞাত ছিল সে বিষয়ে তাঁর ধারণা প্রতাপাদিত্য চরিত্র অঙ্কন থেকেই বুঝতে পারা যাবে। স্বদেশী আমলের প্রতাপাদিত্য আর তার পূর্ববর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত প্রতাপাদিত্য চরিত্রের মধ্যে এখন প্রমাণ হয়েছে যে শেষেরটাই ইতিহাস-সম্মত। তবে বাঙালি পাঠক খুশি হয় নি প্রায়শ্চিত্ত নাটকে। এই উপেক্ষিত নাটকখানি থেকে উদ্ধার পেয়ে এবং মুক্তধারা নাটকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ধনঞ্জয় বৈরাগী বাঙালির মনে গৌরবের আসন লাভ করেছে। যাই হোক কথা-কাব্যে মোগল-ইতিহাস ও বাঙলার ইতিহাসের বস্তুর অভাব লক্ষ্য করবার ও ভাববার বিষয়।

আরও একটি অনতিগৌণ বিষয়ের জন্য পাদটীকার উপরে নির্ভর অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বিদ্যুৎগতির একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ কথাকাব্য। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি উচ্চ কোটির কবিতার প্রণয়ন সত্যই বিস্ময়জনক। সাধারণভাবে রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে বর্তমান প্রসঙ্গে এই ধরণের বিচার আবশ্যক আছে। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

২

ব্রাহ্মণ কবিতাটির বস্তু বা মূল আখ্যায়িকা ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ড থেকে গৃহীত। মূল আখ্যায়িকা প্রথমে

উদ্ধার করে দিচ্ছি, তার পরে ব্রাহ্মণ কবিতাটির সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনা করা যাবে।

একদা সত্যকাম জাবাল জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে পূজনীয়ে, আমি ব্রহ্মচর্যাবলম্বনে (গুরুগৃহে) বাস করিতে চাই; (সুতরাং) জিজ্ঞাসা করি, আমি কোন্ গোত্রীয়?' জবালা তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি কোন্ গোত্রীয়, তাহা আমি জানি না। বহুকর্মব্যাপৃতা ও বহুপরিচর্যানিরতা (বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে) আমি তোমায় যৌবনে পাইয়াছিলাম; সুতরাং তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা জানিতে পারি নাই। তবে আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম, সুতরাং তুমি সত্যকাম জাবাল বলিয়াই পরিচয় দিও।' তিনি হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গিয়া বলিলেন, 'আমি ভবৎসমীপে ব্রহ্মচর্য-বাস করিব; মহাশয়কে আচার্যরূপে পাইতে চাই।' গৌতম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সৌম্য, তুমি কোন্ গোত্রীয়?' তিনি বলিলেন, 'মহাশয় আমি কোন্ গোত্রীয়, তাহা জানি না। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, বহুকর্মব্যাপৃতা ও পরিচারণশীলা আমি তোমায় যৌবনে পাইয়াছিলাম; সুতরাং তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা জানিতে পারি নাই। তবে আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম। সুতরাং মহাশয়, আমি সত্যকাম জাবাল।' (আচার্য) সত্যকামকে বলিলেন, 'এইরূপ বাক্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে বলিতে পারে না। হে সৌম্য, সমিধ আহরণ কর, আমি তোমায় উপনীত করিব; কারণ তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই।'...[১]

নিরলঙ্কার এই আখ্যায়িকাকে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ কাব্যের

১ উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা।

সম্মান দিয়েছেন। তিনি বলছেন, "আপনারা সকলেই অবগত আছেন, জবালাপুত্র সত্যকামের কাহিনী অবলম্বন ক'রে আমি একটি কবিতা রচনা করেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য বলে মেনে নিতে একটুও বাধে নি। উপাখ্যান মাত্র—কাব্যবিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হতে পারেন; কারণ এ তো অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয় নি। আমি বলি, হয় নি বলেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হত তবে হালকা হয়ে যেত।"[২]

কবির এই অকারণ আত্মনিগ্রহের কারণ সহজে অনুমেয় নয়। ছন্দে রচিত ব্রাহ্মণ কবিতাটি কিছুমাত্র হাল্কা হয় নি বরঞ্চ কোনো কোনো অংশে মূলের চেয়ে স্পৃহনীয়তর হয়ে উঠেছে। মূলে আছে সত্যকাম গোড়াতেই গোত্ররহস্য জেনে নিয়ে ঋষির আশ্রমে যাত্রা করেছে, ব্রাহ্মণ কবিতায় গোত্ররহস্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমবারে সত্যকাম গোত্র বলতে পারে নি, ফিরে এসে জেনে নিয়েছে, দ্বিতীয়বারে গিয়ে জানিয়েছে। গোত্র না জেনে আসা যে উচিত হয় নি, এই গ্লানি নিয়ে ফিরে এল সত্যকাম, কিন্তু তখন জানত না যে গুরুতর গ্লানি তার জন্যে অপেক্ষা করছে। পরদিন গিয়ে সত্যকাম প্রকৃত ঘটনা জানালো গৌতমকে। গোত্র সম্বন্ধে মাতা ও পুত্রের সত্যনিষ্ঠা কবিতাটির প্রাণ। কাজেই এই ঘটনাটি কিছু বিস্তারিত হওয়ায় তার উপরে কল্পনার আলো বেশি পড়বার সুযোগ পেয়েছে। আখ্যায়িকাকার এ ভাবে লিখবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি, কেননা সে যুগে কোনো বালক গোত্র না জেনে নিয়ে গুরুগৃহে যাত্রা করবে না। এ যুগের কবি সে যুগের সংস্কারে বদ্ধ নন, বিশেষ তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে মাতা, পুত্র এবং প্রসঙ্গতঃ

২ গদ্যকাব্য, সাহিত্যের স্বরূপ, ২য় সংস্করণ।

ঋষির সত্যনিষ্ঠা প্রদর্শন, সেই জন্যেই গোত্ররহস্যের উপরে কিছু বেশি আলো নিক্ষেপ করতে হয়েছে।

তবে কিনা উপনিষদের সরল নিরলঙ্কার আখ্যায়িকার সঙ্গে এ যুগের ছন্দোবদ্ধ কবিতার যে তুলনা কবি করেছেন তা সমীচীন মনে হয় না। উপনিষদের আখ্যায়িকাকার সৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে রসাত্মক বাক্য রচনা করেন নি, অহেতুকতা তাঁর লক্ষ্য নয়, তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা বা উপদেশদান তাঁর সচেতন লক্ষ্য; এ কালের কাব্যের লক্ষ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরকম ক্ষেত্রে প্রকাশের রীতিও স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। উপনিষদের রীতি সূত্রাত্মক, ওর সংহতির মধ্যে অলঙ্কারের স্থান কোথায়? এ কালের কাব্য ডালপালা মেলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে নেয়—যদি-বা ওর মূলে কোনো তত্ত্ব থাকে তবে তা মূলের মতোই গুপ্ত থাকতে বাধ্য। এ হেন অবস্থায় তুলনা করলে অবিচার অবশ্যম্ভাবী, এখানে অবশ্য অবিচারটা কবির আত্ম-পক্ষে ঘটেছে।

৩

কথাকাব্যে বৌদ্ধপুরাণ থেকে গৃহীত বস্তু অবলম্বনে কবিতার সংখ্যা আটটি, সবচেয়ে বেশি। এ কেবল আকস্মিক মনে হয় না। বুদ্ধকে মানব-অভিব্যক্তির শ্রেষ্ঠ পুরুষ মনে করেন রবীন্দ্রনাথ।[৩] বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এ যুগে তিনি নূতন চেতনা এনেছেন, কাজেই বৌদ্ধপুরাণ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ স্বাভাবিক। আর খুব সম্ভব এই কারণেই এ বিষয়ে লিখিত কবিতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

মূল্যপ্রাপ্তি কবিতাটির বস্তু অবদানশতক থেকে গৃহীত। সে বস্তু এইরূপ:

> যখন প্রভু জেতবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, শ্রাবস্তীর এক মালী রাজাকে উপহার দিবার উদ্দেশ্যে একটি বিরাট পদ্মফুল

৩ 'বুদ্ধদেব' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনিয়াছিল। একজন ভক্ত তাহার মূল্য জানিতে চাহিল। ঠিক সেই সময়েই আসিলেন অনাথপিণ্ডদ এবং তাহার দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাহিলেন। অবশেষে, পরস্পরের দরাদরিতে তাহার মূল্য একশো গুণ বৃদ্ধি পাইল। তখন মালী বুদ্ধ সম্পর্কে খোঁজ করিল এবং অনাথপিণ্ডদের মুখে তাঁহার মহাশক্তির পরিচয় শুনিয়া সে ভগবান বুদ্ধকে ফুলটি উপহার দিল। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মফুলটি একটি বিরাট (গাড়ির) চক্রের আকার ধারণ করিল এবং বুদ্ধের মাথার উপর ঘিরিয়া রহিল। মালী ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং মহাজ্ঞানের জন্য উপদেশ ভিক্ষা করিল।

মোটের উপরে বস্তুকে অনুসরণ করেই কবিতাটি লিখিত, তবে যেখানে কবি পরিবর্তন করেছেন সেখানে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। কবিতায় গল্পটি শীতের, অকালের পদ্ম না হলে কিনবার জন্য এত দরাদরি কেন হবে? মূলে আছে দরাদরি একজন তীর্থিক ও অনাথপিণ্ডদের মধ্যে। সাধুপুরুষদের এ হেন আকিঞ্চন শোভন নয়, তাই কবি কল্পনা করেছেন একজন পথিক ও রাজার মধ্যে দরাদরি চলছে। সুদাস নামটিও কবি-কর্তৃক প্রদত্ত। সবশেষের পরিবর্তনটুকুই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মূলে আছে পদ্মটি বুদ্ধের মাথার উপরে উঠে বিরাট চাকার আকার ধারণ করল, মালীর যেন তাই দেখে তথাগতের মহিমা সম্বন্ধে চৈতন্য হল, তখন সে মহাজ্ঞান ভিক্ষা করল।[৪] পুরাণকার এরকম অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু এ যুগের কবির পক্ষে এরকম কল্পনা সম্ভব নয়, আবশ্যকও নেই, কারণ এ যুগ অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী না হয়েও মহাপুরুষের বিভূতি সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করতে সক্ষম। বুদ্ধ

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন-প্রশান্ত-মনে
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।

---

৪ অবদানশতক, পৃ ২০ (*The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, Ed. Rajendralal Mitra)।

দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।

এ কি যথেষ্ট নয়? বুদ্ধ যখন মালীর প্রার্থনা জানতে চাইলেন সে বলল, "প্রভু, আর কিছু নহে, চরণের ধূলি এক কণা।" মহাজ্ঞানভিক্ষাও ভিক্ষা বই নয়, তার মধ্যেও অহং-এর লীলা; মালীর পরিবর্তন তার চাইতেও বেশি হল, সমস্ত প্রার্থনা ভুলিয়ে দিয়েছে অমৃতরাশিবর্ষণে। মূলে আছে যে, মালী অনাথপিণ্ডদের মুখে বুদ্ধের মহাশক্তির কথা অবগত হয়েছিল, কাজেই কতকটা প্রস্তুত ছিল; কবিতায় এসব নেই, সে ভেবেছিল বুদ্ধকে ফুলটি দিলে "আরো পাব কত।" কাজেই বুদ্ধসন্দর্শনে মালীর পরিবর্তন মূলের চেয়ে কবিতাটিতে গুরুতর। মূলবস্তু ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে লিখিত; মূল্যপ্রাপ্তি কাব্য; উল্লিখিত পরিবর্তনসমূহের ফলে প্রচারের কাব্যত্ব লাভ ঘটেছে। এইসব পরিবর্তনের মধ্যে আসল কথাটা হচ্ছে এ যুগের সেই দৃষ্টি যা প্রত্যয়তঃ অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস পোষণ না করেও মানুষের মহত্ত্বকে স্বীকার করতে সমর্থ।

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কবিতাটির বস্তু আরও সংক্ষিপ্ত, আরও অকিঞ্চিৎকর।

রাজ্যের জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত অনাথপিণ্ডদ রাজার নিকট হইতে ভগবানের জন্য ভিক্ষা করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। হস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া গমন করিতে করিতে তিনি প্রতিবেশীদের নিকট হইতে বহুমূল্য অলঙ্কার প্রভৃতি ভিক্ষারূপে পাইলেন। একটি ঝোপের আড়াল হইতে এক দরিদ্র রমণী তাহার একমাত্র সম্বল দেহের আচ্ছাদন (বস্ত্র) -খানি হস্তীর উপর ছুঁড়িয়া দিল। অনাথপিণ্ডদ তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে মূল্যবান ভূষণে ভূষিত করিলেন। সেই রমণী তখন ভগবানের নিকট গমন করিয়া সত্যজ্ঞান বা প্রজ্ঞালাভ করিল।[৫]

---

৫ অবদানশতক, পৃ ৩৩, S. B. L. N.

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কবিতাটি যার মনে আছে—কার না আছে—তিনি অনায়াসে বুঝতে পারবেন প্রতিভার স্পর্শে লোহা সোনা এবং প্রচার কাব্য হয়ে উঠেছে। সেই দরিদ্র রমণীকে মূল্যবান ভূষণে সজ্জিত করে বুদ্ধের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং তার প্রজ্ঞালাভ প্রচারের পক্ষে আবশ্যক হতে পারে, কাব্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কবিতাটির স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি কবি যেখানে থেমেছেন—

চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর
সঁপিতে বুদ্ধের চরণনখর-আলোকে।

তার পরে সেই দরিদ্রা রমণী প্রজ্ঞালাভ করল কি না, বা কি করে লোকালয়ে ফিরে গেল, কাব্যের পক্ষে তা অবান্তর।

এবারে সামান্য ক্ষতি কবিতাটির বিষয়বস্তু বা বস্তু দেখা যাক।

যখন ভগবান কুলমাষদম্যতে (Kulmashadamya) ছিলেন, মাকণ্ডিক (Mākandika) নামে একজন ঋষি তাঁহার কন্যা অনুপমাকে বিবাহের জন্য ভগবানের কাছে সমর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু ভগবান তাহা গ্রহণ করেন নাই। তখন এক বৃদ্ধ মেয়েটিকে গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু পিতা তাহার সহিত বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইল। ভগবান বলিলেন, "তাকে যে এই প্রথমবার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম, তা নয়।" এবং পরবর্তী কহিনীটি বর্ণনা করিলেন।

পূর্বে এক কর্মকার তাহার কন্যাকে (তাহার শিল্পে) সর্বাপেক্ষা দক্ষ কর্মীর হাতে সমর্পণ করিতে মনস্থ করেন। একটি তরুণ সেই কর্মকারের কাছে কাজ শিখিয়া বিশেষ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—সে প্রভুর নিকট তাহার কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে প্রত্যাখ্যাত হইল। ভগবানই ছিলেন সেই যুবক এবং সেই কর্মকার মাকণ্ডিক।

কেন সেই বৃদ্ধের অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহার

কারণ ব্যাখ্যা করিবার জন্য ভগবান একটি কাহিনী বলিলেন…। কাহিনীতে শোনা যায়, প্রত্যাখ্যান করিবার পর মাকণ্ডিক কৌশাম্বীতে গমন করিয়া রাজা উদয়নকে স্বীয় কন্যা দান করেন এবং নিজেই রাজার প্রধান মন্ত্রী হন। একদা রাজা যখন শত্রুর সহিত যুদ্ধে গমন করেন, অনুপমা অন্দরমহলে আগুন লাগাইয়া দিল এবং সেই আগুনে প্রধানা মহিষী শ্যামাবতী সহ পাঁচ শত রাজমহিষী প্রাণ হারাইলেন। রাজা উদয়ন এই পাঁচশত স্ত্রীর কাহিনী জানিতে চাহিলে ভগবান বলিলেন, পূর্বে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পাঁচ শত স্ত্রী ছিল। একদা তাহারা আমোদ-প্রমোদের জন্য উদ্যানে বেড়াইতে গিয়াছিল। নিকটবর্তী নদীতে স্নান করিবার পর তাহারা শীতবোধ করিল। তীরবর্তী এক কুটির দেখিয়া প্রধান রানী তাঁহার এক দাসীকে সেই কুটিরে অগ্নিসংযোগ করিতে আদেশ দিলেন। দাসী তাঁহাকে জানাইল যে, সেই কুটিরে একজন ঋষি বাস করেন। রানী তাহার কথায় কান তো দিলেনই না, বরং তাহাকে আদেশ পালন করিতে বলিলেন; অন্যান্য রানীরাও তাঁহাকে সমর্থন করিলেন। কুটির পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কুটির হইতে বাহির হইয়া ঋষি আকাশে উঠিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে বলিলেন যে, কৃত পাপের জন্য তাঁহারা যেন শাস্তি পান কিন্তু তার পর যেন প্রজ্ঞালাভ করেন। শ্যামাবতী এবং তাঁহার অনুচরীবৃন্দ ছিলেন সেই পূর্বকালের রমণীবৃন্দ।[৬]

উদ্ধৃত আখ্যায়িকার শেষাংশ অবলম্বনে সামান্য ক্ষতি কবিতাটি রচিত। আখ্যায়িকায় জাতক-কাহিনীর সমস্ত গুণ বর্তমান—প্রভুর পূর্বজন্মের বিবরণ, রানী অনুপমা কর্তৃক ঋষির গৃহদাহের পাপের জন্য শাস্তিপ্রার্থনা, পরে প্রজ্ঞাপ্রার্থনা এবং ঋষির অতিপ্রাকৃত আচরণ।

রবীন্দ্রনাথ শুধু গৃহদাহের ঘটনাটি রেখেছেন, কিন্তু সে গৃহ ঋষির

---

৬ দিব্যাবদানমালা, শ্যামাবতীর কাহিনী, পৃষ্ঠা ৩১৩, S. B. L. N.

নয়, দরিদ্র প্রজাদের। আর রানীকে শাস্তির জন্য নিয়তির উপরে নির্ভর করতে হয় নি, প্রজাদের নালিশের উত্তরে স্বয়ং রাজা দণ্ডের ভার গ্রহণ করেছেন, আর সে দণ্ড বড় নির্মম।

বৎসর-কাল দিলেম সময়,
তার পরে ফিরে আসিয়া
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতী
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটির নাশিয়া।

আখ্যায়িকায় রানীর নাম ছিল অনুপমা, কবিতায় হয়েছে করুণা, হয়তো বরুণা নদীর অনুরোধে; তা ছাড়া নামের অর্থের সঙ্গে আচরণের অসংগতি প্রদর্শনও হয়তো উদ্দেশ্য ছিল।

এসব পরিবর্তন অকিঞ্চিৎকর, আসল পরিবর্তন হয়েছে কবিতার মর্মে। একটি প্রচারধর্মী আখ্যায়িকা রূপান্তরিত হয়েছে মানবধর্মী কবিতায়, যার ফলে সেটি যুগমনের পক্ষে হৃদ্য হয়ে উঠেছে। জাতক বা প্রাচীনকালের কাহিনী নিয়ে কবিতা লিখতে গেলে এ যুগের কবির পক্ষে এ রকম পরিবর্তন অপরিহার্য, কারণ রসবাক্যে ও নীতিবাক্যে দুস্তর প্রভেদ।

অজ্ঞাত কৌণ্ডিল্য (Ajnata Kaundilya) তিনবার এইসব মহৎ সত্য সম্বন্ধে ভাবিয়াছিলেন এবং তাঁহার দিব্যচক্ষু খুলিয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কোনো এক জন্মে ছিলেন কুম্ভকার; তিনি এক কঠিন রোগ হইতে প্রত্যেক বুদ্ধকে (Pratyeka Buddha) মুক্ত করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ইহার প্রতিদান স্বরূপ সুজাতার প্রথম ধর্মগ্রহণের সুযোগ পান। অপর এক জন্মে অজ্ঞাত কৌণ্ডিল্য ছিলেন এক বণিক। তিনি মহানুভব উদারচিত্ত কোশল-নৃপতির আনুকূল্য লাভ করেন, যিনি কাশী-নৃপতির সহিত যুদ্ধের রক্তপাত এড়াইবার জন্য নিজের রাজ্য

ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে নির্বাসনে গিয়াছিলেন। দক্ষিণাপথে ভ্রমণ করিবার সময় একদিন তিনি জাহাজ-বিধ্বস্ত এক বণিকের দেখা পাইলেন; সেই নাবিক কোশল-নৃপতির কাছেই যাইতেছিল প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশায়। হতভাগ্য বণিক জানিত না যে, কোশল-নৃপতিই তাহার সমুখে এবং সেই নৃপতির অবস্থা তাহার মতোই বিপর্যস্ত। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাঁহার নিজের ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা জানাইয়া বলিলেন যে, দুঃস্থকে সাহায্য করিবার মতো তাঁহার আর কোনো সুযোগ নাই। হতভাগ্য বণিক তাহার শেষ আশা এমনি করিয়া ব্যর্থ হইতে দেখিয়া গভীর বেদনায় মুহ্যমান হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

কিন্তু মহৎ নৃপতির মনে হঠাৎ এক ঝলক আশার আলো দেখা দিল। তাঁহার মস্তকের উপর পুরস্কার ঘোষণার কথা মনে পড়িল। হতভাগ্য বণিকটি কিছু সুস্থ হইয়াছিল—তিনি তাহাকে কাশীরাজের নিকট তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য বলিলেন। আত্মত্যাগের মহিমা দেখিয়া কাশীরাজ বিস্মিত হইলেন; কৃত-কর্মের জন্য অনুশোচনা দেখা দিল। বণিককে শুধুমাত্র প্রভূত অর্থই দিলেন না, কোশল-নৃপতিকেও সিংহাসন (রাজ্য) ফিরাইয়া দিলেন।[৭]

আখ্যায়িকা ও মস্তকবিক্রয় কবিতাটির মধ্যে প্রভেদ বেশি নয়, মূলের প্রায় সমস্ত অবিকৃত থাকিয়া কোশলরাজ ও কাশীরাজের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

উপগুপ্তের পিতা মথুরাগুপ্তের ইচ্ছা ছিল যে উপগুপ্ত শোণ-বাশীর (Sonavāśi) শিষ্য হইবেন। শোণবাশীর প্রতি উপগুপ্তের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বারনারী বাসবদত্তা উপগুপ্তের সুন্দর দেহকান্তি দেখিয়া তাঁহাকে কামনা করিয়াছিল এবং আহ্বান

৭ অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্যের কাহিনী, মহাবস্তু অবদান, পৃ ১৫৮-৫৯, S. B. L .N.

করিয়াছিল। উপগুপ্ত উত্তর দিয়াছিলেন, "একজন বারবণিতার কাছে যাবার এখন উপযুক্ত সময় নয়। আমি ঠিক সময়েই যাব।"

ইহার কিছুকাল পরে, অপর একজনের প্ররোচনায় বাসবদত্তা তার এক পৃষ্ঠপোষককে (paramour) বিষ দিয়া হত্যা করিল। তখন তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইলে সে মৃত্যুদণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। রক্ষী তাহার নাক কান চুল কাটিয়া দিল, এবং বস্ত্র কাড়িয়া লইল। একজন বারবণিতাকে দেখা দিবার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া উপগুপ্ত বাসবদত্তার সমুখে উপস্থিত হইলেন এবং নিজের ধর্মের প্রতি বাসবদত্তার বিশ্বাস জাগাইলেন। বাসবদত্তা মহৎ সান্ত্বনা লাভ করিল।[৮]

অভিসার কবিতাটি অতি প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। কবিতাটির দুটি ভাগ, প্রথম ভাগে বাসবদত্তা কর্তৃক উপগুপ্তকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ এবং উপগুপ্ত কর্তৃক সাময়িকভাবে প্রত্যাখ্যান—

সময় যেদিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।

দ্বিতীয় ভাগে রোগগ্রস্ত ও মুমূর্ষু বাসবদত্তার কাছে উপগুপ্তের আগমন—

"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"
শুধাইল নারী। সন্ন্যাসী কয়,
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা।"

আখ্যায়িকাতেও দুটি ভাগ। প্রথম ভাগের শেষে বাসবদত্তার আহ্বানের উত্তরে উপগুপ্ত বলেছেন—"একজন বারবণিতার কাছে যাবার এখন উপযুক্ত সময় নয়। আমি ঠিক সময়েই যাব।" দ্বিতীয় ভাগের শেষে, "একজন বারবণিতাকে দেখা দিবার উপযুক্ত

৮ বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা, উপগুপ্ত অবতার, পৃ ৬৭, S. B. L. N.

সময় বিবেচনা করিয়া উপগুপ্ত বাসবদত্তার সমুখে উপস্থিত হইলেন এবং নিজের ধর্মের প্রতি বাসবদত্তার বিশ্বাস জাগাইলেন। বাসবদত্তা মহৎ সান্ত্বনা লাভ করিল।”

আখ্যায়িকা ও কবিতার দুই অংশে মোটের উপরে মেলে বটে কিন্তু মাঝখানে কিছু অমিল আছে। আখ্যায়িকায় বাসবদত্তার দুর্গতির মূলে রাজদণ্ড, আর কারাগারের রক্ষী কর্তৃক নাক কান চুল কেটে দিয়ে তার বিকলাঙ্গতা সাধন। এগুলো রবীন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত রূঢ় মনে হয়েছে, কবিতায় তার দুর্গতির মূলে

নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায়
ভরে গেছে তার অঙ্গ।
রোগমসী-ঢালা কালী তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুরপরিখার
বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।

বসন্তরোগের আক্রমণ রাজদণ্ডের চেয়ে কম মারাত্মক নয়, তবু প্রভেদ আছে। রাজদণ্ডের মূলে বাসবদত্তা কর্তৃক নরহত্যা, বসন্তরোগের আক্রমণ স্বভাবের নিয়মে—বাসবদত্তার দায়িত্ব নাই, কাজেই পাঠকের শেষ সহানুভূতিটুকু সে হারায় না, আর সেই সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশরূপে উপগুপ্তকে তার কাছে উপস্থিত হতে দেখে পাঠক স্বস্তিমিশ্রিত আনন্দ অনুভব করে। মূল বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে কবিতাগুলির আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, একদিকে যেমন রুচির স্থূলতা ও রূঢ়তাকে কবি পরিহার করেছেন, তেমনি পরিহার করেছেন ঘটনার অতিপ্রাকৃত রূপকে। দুয়ের মধ্যে স্থূলতা আছে যা বিশ্বাসকে পীড়ন করে।

কবিতাটিতে ঘটনার গতির সঙ্গে তাল রক্ষা ক'রে প্রকৃতিকে চিত্রিত করা হয়েছে। উপগুপ্ত বাসবদত্তাকে বলেছিল যে এখন যেখানে চলেছ যাও, সময় হলে তোমার কাছে যাব। এই উক্তির

মধ্যে একটি নিদারুণ irony ছিল, নিয়তি যেন গোপনে হেসেছিল। সেই নিষ্ঠুর নিদারুণ হাসি ঝঞ্ঝার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে পড়েছে—

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎ-শিখায়
মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে
হাসিল অট্টহাস্য।

আবার যখন বাসবদত্তার রোগমসীঢালা কালো তনুখানি সন্ন্যাসী কোলে তুলে নিয়ে শুশ্রূষায় রত, তখন প্রকৃতিতে মধুর মিলনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ—

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।

কিন্তু কি আয়োজনে কি মিলিল ! তবে বলা বাহুল্য, এরকম প্রকৃতি ও মানুষের মেজাজে মিলিয়ে বুনুনি অর্বাচীন কালের কাব্যের লক্ষণ; প্রাচীন কাব্যের, বিশেষ ধর্মপ্রচার-কাব্যের লক্ষণ তো নয়ই।[৯]

---

৯ অতি দূর হতে আসিছে পবনে
বাঁশির মদির মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে
হাসিছে পূর্ণচন্দ্র।

এই শ্লোকটি পড়লে কীটসের নিম্নলিখিত শ্লোকাংশ মনে পড়ে যায়

What little town by river or sea-shore,
Or mountain built with peaceful citadel,
Is emptied of this folk, this pious morn ?

জ্যোৎস্নারাত্রি ও প্রভাতের ব্যবধান সত্ত্বেও উৎসবমত্ত নির্জন পুরীর মিল আকস্মিকতার ঊর্ধ্বে।

অনাথপিণ্ডদের সুপ্রিয়া নামে এক কন্যা ছিল। জন্মের অব্যবহিত পরেই সে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া একটি গাথা আবৃত্তি করিল; সেই গাথার মর্মার্থ হইল যে, বৌদ্ধদের প্রভূত উপহার দেওয়া এবং পবিত্র বৌদ্ধস্তূপের উপর চাঁপা ফুল ছড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য। কন্যার অভিপ্রায় অনুযায়ী পিতা তাহাই করিলেন। পরে, একদা এক ভিক্ষুক তাহাদের গৃহে ভিক্ষা করিতে আসিল; সেই ভিক্ষুকের উপদেশ সুপ্রিয়ার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিল। তা ছাড়া, সে ছিল জাতিস্মর। তাহার সাত বৎসর বয়সে মাতাপিতা তাহাকে সন্ন্যাসিনী হইবার অনুমতি দিলে, ভগবানের আদেশে গৌতমী তাহাকে দীক্ষা দিলেন। শীঘ্রই দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ভগবান সুপ্রিয়ার সাহায্যের জন্য শিষ্যদের আদেশ দিলেন। সুপ্রিয়া নিজেই গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল এবং এইভাবে সে দুঃস্থদের কষ্ট দূর করিতে লাগিল। তিন মাস পরে ভগবান যখন শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহে ফিরিতেছিলেন, মাঝপথে এমন এক বনে উপস্থিত হইলেন যেখানে কোনো রকম খাদ্য ছিল না। প্রভুর শিষ্যদের এই দুরবস্থার মধ্যে পড়িতে দেখিয়া সুপ্রিয়া ভিক্ষাপাত্রটি তুলিয়া প্রার্থনা করিল যে, যদি তাহার পূর্বকৃত কোনো সৎকাজ থাকে, তবে যেন এই ভিক্ষাপাত্রটি অমৃতে পূর্ণ হইয়া যায়। এইভাবে সে ভগবান এবং শিষ্যদের ক্ষুধা মিটাইল। তাহার সুকৃতির ফলে সে ইতিমধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিল। কেন সে অর্হৎ হইতে পারিয়াছিল, তাহার কারণ হিসাবে ভগবান বলিলেন, "পূর্বকালে ভগবান কাশ্যপের সময়ে বারাণসীতে এক দাসী তাহার প্রভুর জন্য মিষ্টান্ন লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু পথে কাশ্যপকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া প্রভুর জন্য নীত সেই মিষ্টান্ন তাঁহাকে দিল। ভগবান তাহাকে দীক্ষা দিলেন এবং পরে দশ

হাজার বৎসর ধরিয়া সে বৌদ্ধদের ভিক্ষা দিয়াছে। সেই দাসীই এখন সুপ্রিয়া রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"[১০]

আখ্যায়িকার মাঝখানের অংশ অবলম্বনে নগরলক্ষ্মী কবিতাটি রচিত। প্রারম্ভের ও শেষাংশের অতিপ্রাকৃত অংশ বর্জিত। সর্বত্রই তাই। রবীন্দ্রনাথের কাছে বুদ্ধদেব মানবশ্রেষ্ঠ আর সেই অর্থেই তাঁর মহত্ত্ব। মহৎকে মহত্তর ক'রে তুলবার উদ্দেশ্যে অতিপ্রাকৃতের অবতারণার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না। সুপ্রিয়া অবশ্য ভক্তিমতী সাধারণ মানবী, ভক্তিতেই তার ঐশ্বর্য, আর সেই অর্থেই তার মূল্য। এখানেও অতিপ্রাকৃতের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন বোধ করেছেন কবি।

ভগবানের নিকট হইতে সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া রাজা বিম্বিসার ভগবানের নখ ও চুলের উপর তাঁহার উদ্যানে এক বিরাট স্তূপ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুরনারীবৃন্দ প্রতিদিন সেই স্থান পরিমার্জনা করিতেন। পিতাকে হত্যা করিয়া অজাতশত্রু যখন সিংহাসনে বসিলেন, তখন তিনি পুরনারীদের স্তূপ-পরিমার্জনা করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ দিলেন যে, তাহা পালন না করিলে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। ক্রীতদাসী শ্রীমতী নিজের জীবন সম্বন্ধে আদৌ ভীত না হইয়া সেই স্তূপ ধৌত করিল, প্রদীপমালা জ্বালিয়া দিল। রাজা মহা রুষ্ট হইয়া তাহাকে হত্যার আদেশ দিলেন। তাহার মৃত্যুর পর সে দেবপুত্রী রূপে বেতসকুঞ্জে ভগবানের সামনে উপস্থিত হইল এবং প্রজ্ঞার আলোকে মানবের অমিত দুঃখ দূর করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিল ("Cleaning the mountain of human misery by the thunderbolt of knowledge", obtained all that is desirable.)।[১১]

---

[১] সুপ্রিয়ার কাহিনী—কল্পদ্রুমাবদান, পৃ ২৯৮-৯৯, S. B. L. N.

[১] অবদানশতক, পৃ ৩৩, S. B. L. N.

পূজারিনী কবিতাটির সারাংশ আড়াই অক্ষরে মূল আখ্যায়িকায় আছে, বিম্বিসার কর্তৃক বুদ্ধের পদনখকণার উপরে স্তূপরচনা ও তার পরিমার্জনা, পিতৃঘাতী অজাতশত্রু কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ ও স্তূপ-পরিমার্জনা নিষেধ, রাজাদেশ অমান্যে মৃত্যুদণ্ড বিধান। শ্রীমতী কর্তৃক স্তূপার্চনা এবং রাজাদেশে তার মৃত্যু। আখ্যায়িকায় শ্রীমতীর ঘটনা একটি বিবৃতি মাত্র। কবিতায় শ্রীমতীর ভক্তি মুখ্য হয়ে উঠে আত্মবিসর্জনে স্পৃহনীয় পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

পরবর্তীকালে এই কাহিনী অবলম্বনে নটীর পূজা নাটক রচিত। নাটক বলেই তার সঙ্গে অনেকটা গল্পাংশ জুড়ে দিতে হয়েছে, অনেক পাত্রপাত্রীও দেখা দিয়েছে; তৎসত্ত্বেও 'রাজবাড়ির নটী' শ্রীমতীই শ্রেষ্ঠ পাত্রী ও নায়িকা। কবিতায় শ্রীমতীর স্তূপার্চনা আত্মনিবেদনের নৃত্যে রূপান্তরিত। এই নৃত্যটিতেই নাটকের চরম উপসংহার। শুধু তাই নয়, এই নৃত্যটির মধ্যেই পরবর্তীকালে-লিখিত যাবতীয় রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যের বীজ নিহিত। আর সেই কারণেই শ্রীমতীর পূজানৃত্য বিশেষ অর্থবাহী। তবে এসব অনেক পরবর্তীকালের ব্যাপার, কবিতাটি রচনার সময়ে "মহাকবির কল্পনাতে ছিল না এই ছবি"।

কেন বুদ্ধ তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী যশোধরাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত কাহিনীতে প্রদত্ত হইল:

অতীতকালে তক্ষশিলায় বজ্রসেন নামে এক অশ্ব-বিক্রেতা বাস করিত; একদা বারাণসীর এক মেলা হইতে ফিরিবার সময় তাহার সবগুলি অশ্বই অপহৃত হইল; সে নিজেও ভীষণভাবে আহত হইল। বারাণসীর শহরতলীতে যখন সে একটি ভগ্নগৃহে শয়ন করিয়াছিল, তখন সে নগরপাল কর্তৃক চোর সন্দেহে ধৃত হইল। তখন তাহাকে হত্যা করিবার আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু বারাণসীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বারনারী শ্যামা তাহার পুরুষোচিত অপূর্ব কান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। শ্যামা তাহাকে

ভালোবাসিয়া ফেলিল এবং যে কোনো উপায়ে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তাহার এক সহচরীকে অনুরোধ করিল। প্রভূত অর্থব্যয়ে সে বজ্রসেনকে মুক্ত করিল এবং শ্যামার প্রতি অনুরক্ত জনৈক বণিকপুত্র রাজার আদেশ পালন করিল। সেই হতভাগ্য বণিকপুত্র নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা না করিয়াই অপরাধীর সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর লইল এবং বধ্যভূমিতে ঘাতকবৃন্দ কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত হইল।

সেই রমণী (শ্যামা) যথার্থই বজ্রসেনের প্রতি অনুরক্তা ছিল। কিন্তু বণিকপুত্রের প্রতি তাহার এই অমানুষিক ব্যবহার বজ্রসেনের মনে গভীর অনুশোচনার সঞ্চার করিল। এইরূপ অপরাধের বিনিময়ে ক্রীত শ্যামার প্রেমে সে স্বামী হইতে পারিল না। একদা তাহারা নৌ-বিহারে বাহির হইয়া বজ্রসেন শ্যামাকে মদ্যপান করাইল; যখন সে প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িল, তখন সে তাহাকে হত্যা করিল এবং তাহার দেহ জলে ফেলিয়া দিল। বজ্রসেন যখন দেখিল যে সে সত্যই মৃত, তখন সে তাহার দেহটি ঘাটের সিঁড়িতে রাখিয়া পলায়ন করিল। শ্যামার মাতা অদূরে ছিল; তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ছুটিয়া আসিল এবং অনেক পরিশ্রমের পর শ্যামার জীবন ফিরাইয়া আনিল। সুস্থ হইয়া শ্যামার প্রথম কর্তব্য হইল তক্ষশিলার এক ভিক্ষুণীকে বাহির করা, এবং সেই ভিক্ষুণীর মারফত বজ্রসেনকে বলিয়া পাঠাইল, সে যেন তাহার প্রেমের বন্ধনে ধরা দেয়। বুদ্ধই সেই বজ্রসেন এবং শ্যামা সেই যশোধারা।[১২,১৩]

---

১২ বিশেষভাবে লক্ষণীয়, মূল কাহিনীতে উত্তীয়ের নাম নাই; বণিক-পুত্ররূপে তাহার উল্লেখ আছে মাত্র। মহাবস্তু অবদানে অন্যত্র উত্তীয় নামটির উল্লেখ আছে (দ্রষ্টব্য ১১৫ পৃ)

"When the Lord lived at Gṛdhrakuta in Rājagṛha Maudgalāyana chanced to meet a Suddhavāsa Devaputra. From him he learned of the great merits of one Uttiya, a banker, the disciple of Sarvāvibhu."

১৩ শ্যামা-বজ্রসেনের কাহিনী, মহাবস্তু অবদান, পৃ ১৫৫, S. B. L. N.

কথাকাব্যের পরিশোধ কবিতাটি অবলম্বনে পরবর্তীকালে শ্যামা নৃত্যনাট্য রচিত হয়েছে। মূল কবিতা ও তার রূপান্তর সকলেরই সুপরিচিত। বজ্রসেনের চৌরাপবাদ ও নগরপাল কর্তৃক তার বন্দীদশা, শ্যামা কর্তৃক তাকে উদ্ধার, শ্যামার প্রেমমুগ্ধ এক বণিক-পুত্রের চৌরাপবাদ গ্রহণ ও রাজদণ্ডে মৃত্যু, শ্যামা ও বজ্রসেনের পলায়ন, শ্যামার মুখে প্রকৃত ঘটনা শ্রবণে বজ্রসেন কর্তৃক শ্যামাকে হত্যা (অন্ততঃ তা-ই সে মনে করেছিল), এবং অবশেষে জ্ঞানলাভের পরে শ্যামার বজ্রসেনকে পুনরায় আহ্বান—এ পর্যন্ত মূল আখ্যায়িকার ধারা কবিতায় অনুসৃত হয়েছে। শুধু এইটুকুই যদি যথাশিল্প চিত্রিত হত তা হলেও কবিতাটি সার্থক হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু কবিতাটিতে আরও কিছু অতিরিক্ত আছে। প্রেম ও পাপ -বোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব অতি সূক্ষ্ম সুনিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে কবিতাটিতে। নৃত্যনাট্যে এই চিত্র সূক্ষ্মতর, সুনিপুণতর তূলিকায় অঙ্কিত। প্রেম ও পাপের মধ্যে এমন নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রসাহিত্যে খুব বেশি নেই।

বজ্রসেনের অন্তিম কাতরোক্তি

জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।

দুর্বল মানবজীবনের এই হয়তো শেষ প্রার্থনা। পরিশোধ কবিতায় এ দ্বন্দ্ব অবশ্যই আছে তবে নৃত্যনাট্যে অধিকতর পরিস্ফুট করে দেখানো হয়েছে। পূর্বোক্ত আখ্যায়িকাগুলি বা বস্তুর সঙ্গে কবিতাগুলি মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রূপান্তর সাধনে একটি বিশেষ নিয়ম অনুসৃত হয়েছে। সে নিয়মটি কবির ভাষাতে প্রকাশ করলে দাঁড়ায়, "তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর

ছন্দে গানে।" জাতককার ছিলেন ভক্ত, তিনি দেবতার নরলীলার মহিমা বর্ণনা করেছেন, আর এ যুগের কবি নরের দেবলীলা বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চোখে বুদ্ধ মানুষ, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ; তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠার জন্য অতিপ্রাকৃতের প্রয়োজন আছে তিনি মনে করেন না। তাঁর মহত্ত্বের প্রেরণায় মানুষও মহৎ হয়ে উঠেছে, "দীননারী এক ভূতলশয়ন,···অরণ্য-আড়ালে রহি কোনোমতে" একমাত্র বাস প্রভুর উদ্দেশে দান করতে পারে, ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা দূর করবার সাহস অর্জন করে, শ্রীমতী রাজদণ্ডের ভয় না ক'রে স্তূপপদমূলে আরতিদীপ জ্বালিয়ে দেয়। প্রকৃত মহত্ত্ব নিজের চার দিকে বিভূতি বিকিরণ করে, সেই আলোয় কত অন্ধকার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মহত্ত্বের সেই লীলাটি কবি কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছে। এটাই সাধারণ সূত্র। অবশ্য অনুষঙ্গরূপে আরও কিছু আছে। অতিপ্রাকৃতের মতো রুচিবিগর্হিত স্থূলতাও বর্জিত হয়েছে, যেমন বাসবদত্তার নাক কান কাটবার বিবরণ। দুইই স্থূল, অতিপ্রাকৃতও একপ্রকার স্থূলতা। রুচি ও ঘটনার স্থূলতা সম্বন্ধে রবীন্দ্র-কবিচরিত্র একান্ত স্পর্শকাতর।

জাতকবস্তুর আলোচনা শেষে এবারে আমরা আর -এক শ্রেণীর কবিতা আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

৩

কথাকাব্যের অপমানবর, স্বামীলাভ ও স্পর্শমণি কবিতা তিনটির আখ্যায়িকা বা বস্তু ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে গৃহীত। এবার আমরা ঐতিহাসিককালের মধ্যযুগে এসে উপস্থিত হয়েছি, কবিতা তিনটির নায়ক কবীর, তুলসীদাস ও সনাতন তিনজনেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। অবশ্য বুদ্ধদেবও ঐতিহাসিক ব্যক্তি, বস্তুতঃ তাঁকে দিয়েই ভারতে ঐতিহাসিক কালগণনার সূত্রপাত। কিন্তু জাতক-কাহিনীতে প্রাকৃতে

ও অতিপ্রাকৃতে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে স্বভাবতই অনেকটা ইতিহাসের সীমানার বাইরে গিয়ে পড়েছে।

প্রথমে স্পর্শমণি কবিতাটির আলোচনা করা যাক; কারণ এখানে বস্তুতে ও কবিতায় মিল সবচেয়ে বেশি, কাজেই আলোচনার ক্ষেত্র সংকীর্ণ।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন শ্রীজীব গোস্বামী।
হরিভক্তি মূর্তির প্রকট নবভূমি। [১৪]

…তবে চলি গেল গোসাঞি শ্রীবৃন্দাবন ॥
অলৌকিক অসম্ভব গোসাঞির প্রেম।
বৈরাগ্যের সীমা আর অপতিত নেম ॥
মূর্ত্তিমান মহাতেজঃ সমুদ্র গম্ভীর।
শাস্ত্রান্তগা পৃথিবীর মধ্যে এক ধীর ॥
প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে বাস।
প্রতিদিন পরিক্রমা নাহিক আলস ॥
বৃক্ষতলে থাকি সদা গ্রন্থানুশীলন।
অলক্ষে করেন পরিক্রমা বৃন্দাবন ॥
এক লীলা গোসাঞির শুন চমৎকার।
যাহার শ্রবণে হয় ভব-নিধি পার ॥
একদিন গোসাঞি স্নান করিতে যমুনা।
স্পর্শমণি পাইলেন যাতে হয় সোনা ॥
মনে ভাবেন কোন দীন দরিদ্র দেখিয়া।
তারে দিব এখন কোথায় রাখি লইয়া ॥
স্পর্শ না করিয়া খাপরেতে ধরি নিয়া।
কোন স্থানে রাখিল মৃত্তিকা আচ্ছাদিয়া ॥

১৪ চরিত্র শ্রীরূপ সনাতন, ভক্তমাল গ্রন্থ

দৈবযোগে গৌড়দেশের এক ব্রাহ্মণ।
বর্দ্ধমানে মানকরেতে ভবন ॥
জীবন তাহার নাম বহুত কুটুম্ব।
সুদরিদ্র কিছু মাত্র নাহি অবলম্ব ॥
বিবেকী হইয়া কাশী পুরীতে যাইয়া।
অর্থাকাংক্ষী হইয়া বহু বৎসর ব্যাপিয়া ॥
শিব আরাধন কৈল তীব্রব্রত করি।
প্রসন্ন হইয়া শিব কহে বিপ্রোপরি ॥
বৃন্দাবনে যাহ তথা সনাতন নাম।
তাহার নিকটে গেলে পুরিবেক কাম ॥
বহু ধন পাবে তথা যাবে দরিদ্রতা।
লোকেতে দুর্ল্ভ যাহা সর্ব্ব দুঃখহর্ত্তা ॥
আহা কিবা দয়াময় দেব মহেশ্বর।
গরল চাহিতে দিল অমৃত সাগর ॥
শিবের আজ্ঞাতে বিপ্র ধনের আশাতে।
বৃন্দাবন ধাম তবে চলিলা ত্বরিতে ॥
বিপ্রের সংসার ক্ষয় উন্মুখ সময়।
তাহা নাহি জানে ধন চিন্তয়ে হৃদয় ॥
বিধাতা সদয় যবে হয় দুঃখিজনে।
গুগ্‌লি খুঁজিতে হস্তে মিলয়ে রতনে ॥
কতদিনে বৃন্দাবন ধামে সনাতন।
নিকট হইল যাঞা সুকৃতি ব্রাহ্মণ ॥
গোসাঞিরে গিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ করি।
আনন্দ আবেশে রহে করযোড় করি ॥
গোসাঞি প্রণাম করি করি করযোড়।
পুছেন ব্রাহ্মণে মিষ্ট বাক্যে প্রিয়ংকর ॥
কে তুমি ঠাকুর মহাশয় কিবা অর্থে।
আগমন করি কৃপা করি মোর সাথে ॥

গোসাঞির নম্রতা সুমিষ্ট বাক্য শুনি।
দ্রবিল বিপ্রের চিত্ত চমৎকার গণি॥
বিপ্র কহে মহাশয় আমি সুদরিদ্র।
অর্থ লাগি ভজিলাম বহুকাল রুদ্র॥
কৃপা করি মহাদেব আদেশ করিলা।
তোমার চরণে মোরে আসিতে কহিলা॥
বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর স্থানে।
যাইলে পাইবে অর্থ ইথে নাহি আনে॥
গোসাঞি কহেন মুঞি অর্থ কোথা পাব।
মহাদেব মোর স্থানে কি হেতু পাঠাব॥
ভিক্ষাজীবী হঙ্ মোর অর্থ কোথা হয়।
ইহা শুনি ব্রাহ্মণের বিদরে হৃদয়॥
হা হা মোর ভাগ্যে কি ঈশ্বর প্রতারিল।
কিম্বা মুঞি স্বপনে কি প্রলাপ দেখিল॥
ব্রাহ্মণে কাতর দেখি দয়াল গোসাঞি।
আকাশ পাতাল ভাবি কূল নাহি পাই॥
দৈবাৎ পড়িল মনে মণির বৃত্তান্ত।
আশ্বাস করিয়া ব্রাহ্মণেরে করে শান্ত॥
হায় হায় ঠাকুর মোর স্মরণ হইল।
মিথ্যা নহে শ্রীমান মহাদেব যে কহিল॥
স্পর্শমণি লবে চল দেখাইয়ে দেই।
বিস্মিত হইল তেকারণে কহি নাই॥
ব্রাহ্মণেরে লইয়া যমুনাতীরে গিয়া।
বাম হস্ত তর্জনি অঙ্গুলি হেলাইয়া॥
কহে এইখানে দেখ মৃত্তিকা খুদিয়া।
ব্রাহ্মণ খুদিয়া বলে না পাই খুঁজিয়া॥
গোসাঞিরে বোলে কোথা দেহ উঠাইয়া।
তেঁহো কহে না স্পর্শিব স্নান না করিয়া॥

পুনঃ তল্লাসিতে বিপ্র মণি যে পাইল।
গোসাঞিরে দণ্ডবৎ করিয়া চলিল॥
পথে চলি যায় বিপ্র ভাবে মনে মনে।
এ হেন পদার্থ গোসাঞি দিল কি কারণে॥
রাখিবার কায থাকুক স্পর্শ নাহি করে।
স্পর্শের থাকুক কায ঘৃণাতে না হেরে॥
আমার চরিত্র এই সেই বস্তু লাগি।
তপঃ করি ঈশ্বর সেবনে অনুরাগী॥
ছি ছি মোরে ধিক ধিক হেন তুচ্ছ বস্তু।
যাহার লাগিয়া মুঞি সদাই অসুস্থ॥
অতএব হেন বস্তু দূরে তেয়াগিয়া।
গোসাঞির চরণে শরণ লব গিয়া॥
তেঁহো যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল।
তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল॥
তাঁহার চরণে যাঞা শরণ লইব।
বিনিমূলে তাঁর পদে বিক্রীত হইব॥
এতেক ভাবিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া।
বটেশ্বর গ্রাম হৈতে গেলেন ফিরিয়া॥
গোসাঞির পদেতে পড়িয়া বিপ্রবর।
নিজ অভিলাষ যাহা করিল বিস্তার॥
এ তুচ্ছ রতনে মোর নাহি কিছু কাম।
কৃপা করি কর প্রভু মোরে আত্মসম॥
শরণ লইল তব অভয় চরণে।
কৃতার্থ করহ দিয়া কৃষ্ণ প্রেমধনে॥

আগেই বলা হয়েছে বস্তুতে ও কবিতায় প্রভেদ বেশি নাই, এমন-কি কবিতার "জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম, জিলা বর্ধমানে" আখ্যায়িকার "দৈবযোগে গৌড়দেশের এক ব্রাহ্মণ।

বৰ্দ্ধমানে মানকরেতে ভবন। জীবন তাহার নাম,"—হুবহু এক। জীবনের দারিদ্র্য, শিবের কাছে ধনপ্রার্থনা, শিব কর্তৃক জীবনকে বৃন্দাবনে গিয়ে সনাতনের শরণ নেওয়ার আদেশ, শিবের আদেশ শ্রবণে সনাতনের দুশ্চিন্তা, অবশেষে স্পর্শমণি-প্রাপ্তির ঘটনা স্মরণ, জীবনের স্পর্শমণি লাভ, স্পর্শমণি প্রত্যাখ্যান ও সনাতনের শরণ গ্রহণ—সর্বত্র কবি নিষ্ঠার সঙ্গে মূলকে অনুসরণ করেছেন।

"যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মানো না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে।" এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মানিক।

আর—

তেঁহো যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল।
তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল ॥...
এ তুচ্ছ রতনে মোর নাহি কিছু কাম।
কৃপা করি কর প্রভু মোরে আত্মসম ॥

দুয়ে কাব্যাংশ ছাড়া মর্মাংশে অমিল নাই। স্পর্শমাণর গুণে দুইটিই সোনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

শ্রীমান্ তুলসীদাস জগতে বিখ্যাত।
অলৌকিক অদ্ভুত যাহার চরিত্র ॥[১৫]

স্বর্গার্থী হইয়া নানা কর্ম্ম যেই করে।
দীন হীন সেই জন ভ্রময়ে সংসারে ॥
মুমুক্ষু যে জ্ঞানযোগে করয়ে অবস্থান।
ক্লেশমাত্র তার সে হারায় প্রেমধন ॥
যোগির সে যোগসহ পরম বিরস।
ওরে মন সব ত্যজি হও মোর বশ ॥

১৫ ভক্তমাল গ্রন্থ

কর্ম্ম জ্ঞান যোগ তপ যতনে ত্যজহ।
আমার রসনা মাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ॥
এক স্ত্রী স্বামির সহ সতী হইতে যায়।
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করয়॥
এই স্ত্রী এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যে মানিয়া।
প্রাণান্তিক দেহে দণ্ড করে জানাইয়া॥
স্বর্গভোগ ফল অতি তুচ্ছ না বুঝিয়া।
পরম যে ধর্ম্ম করি অন্তরে জানিয়া॥
আত্যন্তিক ক্লেশ দেহ দগ্ধ যে করিয়া।
ফল্গু অর্থ পায় পরিণাম না বুঝিয়া॥
সম্মুখে দারুণ কাল সংসার অনল।
ফল্গু সুখ লোভে জানি বুঝে তার ফল॥
দয়াল হৃদয় সাধু এতেক চিন্তিয়া।
স্ত্রীর নিকটে গেলা করুণা করিয়া॥
মহান্ত তুলসীদাস দেখিয়া যে নারী।
প্রণাম করিলা অতি ভক্তি ভাব করি॥
সেই যে সুকৃতি তার সাক্ষাৎ ফলিল।
শুন তার কথা সাধু যে কৃপা করিল॥
আগেতে নারীকে অতি প্রশংসা করিলা।
শেষে ক্রমে ২ তত্ত্ব কহিতে লাগিলা॥
শুন দেখি মাতা তুমি সতী যে হইবে।
ইহাতে বা পরলোকে কি গতি পাইবে॥
নারী কহে স্বামি সঙ্গে স্বর্গেতে যাইব।
চৌদ্দ মহেন্দ্রকাল বিষয় ভুঞ্জিব॥
সাধু কহে তাহার অন্তেতে কি হইবে।
তেঁহ কহে কর্ম্ম বশে যে হয় হইবে॥
সাধু কহে কর্ম্মক্ষয় ইথেত না হৈল।
দারুণ সংসার জ্বালা তাহাতে না গেল॥

যদি কহ বহুকাল সুখ আস্বাদন।
বহুজ্ঞান করিতেছে মোহের কারণ॥
লক্ষ লক্ষ ইন্দ্রপাত কালে হইতেছে।
চৌদ্দ ইন্দ্র ব্রহ্মার একদিনে যাইতেছে॥
স্বর্গ সেই স্বাভাবিক অনিত্য যে হয়।
সে থাকুক ব্রহ্মাণ্ড যে এহ নাশ যায়॥
জীব কত শত ব্রহ্মার আয়ুঃ যে পর্য্যন্ত
ভ্রমণ করিছে কত নাহি হয় অন্ত॥
অতএব অল্প সুখ বিষয় লাগিয়া।
মিথ্যা মায়ামোহে মর দেহ জ্বালাইয়া॥
নারী কহে মহাশয় কর্ত্তব্য কি হয়।
জন্ম মৃত্যু মায়া মোহ কি করিলে যায়॥
সাধু কহে মাতা তব শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে কিছু কহি শুন তাহার উপায়॥
জীয়ন্ত শরীর পোড়াইয়া যাহা নহে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম আচরিয়া বেদে যাহা কহে॥
সুন্দর বিধানে করিলেও যে না হয়।
শ্রীরামচরণ শ্রেয়ঃ মাত্র সুখ পায়॥
রাম নাম মহামন্ত্র যে জন জপয়।
সেই ধন্য ২ সেই ত্রিলোক বিজয়॥
এক নামে কোটি মহাপাতক নাশিয়া।
জীবত মুকত হয় নির্ম্মল হইয়া॥
পুনঃ ২ সাধনেতে কি হয় না জানি।
চতুরবর্গ নাহি চায় অতি তুচ্ছ মানি॥
যে স্বর্গ লাগিয়া তুমি দেহ কৈলে পণ।
তার নাম শুনি তেঁহ কর্ণে হস্ত দেন॥
তাঁহার দর্শনে লোক পবিত্র হইয়া।
সেই রামচন্দ্র ভজে শরণ লইয়া॥

দেবগণ পিতৃগণ ধন্য ধন্য করে।
সর্ব গুণ সহ বৈসে তাহার শরীরে॥

তথাহি পঞ্চমে। যস্যাস্তি ভর্গবত্যকিঞ্চিনা ইত্যাদি

তুমি দেহ পোড়াইছ ক্ষুদ্র ফল আশে।
সেই মহাফল পায় সুখে অনায়াসে॥
প্রেমভক্তি মহাফল সর্ব্ব ফলের ফল।
সর্ব্ব সুখময় সর্ব্ব শুভের মঙ্গল॥
নিত্য সুখ সেই তার নাহিক বিকাশ।
চিদানন্দ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে হয় বাস॥
স্বর্গ যে অনিত্য তাহা দুঃখেতে মিশ্রিত।
হর্ষাদি মাৎসর্য্য ভয় বিচ্ছেদ বিব্রত॥
বৈকুণ্ঠ পরম ধাম নিত্য চিদানন্দ।
হর্ষ রাগ দ্বেষ মোহ নাহি মায়া গন্ধ॥
অতএব শ্রীরামপদে শরণ যে লয়।
তাহার মহিমা কিছু কহা নাহি যায়॥
এতেক শুনিয়া স্ত্রীর মন ফিরি গেল।
মোহ দূরে গেল চিত্ত প্রকাশ হইল॥
তবে মোর কি কর্ত্তব্য কহ মহাশয়।
কৃপা করি কর যাতে মোর হিত হয়॥
তবে সাধু রামমন্ত্র উপদেশ দিলা।
তাহার কৃপাতে তার মন ফিরি গেলা॥
তৎক্ষণাৎ প্রেমভক্তি উদয় হইল।
জন্ম অন্ধ জন যেন চক্ষুস্মন হৈল॥
শ্রীমান তুলসীদাস নিজ ভক্তিবলে।
শক্তি সঞ্চারণ কৈল ভাসে প্রেমজলে॥

কৃপা করি স্বামী তার বাঁচাইয়া দিলা।
তাঁহারেও রামচন্দ্র চরণে সঁপিলা॥

আখ্যায়িকায় ও স্বামীলাভ কবিতায় তুলনা করলে দেখা যাবে যে, তুলসীদাস ও বিধবারমণীর চরিত্র অঙ্কনে কবি মূলানুগতা রক্ষা করেছেন। তুলসীদাস বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, স্বর্গভোগের সুখ অত্যন্ত তুচ্ছ; বুঝিয়েছেন যে, "পরমধর্ম্ম" লাভ করলে স্বর্গলাভকে আর শ্রেয় মনে হয় না, কারণ স্বর্গভোগ যত দীর্ঘকালেরই হোক না কেন তার পরে আবার জন্মগ্রহণ করে কর্মপাশে ফিরে আসতে হবে। তার বদলে রমণী যদি রামনাম গ্রহণ করে তবে "প্রেমভক্তি মহাফল সর্ব্বফলের ফল, সর্ব্ব সুখময়, সর্ব্ব শুভের মঙ্গল, নিত্য সুখ সেই তার নাহিক বিকাশ।" সাধুর উপদেশে রমণীর "মোহ দূরে গেল চিত্ত প্রকাশ হইল।" তখন সে শুধালো "তবে মোর কি কর্ত্তব্য কহ মহাশয়, কৃপা করি কর যাতে মোর হিত হয়।" তুলসীদাসের উপদেশে "তাহার কৃপাতে তার মন ফিরি গেলা।" তখন তুলসীদাস "কৃপা করি স্বামী তার বাঁচাইয়া দিলা। তাঁহারেও রামচন্দ্র চরণে সঁপিলা।"

স্বামীকে পুনর্জীবনদান অতিপ্রাকৃত বলে কবিকর্তৃক বর্জিত হয়েছে। তার বদলে এ যুগের কবি স্বামীলাভকে অন্তরের উপলব্ধিরূপে চিত্রিত করেছেন! প্রতিবেশীরা

শুধাইল, 'পেলে স্বামী?' নারী হাসি বলে,
'পেয়েছি তাঁহারে।'
শুনি ব্যগ্র কহে তারা, 'কহো তবে কহো
আছে কোন্ ঘরে।'
নারী কহে, 'রয়েছেন প্রভু অহরহ
আমারি অন্তরে।'

কবিরজী জন্ম পূর্ব্বে যবনের ঘরে।
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা যাহার উপরে॥[১৬]

দেখিয়া বুঝিল মনে এ কর্ম্ম প্রভুর।
নহে এত দ্রব্য কেবা আনিবে প্রচুর॥
বৈষ্ণব সজ্জনে সাধু বিলাইতে লাগিল।
ব্রাহ্মণগণের মনে অসূয়া জন্মিল॥
কহে হারে বেটা জোলা তিলকধারীগণে।
অর্থ বিলাইলি কিছু না দিলি ব্রাহ্মণে॥
না দিবি ত আজি মোরা মারব তোমারে।
কবির বিনয় করি কহে সবাকারে॥
ঘরেতে নাহিক কিছু চেষ্টা করি গিয়া।
যদি কিছু পাই দিব বাঁটরা করিয়া॥
এত কহি হাটে শূন্য ঘরে গিয়া রহে।
ভয়ে নাহি গৃহে আইসে রাম রাম কহে॥
পুনঃ বহু ধন হরি আনে রূপান্তরে।
কবির পাঠায় বলি আনি দিল ঘরে॥
কবির আসিয়া মর্ম্ম বুঝিয়া অন্তরে।
অদৈন্য করিয়া দিল ব্রাহ্মণগণেরে॥
তথাচ ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষা না ছাড়য়।
বৈষ্ণব সহিতে যথা দেবে দৈত্যে হয়॥
ইদানী বিপ্রের রীতি অনুভব হৈল।
পূর্ব্বেও বৈষ্ণব দ্বেষী এমতি আছিল॥
কবিরের প্রতি ঈর্ষা করি বিপ্রগণ।
জন চারি করে নিজ মস্তক মুণ্ডন॥

১৬ চরিত্র শ্রীকবিরজী, ভক্তমাল গ্রন্থ

বৈষ্ণবের বেশ ধরি গ্রামে২ গিয়া।
আইল ব্রাহ্মণগণ নেওতা করিয়া॥
সহস্রেক বৈষ্ণবের ঘরে২ গিয়া।
কবিরের গৃহে মহোৎসব যে কহিয়া॥
কবিরের গৃহে আসি সবে জমা হৈল।
বৃত্তান্ত শুনিয়া সাধু চিন্তিত হইল॥
উপায় না দেখি এক স্থানে গিয়া বৈসে।
পূর্ব্ববৎ সামগ্রী লইয়া প্রভু আইসে॥
সব সমাধান কৈল কবিরের বেশে।
তেঁহ আসি মিলি সুখসাগরেতে ভাসে॥
সিদ্ধ বলি লোকে বড় জনরব হৈল।
আকার গোপন'হেতু এত ছল কৈল॥
এক স্ত্রী বেশ্যা যে তাহার হাত ধরি।
নগরের লোকেরে দেখাইয়া বুলি ফিরি॥
সাধু লোক তা দেখি অন্তরে পায় ব্যথা।
অসাধুর হর্ষ চিত্ত লাভ অংশে যথা॥
তাহার অন্তরে কিছু বিকার ত নাহি।
অবিজ্ঞা করয়ে লোক ভ্রষ্ট হৈল কহি॥
এক দিনে কবির সেই বেশ্যার সহিতে।
রাজার সভাতে গেল করিয়া যাঁহাতে॥
রাজা দেখি পূর্ব্ববৎ ভক্তি নাহি কৈল।
দণ্ডবৎ না করিল আসন না দিল॥
হরিভক্ত ছাপাইয়া ছাপা নাহি যায়।
মৃগমদ গন্ধ যথা বস্ত্রে না লুকায়॥
সভা হৈতে ফিরি সাধু যাইবার কালে।
তটস্থ হইয়া করয়ার জল ঢালে॥
রাজার অন্তরে কিছু ভয় উপজিল।
অবজ্ঞা করিনু হেতু কি জানি কি কৈল॥

একান্ত করিয়া রাজা পুছে বারবার।
বুঝি কিছু অনিষ্ট যে করিলা আমার॥
সাধু কহে না না তব অনিষ্ট না করি।
রাজা কহে তবে কেন ছরকাইলে বারি॥
সাধু কহে শ্রীমন্দিরে শ্রীপুরুষোত্তমে।
আগুন পড়িয়াছিল কোন কার্য্যক্রমে॥
ভিড়িতে সেবকগণ পদ দিতেছিল।
চরণ পুড়িবে বলি জল ঢালি দিল॥
রাজা তাহা শুনি সেইদিন বার তিথি।
লিখিয়া পাঠায় ক্ষেত্রে লাগিয়া প্রতীতি
লোকের দ্বারায় তারা জানিলেন তথ্য।
অগ্নি পড়েছিল বটে নিভাইল সত্য॥
তখন রাজার মনে ভয় জনমিল।
ভ্রষ্ট বলি বৈষ্ণবেরে অবজ্ঞা করিল॥

যাইয়া দম্পতী শ্রীমন্ কবির চরণে।
পড়িয়া কান্দয়ে ধারা বহে দুনয়নে॥

মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে অপমানবর কবিতাটির অনেক প্রভেদ অর্থাৎ আখ্যায়িকায় এমন অনেক বিষয় আছে যা কবিতায় নাই। দুটি কারণে কবিকে গণ্ডী সংকীর্ণ করতে হয়েছে। প্রথমতঃ আখ্যায়িকার অনেক বিষয় অতিপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত ঘেঁষা। দ্বিতীয়তঃ কবীরের মহত্ত্ব প্রদর্শনের জন্য একটি ঘটনাই যথেষ্ট মনে করেছেন কবি। ব্রাহ্মণগণ ষড়যন্ত্র ক'রে কবীরের সঙ্গে এক পতিতা রমণীকে জুটিয়ে দিল, এই একটিমাত্র ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে, তার বিস্তার সাধনের দ্বারা কবীর-চরিত্রের মহত্ত্ব দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। জাতক-গাথাগুলির রূপান্তরের মতো এসব কাহিনীর রূপান্তরেও

অতিপ্রাকৃত বর্জিত হয়েছে। প্রাকৃতের মধ্যেই প্রকৃত বিভূতির প্রকাশ সম্ভব এ যুগের নিত্য বিশ্বাস।

পাঞ্জাব ও শিখসমাজ এবং মহারাষ্ট্র ও মারাঠীদের সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছিল কথাকাব্যের কবিতাগুলি লিখবার অনেক আগে, কিন্তু রাজপুতানা সম্বন্ধে তেমন ব্যক্তিগত পরিচয়ের বিবরণ পাওয়া যায় না। তবু যে তিনি রাজপুতানার কাহিনীতে আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন তার কারণ রাজপুতানার ইতিহাস শৌর্য বীর্য ও মহত্ত্বের অফুরন্ত আকর। ভারতের সব প্রদেশের কবি সাহিত্যিক শিল্পী চিত্রকর এই আকর থেকে রত্ন উদ্ধার ক'রে কাব্য নাটক উপন্যাস লিখেছেন, গান বেঁধেছেন, ছবি এঁকেছেন। সেই সাধারণ আকর্ষণেই রবীন্দ্রনাথও নেমেছেন এই রত্নগর্ভ খনিতে। তবু অন্য-দের সঙ্গে কিছু প্রভেদ আছে। রাজপুত ইতিহাসের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নামগুলি, সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনাগুলিকে কবি এড়িয়ে গিয়েছেন। রাণা সঙ্গ, প্রতাপসিংহ, রাজসিংহ, রাঠোর দুর্গাদাস, মানসিংহ, মীর্জা জয়সিংহ, রানী পদ্মিনী বা ধাত্রী পান্না কাউকে পাই নে, তেমনি পাই নে আলাউদ্দিনের চিতোর-আক্রমণ বা হলদিঘাটের সংগ্রাম, এমন আরো অজস্র ইতিহাসবিখ্যাত ঘটনা। যে আখ্যায়িকাগুলি অবলম্বনে ছয়টি কবিতা কবি লিখেছেন তাদের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করেও বলা যায় যে ইতিহাসের রুদ্রবীণায় এগুলো যেন সরু তারে সাধা সুর। এসব ঘটনা ইতিহাস-গ্রন্থের পাদটীকায় ক্ষুদ্রতর অক্ষরে লিখিত বলেই যেন পূর্বতন কবি ও শিল্পীদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। ইতিহাসের যে রাজপথটাতে ভাটচারণের জয়গানে এবং তূরী-ভেরীর নিনাদে চতুরঙ্গ বাহিনীর সমারোহ কবি তাকে এড়িয়ে গিয়েছেন, তিনি যেন খিড়কি দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছেন রাজপুতানার ইতিহাসের অভ্যন্তরে, যেখানে জীবনের সংগীত নিম্নগ্রামে ধ্বনিত। সেই জন্যই একবার ছাড়া ভারতেতিহাসের কোনো নায়ককে চোখে পড়ে না। খুব

সম্ভব বিষয়-নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যে ইতিহাস সম্বন্ধে কবির ধারণার আভাস পাওয়া যায়।

রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও শিখসম্প্রদায় সম্বন্ধে কবিতাগুলিকে ঐতিহাসিক কবিতা বলে গ্রহণ করা উচিত। ছান্দোগ্য উপনিষদ ও বৌদ্ধ কবিতাগুলিকে পৌরাণিক কবিতা বলে ধরাই সংগত। যদিচ বুদ্ধদেব ঐতিহাসিক ব্যক্তি তবু দিব্যাবদানমালা অবদানশতক প্রভৃতিকে ইতিহাস বলতে বাধা আছে—এগুলি স্পষ্টতঃ বৌদ্ধপুরাণ। কাজেই এ-সমস্ত কবিতা পৌরাণিক। ভক্তমালের অন্তর্গত তুলসীদাস, সনাতন ও কবীর প্রভৃতি সাধুসন্তগণও ঐতিহাসিক ব্যক্তি তথাপি কবিতা-তিনটিকে ঐতিহাসিক কবিতা না বলাই উচিত। রাজস্থানে প্রবেশের সঙ্গে আমরা ইতিহাসের রাজ্যে প্রবেশ করলাম। এ দেশে পাঠানরাজত্ব প্রতিষ্ঠার আগেই রাজস্থানের রাজন্যবর্গ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পাঠান সুলতান ও মোগল বাদশাদের দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে। শিবাজী ও মারাঠারাজ্য এবং শিখগুরুগণ ও শিখরাজ্য মোগল-বাদশাদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত। কাজেই কালানুক্রমে বিচার করলে আগে রাজস্থান পরে মারাঠা ও শিখ সমাজ সম্পর্কিত কবিতাগুলির স্থান; যদিচ রাজস্থানের কোনো কোনো কবিতায়, যেমন পণরক্ষা কবিতাটির ঘটনা একেবারে অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের। তৎসত্ত্বেও ভারতেতিহাসের ক্রম অনুসরণ ক'রে রাজস্থান, মারাঠা ও শিখ সম্প্রদায়ের আলোচনা করাই বিধিসংগত।

মানী কবিতাটির আখ্যায়িকা টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত। এখানে আখ্যায়িকার প্রাসঙ্গিক অংশ প্রদত্ত হল।

> দেওরা-যুবরাজ যখন সম্মুখসমরে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না, তখন তিনি নিকটস্থ পাহাড়ে আত্মগোপন করিতেন। কিন্তু একদা যখন তিনি বুঝিলেন যে তিনি নিরাপদ, তখন একদিন গভীর রাত্রে মুকুন্দ একদল সুসজ্জিত সৈন্যসহ সিরোহি-

যুবরাজ (সুরতান) যেখানে নিদ্রিত ছিলেন সেখানে প্রবেশ করিলেন। মুষ্টিমেয় সৈন্যদের হত্যা করিলেন এবং নিদ্রিত রাজাকে স্বীয় পাগড়ি দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিলেন। অনুচরদের চতুর্দিকে দাঁড় করাইয়া যুবরাজের সৈন্যদের ডাক দিলেন। পাহাড়ের গুহা হইতে বাহির হইয়া দেওরা-অনুচরবৃন্দ তাহাদের রাজার চতুর্দিকে উপস্থিত হইয়া তাঁহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিল। তখন নহুর তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা দেখছ তাঁর জীবন আমার হাতে। তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও—তা হলে জেনো তিনি নিরাপদ। আমি তাঁকে আমার রাজার কাছে নিয়ে চললাম; যদি তোমরা বাধা দাও, তা হলে তাঁর মৃত্যুই সুনিশ্চিত। তোমাদের যে সতর্কবাণী দিয়ে ডেকেছি, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে তোমরা আমার এই কাজ দেখতে পাও।"

তিনি সুরতানকে (সিরোহিপতি) যশোবন্তের নিকট লইয়া গেলে যশোবন্ত বলিলেন যে, রাজার (আরংজেবের) সহিত সুরতানের পরিচয় করাইতে হইবে। দেওরা-রাজকে রাজসভার দিকে লইয়া যাইবার পথে যখন তাঁহারা প্রাসাদের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন তখন সুরতানকে বলা হইল যে, তিনি যেন রাজার (আরংজেবের) প্রতি যথোচিত সম্মান দেখান। নচেৎ বিপদ ঘটিবে। উদ্ধত দেওরা উত্তর দিলেন, "আমার জীবন রাজার হাতে কিন্তু আমার সম্মান নিজের হাতে। আমি কখনো কারো কাছে মাথা নত করি নি, কখনো করব না।"

যখন যশোবন্ত নিজে সুরতানের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করিতে অনুরোধ জানাইলেন, তাঁহার অন্যান্য সহকারীবৃন্দ চাতুরীপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করিল। সাধারণভাবে পথে না লইয়া তাহারা তাঁহাকে সংকীর্ণ প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে লইয়া গেল। কিন্তু সুরতান প্রথমে দেহের নিম্নভাগ প্রবেশ করাইয়া পরে মাথা গলাইলেন। তাঁহার এই মহৎ আত্মসম্মানের

দেখিয়া যশোবন্ত তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন এবং রাজাও (আরংজেব) সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি শুধু ক্ষমাই করিলেন না, প্রভূত ভূ-সম্পত্তিও দান করিলেন। যদিও রাজা সবটুকু খুলিয়া বলিলেন না, সুরতান শর্ত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মহারাজ! অচলগড়ের তুল্য আপনার কি আছে? আমাকে সেখানে ফিরে যেতে দিন এবং আমি তাই চাই।" সুরতানের এই অনুরোধ রাখিবার মতো রাজার মহত্ত্ব ছিল; আবু দুর্গে (অচলগড়) সুরতানকে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইল।[১৭]

কবিতায় কেবল শেষের অংশটুকু গৃহীত হয়েছে— যখন সম্মান ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে রাজা যশোবন্ত সুরতানকে আরংজেবের দরবারে হাজির করলেন। আরংজেব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন; আর শুধু তাই নয়, সুরতানকে অচলগড়ে অচল হয়ে বাস করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। আরংজেবের এই আচরণ প্রচলিত ধারণার বিরোধী হলেও নিঃসন্দেহ সত্য। সুরতানের প্রতিজ্ঞা, "গুরুজনের চরণ ছাড়া করি নে কারে প্রণিপাত।" তাঁর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে সংকীর্ণ ও নিচু দরজা দিয়ে তাঁকে প্রবেশ করবার চেষ্টা সত্য হতে পারে, যে ভাবে সুরতান প্রবেশ করলেন তা তেজোব্যঞ্জক হতে পারে, তবু কবি তাকে পরিত্যাগ করেছেন, কেননা তেজপ্রকাশের এই কায়িক কসরৎ কাব্যে হাস্যকর প্রতিভাত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। প্রবলপরাক্রান্ত মোগল বাদশার সম্মুখে

এমন যেন না হয় মতি
ভয়েতে কারে করিব নতি—
জানি নে কভু ভয়-ডর।

এই-সমস্ত উক্তিকেই কবি যথেষ্ট মনে করেছেন।

---

১৭ James Todd, *The Annals and Antiquities of Rajasthan*, Vol. II.

পণরক্ষা কবিতাটির আখ্যায়িকাটিও টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত। আজমীড় গড় -রক্ষার প্রতিশ্রুতি এবং প্রভুর আদেশের উভয়-সংকটেও দুর্গরক্ষক দুমরাজের বীরোচিত প্রাণত্যাগ অংশটুকু নিয়েই কবিতাটি রচিত। আগে সেই প্রাসঙ্গিক অংশ দেখা যাক, পরে কিছু পূর্ব-ইতিহাসের প্রয়োজন হবে।

> Tonga-র ক্ষণস্থায়ী বিজয়ে আজমীড় বিদ্রোহ করিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় চিরতরে মাড়োয়ারের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইল।...
>
> দুমরাজ উভয়-সংকটে পড়িয়াছিলেন—এক দিকে অসম্মান-জনক আত্মসমর্পণ, অন্য দিকে প্রভুর নির্দেশের অবমাননা; এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া তিনি হীরক-চূর্ণ উদরস্থ করিলেন। বিশ্বস্ত ভৃত্য কহিলেন, "রাজাকে বলিয়ো—এইভাবেই আমি আমার আনুগত্যের প্রমাণ দিলাম, আমার মৃতদেহ মাড়াইয়া তবেই একজন দক্ষিণী আজমীড়ে প্রবেশ করিতে পারিবে।"[১৮]

Tonga-র যুদ্ধে মাধাজি সিন্ধিয়া ও তাঁর সেনাপতি De Boigne সম্মিলিত রাজপুত শক্তির কাছে পরাজিত হল। তার চার বছর পরে ১৭৯১ সালে Patun ও Mairta-র যুদ্ধে রাজপুতরা সম্পূর্ণ পরাজিত হল মারাঠাদের কাছে। এই পরাজয়ের ফলে আজমীড়ের ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতা লোপ পেল। De Boigne আজমীড় গড় অবরোধ করলে দুর্গরক্ষক দুমরাজ হীরক-চূর্ণ পান করে উভয়-সংকটের বীরোচিত সমাধান করল। দুর্গাধিপতি বিজয় সিংহ কর্তৃক দুর্গসমর্পণের কথা ইতিহাসে নাই। কবিতার "সিন্দে আসিছে, সঙ্গে তাহার ফিরিঙ্গি সেনাপতি", সুবিখ্যাত মাধাজি

১৮ James Todd, *Annals of Rajasthan*, *Annals of Marwar*, Vol. II.

সিন্ধিয়া ও তাঁর ফরাসী সেনাপতি De Boigne—দুজনেই অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

রাজবিচার কবিতার আখ্যায়িকাকে ইতিহাসের গৌরব দেওয়া যায় না, কারণ এই ঘটনার সঙ্গে বহু লোকের ভাগ্যের উত্থানপতন জড়িত নয়, এ নিতান্তই একটি ব্যক্তিগত কাহিনী। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, এমনি-সব বিস্মৃত ব্যক্তিগত কীর্তির সোপানেই একটা জাত ঐতিহাসিক মাহাত্ম্যের শিখরে আরোহণ করে। মানুষ বড়ো হলে তবেই জাত বড়ো হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। সামষ্টিক কীর্তিতে জাত শক্তিমান হতে পারে, মহৎ হয় কি না সন্দেহ। রাজবিচার ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কবিতাটির বস্তু বা মূল আখ্যায়িকা এই রকম—

> রতন রাও চার পুত্র রাখিয়া (মারা) যান। অন্যতম পুত্র বুঁদির উত্তরাধিকারী গোপীনাথ পিতার মৃত্যুর পূর্বেই মারা যান। যে ভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তাহা রাজপুত-চরিত্রের আর-এক উজ্জ্বল নিদর্শন এবং তাহা ঐতিহাসিক রোমান্সের বিষয়বস্তু। বুলদীয়া শ্রেণীর এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সহিত গোপীনাথের অবৈধ সম্পর্ক ছিল; তিনি গভীর রাতে গুপ্তদ্বার দিয়া সেই গৃহে যাতায়াত করিতেন। অবশেষে একদিন তিনি ব্রাহ্মণকর্তৃক ধৃত হইলেন; তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ রতন রাওকে বলিলেন যে, সম্মান-হরণকারী এক চোরকে তিনি ধরিয়াছেন এবং তাহার উপযুক্ত শাস্তি কি? উত্তর আসিল 'মৃত্যু'।
>
> ব্রাহ্মণ আর অপেক্ষা করিলেন না; বাড়ি ফিরিয়া এক হাতুড়ির সাহায্যে অপরাধীর মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন এবং মৃতদেহটি প্রকাশ্য রাজপথে ফেলিয়া রাখিলেন। রতন রাও-এর কাছে খবর পৌঁছিল যে, বুঁদির উত্তরাধিকারী নিহত হইয়াছেন, এবং যখন তাঁহাকে তাঁহার আদেশ-জারির কথা স্মরণ করানো

হইল, তখন তিনি নীরব রহিলেন।[১৯]

আখ্যায়িকাটি সামান্য কিছু পরিবর্তিত হয়েছে কবিতায়। "বুলদীয়া শ্রেণীর এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সহিত গোপীনাথের (রাজপুত্রের) অবৈধ সম্পর্ক ছিল; তিনি গভীর রাতে গুপ্তদ্বার দিয়া সেই গৃহে যাতায়াত করিতেন।" এতে গোপীনাথের অপরাধের গুরুত্ব না কমলেও দায়িত্ব ভাগ হয়ে যায়, আর তার ফলে পাঠকের খানিকটা সহানুভূতি তার প্রাপ্য হয়। সেই সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যেই কবি ঘটনাটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করেছেন। হাতুড়ির আঘাতের মধ্যে যে নিষ্ঠুর বীভৎসতা আছে তাতেও সহানুভূতি জাগ্রত হয় পাঠকের মনে। কাজেই সেটিও বাদ পড়েছে। কবি কোথাও কোনো সহানুভূতির রন্ধ্র না রেখে ঘটনাটিকে একটি নিদারুণ নির্মমতা দিয়েছেন, যার ফলে রতন রাও-এর মহত্ত্ব সমধিক ফুটে উঠেছে। আখ্যায়িকায় "তিনি নীরব রহিলেন" কবিতায় "মুক্তি দাও" আদেশে মুখর হয়ে উঠে রাজবিচারের নিরপেক্ষতার জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়েছে।

কথার কবিতাগুলিকে অনেকে ব্যালাড-জাতীয় রচনা মনে করেন কিন্তু এগুলিকে ব্যালাড বলা যায় কি না সন্দেহ। লিখিতকাব্যের বড়ো বেশি ভদ্র রূপ, মৌখিককাব্য ব্যালাডের একটি অশিক্ষিত-পটুত্ব আছে। বন্য অশ্বের সঙ্গে তুলনীয় এই শ্রেণীর রচনার প্রধান ঐশ্বর্য দুর্বার গতি—ঘটনার গতি, ভাবনার গতি, ছন্দের গতি। ব্যালাডের এই-সব গুণ কিছু পরিমাণে হোরিখেলা কবিতাটিতে আছে, আর সেদিকের বিচারে এটি কথাকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

জেষ্টির (Jaestsi) বংশধরবৃন্দ কয়েক পুরুষ ধরিয়াই দুর্গ এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলি অধিকার করিয়া ভোগ করিতেছিলেন;

১৯ James Todd 'Annals of Haravati', *The Annals and Antiquities of Rajasthan*, Vol. II

পঞ্চম বংশধর ভূনাংশি বুদির রাও সূরজমলকর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। জেষ্টির সুরজান নামে এক পুত্র ভীল-প্রদেশের নাম দিয়াছিলেন কোটা; তিনি তাহার চারি দিকে প্রাচীর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ধীরদেও বারোটি দিঘি এবং নগরের পূর্বদিকে বিরাট জলাশয় খনন করান। এখনো তাহা 'কিশোর সাগর' নামে খ্যাত। তাঁহার পুত্র কণ্ডুল কোটা হারাইয়া ফেলেন এবং নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা পুনরুদ্ধার করেন।

ঢাকুর এবং কেশর খাঁ নামে দুই পাঠান কোটা অবরোধ করিয়াছিল। ভূনাগরাজা অতিরিক্ত আফিংসেবন এবং মদ্য-পানের ফলে পাগল হইয়া গিয়াছিলেন এবং বুঁদি হইতে নির্বাসিত হন। তাঁহার পত্নী কেতুনে বাস করিতেছিলেন; এই কেতুন নগরের চারিপাশে হারাবংশীদের তিনশত ষাটটি গ্রাম ছিল। নির্বাসনকালীন অবস্থায় ভূনাগরাজা অনুতপ্ত হন; ভুল বুঝিতে পারিয়া পত্নী এবং আত্মীয়বর্গের নিকট ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন। বীরাঙ্গনা রানী এই পুনর্জীবনে খুশি হইলেন এবং সংকল্প করিলেন যে, কোটা উদ্ধার করিতেই হইবে; এবং রাজাকে এই কাজের ভার লইবার জন্য বলিলেন। রানী বুঝিলেন যে, যুদ্ধে জয় করিতে চেষ্টার অর্থ ধ্বংস ডাকিয়া আনা। কাজেই তিনি সাহসের সঙ্গে কূটনীতির পথ অবলম্বন করিলেন। যখন আনন্দমুখর বসন্তের আবির্ভাব হইল, কেতুনের সুন্দরী যুবতীদের সহিত হোলিখেলার জন্য তিনি নিজেই কোটার পাঠানদের আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। দুষ্ট মদ্যপ পাঠানেরা গভীর উল্লাসের সহিত সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। বিশেষতঃ যখন তাহারা দেখিল যে কেতুনের রানী স্বয়ং তাহাদের প্রতি আসক্তি দেখাইয়াছে তখন তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। বীরশ্রেষ্ঠ তিন শত হারা যুবক সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহাদিগকে

নারীর পোষাকে সজ্জিত করাইলেন এবং স্বয়ং ভূনাগ বৃদ্ধা পরিচারিকা পরিবৃত হইয়া, সকলেই আবীর-পূর্ণ পাত্র লইয়া প্রস্তুত রহিলেন। যখন সেই তরুণের দল পাঠানদের দিকে আবীর ছুঁড়িতেছিলেন, বৃদ্ধা পরিচারিকা ভূনাগকে তাহাদের প্রধানের (সেনাপতির) সহিত খেলিবার ইঙ্গিত দিলেন। ছদ্মবেশী হারা (রাজা) কেশর খাঁর মস্তক লক্ষ্য করিয়া পাত্রটি ছুঁড়িয়া মারিলেন। ইহাই ছিল আক্রমণ করিবার ইঙ্গিত। রাজপুতেরা তাহাদের ঘাগড়ার ভিতর হইতে তরবারি বাহির করিয়া কেশর খাঁ এবং তাহার সঙ্গীদের সেইস্থলেই নির্মমভাবে হত্যা করিল; উৎসব-প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে মৃতদেহগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া ছড়াইয়া রহিল।[২০]

উদ্‌ধৃত আখ্যায়িকার প্রথম অংশ কাহিনীর পশ্চাৎপট, কবিতায় অনাবশ্যক বোধে বাদ পড়েছে। কোটা শহর উদ্ধারের আশায় ভূনাগ -রাজারানীর সংকল্প থেকে কবিতার সূত্রপাত, তার পরে সমস্ত কবিতা অকস্মাৎ-নিষ্কাশিত তরবারির চমকে ঝিকিয়ে উঠেছে আর চরম পরিণামে পৌঁছতেও বিলম্ব হয় নি। আখ্যায়িকার মধ্যেই একটা প্রচণ্ড বেগ ছিল; কবির কৃতিত্ব, সে বেগ কোথাও ব্যাহত হতে দেন নি।

নকল গড় কবিতায় ও আখ্যায়িকায় প্রভেদ নামে মাত্র। আখ্যায়িকায় কুম্ভ একক নয়, তার সঙ্গে আছে আরও কয়েকজন হারাবংশী রাজপুত। প্রতিজ্ঞারক্ষার এমন হাস্যকর দৃষ্টান্তের অভাব নাই ইতিহাসে, কর্নেল টড নিজেও এই রকম একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।[২১] এ যুগের লোকের চোখে কুম্ভ ও তার সহচরদের

২০ 'Annals of Haravati', *The Annals and Antiquities of Rajasthan*, p. 376.

২১ James Todd, 'Annals of Haravati: Boondi', *The Annals and Antiquities of Rajasthan.*

নিশ্চিত মৃত্যুপণ কিভাবে প্রতিভাত হবে জানি না, কিন্তু সে যুগে এটাই ছিল রাজপুতদের জাতিচরিত্র। প্রত্যেক সমাজেই দু-দশ জন বীর জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বীরত্ব যখন বহুব্যাপক আকারে দেখা দেয় তখনই সমাজ বীরের সমাজে পরিণত হয়। সে যুগে রাজপুতনা ছিল এই আর্যবীরের দেশ।

এইভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের কাছে পরাজিত হইয়া অপমানিত রুষ্ট চিত্তে (মেবারের) রানা চিতোরের অভ্যন্তরে তাঁহার সৈন্যদলকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বুঁদি জয় না করা পর্যন্ত জলগ্রহণ করিবেন না। তাঁহার এই কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু বুঁদি ছিল ষাট মাইল দূর এবং তদুপরি তাহা আবার বীর সৈনিক দ্বারা পরিবৃত। প্রধান (সহকারীবৃন্দ) তাঁহার এই অনমনীয় প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু রাজবাক্য নাকি পবিত্র এবং অবশ্যপালনীয়, সুতরাং বুঁদি জয় করিতেই হইবে, অন্যথায়...

এই আসন্ন বিপদে, অতি শিশুসুলভ এক পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গৃহীত হইল, যাহাতে রানাকে ক্ষুধার হাত হইতে অব্যাহতি দেওয়া যায়, প্রতিজ্ঞাও রক্ষা হয়। এক নকল বুঁদিগড় তৈয়ারি করিবার কথা উঠিল এবং তাহা জয় করিলেই সমস্যা মিটিয়া যাইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই নকল গড় চিতোরের প্রাচীরের মধ্যে রচিত হইল।...একদল হারাবংশী চিতোরের মধ্যে কার্যে নিযুক্ত ছিল; তাহাদের সর্দার কুম্ভ হরিণশিকার করিয়া ফিরিতেছিল। হঠাৎ এই বিচিত্র দুর্গের দিকে দৃষ্টি পড়িল। তাহাদিগকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলা হইল যে বুঁদির পতন হইলে তবে রানা জলগ্রহণ করিবেন। কুম্ভ তাহার সকল সহচরদের একত্রিত করিয়া ঘোষণা করিল যে, এই নকল বুঁদিগড়কেও রক্ষা করিতে হইবে। তাহারা সকলেই

জাতির অসম্মান মর্মে মর্মে অনুভব করিল। প্রত্যেকের হৃদয় অপমানের আগুনে পুড়িতে লাগিল। তাহারা সকলেই অপমানের হাত হইতে নকল বুঁদির মাটির দেওয়াল রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। (এ দিকে) রানাকে জানানো হইয়াছিল যে বুঁদিগড় তৈয়ারি হইয়াছে। তিনি সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন কিন্তু গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে ফাঁকা আওয়াজের পরিবর্তে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাবর্ষণের শব্দ শুনিলেন। খবর আনিতে ছুটিল একজন দূত। দ্বারদেশেই তাহার সহিত কুম্ভের অনুচরের দেখা হইল। এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া সেই দ্বাররক্ষী অনুচর তাহাকে জানাইল যে দূত যেন রানাকে গিয়া বলে যে, হারাবংশীর এই নকল রাজধানীকেও তাহারা অসম্মানের হাত হইতে বাঁচাইবে। তাহারা সেই সংকীর্ণ প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আক্রমণকারীদের আমন্ত্রণ জানাইল এবং মাটির বুঁদির (Gar-Ca-Boondi) প্রবেশপথে জাতির সম্মান রক্ষার জন্য একে একে প্রাণ হারাইল।[২২]

জাতিচরিত্র ও বীরজাতির উল্লেখ করেছি, তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ বিবাহ কবিতার আখ্যায়িকা। বীরত্বের প্রকৃত উদ্ভব অন্তঃপুরে। যে দেশে নারী দুর্বল সে দেশে পুরুষ সবল হতে পারে না। সাহস এমন একটা গুণ যা মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সন্তানের দেহে প্রবেশ করে। বিবাহ কবিতায় নায়ক ও নায়িকার মধ্যে কে বেশি সাহসী? দু জনেই সমান, দু জনেই বীর মাতার স্তন্যে লালিত।

আখ্যায়িকাটি করুণ ও হৃদয়গ্রাহী। মৌলিক ঘটনা ও ভাবের এতটুকু পরিবর্তন করবার প্রয়োজন বোধ করেন নি কবি, কেবল চিতাসনের চারদিক ঘিরে চোখের জলের একটি আলপনা এঁকে সেকালের জয়ধ্বনির সঙ্গে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছেন।

২২ James Todd, 'Annals of Haravati : Boondi', *The Annals and Antiquities of Rajastan.*

মেত্রীর উত্তরাধিকারীর মৃত্যু এমন একটি মহান বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা যার তুলনা এডোয়ার্ড এবং ক্রেসীর ইতিহাসে মিলিবে না। তিনি এই রণক্ষেত্রে তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতাদের সহিত আত্মরক্তে তাঁহার সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্য প্রমাণ করিয়াছিলেন। বহুপূর্বে নিরুক্ষ-প্রধানের এক কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ স্থির ছিল। যখন বিবাহ-অনুষ্ঠানে ব্যস্ত তখন মেরতায় বিদ্রোহীদের উপস্থিতির সংবাদ তাঁহার কাছে পৌঁছিল। বিবাহ-বন্ধন এইমাত্র সম্পন্ন হইয়াছে। উভয়ের হস্ত তখনও আবদ্ধ। কিন্তু তিনি ভুলিতে পারেন না যে তিনি মের্‌তীয়া। তখনই সুন্দরী নিরূকী-কন্যার হস্ত মুক্ত করিয়া তিনি যুদ্ধ-অপ্সরীর আকর্ষণে ছুটিয়া গেলেন। বিবাহ-সজ্জায়, মুকুটাবৃত ভালে তিনি যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে তাঁহার স্বজাতীয়দের পাশে আপন স্থান গ্রহণ করিলেন এবং 'ইন্দ্র-সভায় এক সুর-সুন্দরীকে লাভ করিলেন'।

মারু কবিগণ মেত্রীর তরুণ উত্তরাধিকারীর গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী স্মরণ করিয়া চারণকাব্য লিখিয়াছেন—

কান এ মুটি বুলবুল্লা
গুল্লা সোনি এ মাল্লা
আসি কোশ কুরো হো আয়া
কুনওয়ার মেত্রীবালা।

"কর্ণে মুক্তা এবং কণ্ঠে স্বর্ণালঙ্কার-শোভিত মেত্রীর উত্তরাধিকারী আশি ক্রোশ অতিক্রম করিয়া অসিয়াছেন।"

কুমারীকন্যা উদয়পুর হইতে তাঁহার প্রভুর অনুগমন করিতেছিলেন। কিন্তু মেত্রীদেশে সানাই অথবা কোনো উৎসবানুষ্ঠান তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে নাই। তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল ক্রন্দন ও শোকাশ্রু। সংবাদ আসিল মের্‌তীয়া বংশের সমর্থকদের আর কেহই জীবিত নাই। তিনি চিতাসজ্জার আদেশ দিলেন এবং এই সর্বনাশা দিনে যে বেশে

তাঁহার প্রভু শায়িত ছিলেন সেই বেশে সূর্যলোকে তাঁহার অনুগমন করিলেন।[২৩]

কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের প্রথম পরিচয়। প্রথমবার বিলাত গমনের প্রাক্কালে আমেদাবাদে শাহিবাগ নামে এক প্রাচীনকালের প্রাসাদে জজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে তিনি কিছুকাল বাস করেন। তখনকার দিনে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র একত্রে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি নামে পরিচিত ছিল। কাজেই রাজনৈতিক পরিচয় যাই হোক আমেদাবাদকে মহারাষ্ট্র না বলাই সংগত। আমেদাবাদে কয়েক মাস কাটাবার পরে কিশোর কবি বোম্বাই শহরে এক শিক্ষিত মহারাষ্ট্র-পরিবারে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। এই সময় থেকেই মহারাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত ধরা উচিত। তার পরে কবি বিলাত চলে যান, কিন্তু মহারাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্র ছিন্ন হয়ে যায় নি। ১৮৯৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তার আগে পর্যন্ত অনেকবার কবি মহারাষ্ট্রে গিয়েছেন মধ্যম অগ্রজের কাছে—কখনো শোলাপুরে, কখনো পুণায়, কখনো কারোয়ারে। কারোয়ারে লিখিত হয় প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্য। মহারাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার স্থান এ প্রবন্ধ নয়, তবে এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে, বাংলাদেশকে ছেড়ে দিলে মহারাষ্ট্রই তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। কিন্তু কথাকাব্যে এ পরিচয় খুব স্পষ্ট নয়, কেননা মহারাষ্ট্র-সম্পর্কিত দুটিমাত্র কবিতা এখানে পাওয়া যায়—প্রতিনিধি (১৮৯৭) এবং বিচারক (১৮৯৯)। যদিচ আরও দুটি রচনা কবির গ্রন্থাবলীতে অন্যত্র পাওয়া যাবে— সতী (নাট্যকাব্য, ১৮৯৭) এবং শিবাজী-উৎসব (১৯০৪)। শিখসম্প্রদায় ও রাজস্থান সম্বন্ধে লিখিত কবিতার সংখ্যা বেশি।

২৩ James Todd, *The Annals and Antiquities of Rajasthan*, Vol. I.

মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে কবিতা আরও বেশি আশা করাই যখন সংগত তখন এই অপ্রতুলতার কারণ নির্দেশ সহজ নয়। খুব সম্ভব উপযুক্ত বস্তু বা আখ্যায়িকা কবির চোখে পড়ে নি। যাই হোক এখানে আমাদের এই দুটি কবিতা নিয়েই আলোচনা করতে হবে, প্রসঙ্গত এসে পড়বে শিবাজী-উৎসব কবিতা।

প্রতিনিধি, বিচারক ও শিবাজী-উৎসব কবিতা-তিনটির তাৎপর্য বুঝাবার উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রের তৎকালীন রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আবশ্যক। "উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ভারত-বর্ষময় জাতীয়তাবোধের যে-নূতন প্রেরণা দেখা দিয়াছিল, তাহার হোতা ছিলেন বালগঙ্গাধর টিলক।...টিলক মহারাষ্ট্রীয়দের গণপতি-পূজাকে 'সার্বজনিক' গণদেবতার পূজায় রূপান্তরিত করিয়া মারাঠা-দের ধর্মীয় জীবনে সংঘচেতনা আনয়ন করেন। এই গণধর্ম-বোধের সহিত রাজনৈতিক আত্মচেতনা প্রবুদ্ধ করিবার জন্য শিবাজী-উৎসব প্রবর্তিত হয়।...শিবাজী-উৎসব মারীভয়ের (প্লেগ) জন্যে শিবাজীর জন্মদিনে অনুষ্ঠিত না হইয়া ১৩ই জুন (১৮৯৭) সম্পন্ন হইল।"[২৪]

প্রতিনিধি কবিতাটি ১৮৯৭ সালের ৬ কার্তিক লিখিত, কাজেই ঘটনা ও কবিতার মধ্যে যোগাযোগ-কল্পনা অসংগত নয়। শিবাজী-উৎসব কয়েক বছর পরে লিখিত, তবে তারও মূলে একটি সাময়িক ঘটনা আছে।

"আট বৎসর পূর্বে (১৮৯৭) মহারাষ্ট্র দেশে যে শিবাজী-উৎসব প্রবর্তিত হয়...এতদিন মারাঠিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এই সময়ে সখারাম গণেশ দেউস্কর ইহাকে বাংলাদেশে প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি 'শিবাজীর দীক্ষা' নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন, রবীন্দ্রনাথ উহারই ভূমিকাস্বরূপ 'শিবাজী-উৎসব' নামে কবিতা লিখিয়া দেন। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারতের যে

---

২৪ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "ভারতীর সম্পাদক", রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড (১৩৬৭)।

স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা কালে হিন্দুভারতের ধ্যানের বস্তু হইয়া উঠে।"[২৫]

কাজেই দেখা যায় যে দুটি কবিতাই, বিশেষ শেষেরটি, নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেরণায় লিখিত হলেও ঘটনার উপসংহার না হয়ে মুখপাত্র হয়ে ওঠে। এখন সাময়িক উত্তেজনায় লিখিত কবিতাকে কবির সুচিন্তিত অভিমত বলে গ্রহণ উচিত কি না তা বিবেচনার বিষয়। সাময়িক উত্তেজনা কেটে যাওয়ার অনেক পরে শিবাজী ও গুরু-গোবিন্দ সিংহ (১৯১০) নামে যে প্রবন্ধ কবি লিখেছিলেন তাতে কতক পরিমাণে পূর্বপ্রকাশিত মতকে তিনি সংশোধিত করেছেন। শিবাজীর অখণ্ড ভারতের ধ্যানকে স্বীকার করে নিয়েও, কেন তা সম্ভব হয় নি বলেছেন কবি। কবিতা-দুটির সঙ্গে প্রবন্ধটিকে মিলিয়ে নিলে তবেই শিবাজী ও তাঁর আদর্শ সম্বন্ধে কবির সুচিন্তিত অভিমত পাওয়া সম্ভব মনে হয়।

"শিখ-ইতিহাসের সহিত মারাঠা-ইতিহাসের প্রধান প্রভেদ এই যে, যিনি মারাঠা-ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান নায়ক সেই শিবাজী হিন্দুরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে সুপরিস্ফুট করিয়া লইয়াই ইতিহাসের রঙ্গক্ষেত্রে মারাঠা জাতির অবতারণা করিয়াছিলেন; তিনি দেশজয় শত্রুবিনাশ রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি যাহা-কিছু করিয়াছেন সমস্তই ভারতব্যাপী একটি বৃহৎ সংকল্পের অঙ্গ ছিল।"[২৬]

আবার আছে—

"শিবাজী যে-সকল যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা সোপান-পরম্পরার মতো; তাহা রাগারাগি লড়ালড়ি মাত্র নহে। তাহা সমস্ত ভারতবর্ষকে এবং দূর কালকে লক্ষ্য করিয়া একটি বৃহৎ আয়োজন বিস্তার করিতেছিল, তাহার মধ্যে একটি বিপুল আনুপূর্বিকতা ছিল।"[২৬]

---

২৫ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "বঙ্গবিচ্ছেদ ও স্বদেশীসমাজ", রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৬৮)। শিবাজী-উৎসব কবিতার প্রকাশ: বঙ্গদর্শন, ভারতী, আশ্বিন ১৩১১ (১৯০৪)।

২৬ "শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ", ইতিহাস।

এ পর্যন্ত 'শিবাজী-উৎসবে' প্রকাশিত মন্তব্যের সঙ্গে মেলে। তার পরেই সামালোচনা—কেন শিবাজীর স্বপ্ন সফল হল না তার কারণ বিচার। কিছুদিন সময় লেগেছে কবির এই কারণটিতে পৌঁছাতে।

"শিবাজী তাঁহার সমসাময়িক মারাঠা-হিন্দু সমাজে একটা প্রবল ভাবের প্রবর্তন এতটা পর্যন্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অভাবেও কিছুদিন পর্যন্ত তাহার বেগ নিঃশেষিত হয় নাই। কিন্তু শিবাজী সেই ভাবের আধারটিকে পাকা করিয়া তুলিতে পারেন নাই, এমন-কি চেষ্টামাত্র করেন নাই। সমাজের বড়ো বড়ো ছিদ্রগুলির দিকে না তাকাইয়া তাহাকে লইয়া ক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। তখনই পাড়ি না দিলে নয় বলিয়া এবং পাড়ি দিবার আর কোনো উপায় ছিল না বলিয়াই যে অগত্যা এই কাজ করিয়াছেন তাহা নহে। এই ছিদ্রকেই পার করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। শিবাজী যে হিন্দুসমাজকে মোগল-আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচারবিচারগত বিভাগবিচ্ছেদ সেই সমাজেরই একেবারে মূলের জিনিস। সেই বিভাগমূলক ধর্মসমাজকেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বালির বাঁধ বাঁধা, ইহাই অসাধ্যসাধন।

"শিবাজী এমন কোনো ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই যাহা হিন্দুসমাজের মূলগত ছিদ্রগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে। নিজের ধর্ম বাহির হইতে পীড়িত অপমানিত হইতেছে এই ক্ষোভ মনে লইয়া তাহাকে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিজয়ী করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক হইলেও তাহা সফল হইবার নহে; কারণ, ধর্ম যেখানে ভিতর হইতেই পীড়িত হইতেছে, যেখানে তাহার ভিতরেই এমন-সকল বাধা আছে যাহাতে মানুষকে কেবলই বিচ্ছিন্ন ও অপমানিত করিতেছে, সেখানে সেদিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া, এমন-কি সেই ভেদবুদ্ধিকেই মুখ্যত ধর্মবুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া, সেই শতদীর্ণ

ধর্মসমাজের স্বারাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোনো মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে; কারণ, তাহা বিধাতার বিধানসংগত হইতে পারে না।"[২৭]

শিবাজীর কল্পনা, "একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি", বাস্তবের কোন্ অভিশাপে অসম্পূর্ণ থেকে গেল, শতধা হয়ে ভেঙে পড়ল, কবি নিজের সেই ধারণা প্রবন্ধটিতে প্রকাশ করেছেন। কবির ধারণা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করবেন কি না তাঁরাই জানেন। এখানে এই প্রসঙ্গে প্রবেশের কারণ স্বতন্ত্র। কথাকাব্যে ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা প্রকাশ পেয়েছে এবং কালক্রমে তার যে পরিবর্তন ঘটেছে সেই আলোচনা আমাদের একটি উদ্দেশ্য; আর তাকে বস্তুবিচারের অন্তর্গত মনে করলে অন্যায় হবে না। এ বিষয়ে প্রয়োজন হলে আরও আলোচনা করা যাবে।

প্রতিনিধি কবিতাটিতে শিবাজীর চরিত্রগত মহত্ত্বের আশ্চর্য এবং অনেকের কাছে অপ্রত্যাশিত একটি দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। শিবাজী প্রবলপ্রতাপান্বিত মোগল বাদশা আরংজেবের প্রতিদ্বন্দ্বী, রাজ্যস্থাপয়িতা, ও বিরাট সংগঠনপ্রতিভাশালী-কূটনীতিজ্ঞ ও অসমসাহসিক যোদ্ধা— এ-সকল তথ্য সুবিদিত। কিন্তু তাঁর মধ্যে একটি ধর্মপিপাসু উদাসীন ব্যক্তি ছিল। তুকারাম ও রামদাসের মতো সাধুপুরুষের সঙ্গ তিনি কামনা করতেন, মাঝে মাঝে তাঁদের আশ্রমে গিয়ে বাস করতেন, অনেকবার তাঁদের নিজের কাছে স্থায়ীভাবে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন, আর সদাসর্বদা কেবল তত্ত্বজিজ্ঞাসায় নয়, রাজ্যজিজ্ঞাসার ব্যাপারেও তাঁদের উপদেশ ও পরামর্শ প্রার্থনা করতেন। শিবাজী-চরিত্রের এই দিকটি সম্বন্ধে অনবহিত পাঠকের কাছে প্রতিনিধি কবিতার বিষয়টি অবাস্তব মনে হতে পারে, মনে হতে পারে গুরুর যতই গুরুত্ব হোক রাজার পক্ষে তাঁকে রাজ্যদান ও শিষ্যত্ব গ্রহণ একেবারেই অসম্ভব অর্থাৎ কিনা

২৭ "শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ", ইতিহাস

কবিকল্পনা। বিংশ শতকের চোখে অনেক মহত্ত্বই অসম্ভব বা কবি-কল্পনা। প্রাচীন ভারতে রাজশিষ্য ও গুরুর মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল মনোরম শিবাজী-চরিত্রে সেই ধারাটি রক্ষিত হয়েছে দেখা যায়।

কবিতাটির বস্তু বা আখ্যায়িকা[২৮] পাঠ করলে দেখা যাবে যে দুয়ে বড়ো ভেদ নেই। বস্তু এমন মহৎ ও মনোরম যে কবি সামান্য চেষ্টাতেই সার্থক একটি কবিতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

বস্তুর অবিকল রূপ যদুনাথ সরকার-প্রণীত শিবাজী গ্রন্থে আছে।[২৯] অন্য একখানি ইংরাজি গ্রন্থে[৩০] অতিরিক্তর মধ্যে আছে "Shivaji insisted that the saint should bestow on him his sandals as Rama had done to his brother Bharata, so that the world might know that Ramdas and not he was the true King."

কাহিনীর এই রূপান্তর রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল কি না জানি না; না পড়লেও গুরুর বা গুরুজনের পাদুকা-প্রতিষ্ঠার রীতি ভারতীয় সাহিত্যে ও ইতিহাসে সুবিদিত, কাজেই কবির পক্ষে কল্পনা করে নেওয়া অসম্ভব নয়, যদিচ কবিতায় পাদুকাটি রূপক—

হে রাজা, রেখেছি আনি
তোমারি পাদুকাখানি,
আমি থাকি পাদপীঠতলে।

এবং রামদাসের মুখে তা উচ্চারিত।

বিচারক কবিতার বস্তু বা আখ্যায়িকা নানা রূপান্তরে পাওয়া যায়, আর মূল ঘটনা সম্বন্ধেও বাদানুবাদের অন্ত নাই। মোট কথা এই যে, নারায়ণ রাও পেশোয়া হওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই নিহত হন। অনেকে সন্দেহ করেন খুল্লতাত রঘুনাথ রাও-এর হুকুমে কাণ্ডটি ঘটেছে। রাজ্যের প্রধানগণ স্বভাবতই হাঁ এবং না দুই দলে

২৮ দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট।

২৯ যদুনাথ সরকার, "শিবাজীর রাজ্য এবং শাসনপ্রণালী", শিবাজী।

৩০ *A History of the Maratha People*, Chapter VII.

বিভক্ত হয়ে পড়লেন। চীফ জাস্টিস বা ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী হাঁ-এর দলে। তিনি রায় দিলেন যে রঘুনাথ রাও-এর হুকুমে নারায়ণ রাও নিহত হয়েছেন। তিনি আরও বললেন যে, যতদিন রঘুনাথ রাও শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ততদিন তিনি সরকারী চাকুরি করবেন না, এমন-কি পুণা শহরেও অবস্থান করবেন না। নিজের ঘোষণা অনুসারে পুণা ও সরকারী চাকুরি পরিত্যাগ ক'রে "গ্রামের কুটীরে চলি গেলা ফিরে দীন দরিদ্র বিপ্র।"৩১

কবিতায় ও আখ্যায়িকায় এখানে অনেক প্রভেদ। রঘুনাথ রাও এবং রামশাস্ত্রীর চরিত্র অবশ্যই যথাযথ অঙ্কিত, কিন্তু আখ্যায়িকায় নাটক নাই; কবির কৃতিত্ব রঘুনাথ রাও এবং রাম-শাস্ত্রীকে সংকটের মুখে এনে নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে। রঘুনাথ রাও রাজ্যের শত্রুর বিরুদ্ধে (নিজাম্-উল্-মুল্‌ক) যুদ্ধে চলেছেন, অপকীর্তি ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে চিরকাল শাসকগণ এই পন্থাটি অবলম্বন ক'রে থাকেন, এমন সময়ে পথরোধ ক'রে এসে দাঁড়ালেন ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী—

'রঘুনাথ রাও,
নগর ছাড়িয়া কোথা চলে যাও
না লয়ে পাপের শাস্তি।'

রঘুনাথ রাও-এর ডিক্‌টেটরী চালটা ভালোই জানা ছিল—

'নৃপতি কাহারো বাঁধন না মানে,
চলেছি দীপ্ত মুক্ত কৃপাণে,
শুনিতে আসি নি পথমাঝখানে
ন্যায়বিধানের ভাষ্য।'

তখন

কহিলা শাস্ত্রী, 'রঘুনাথ রাও,
যাও কর গিয়ে যুদ্ধ।

৩১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।’

সামান্য একটা অপ্রমাণিত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে কিনা রাষ্ট্রশক্র-দলনের পথে বাধা সৃষ্টি! এ যুগের নজিরের বলে মনে হয় মারাঠার অধিকাংশ লোক ছিল রঘুনাথ রাও-এর পক্ষে। হায় ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রীর দল! তবে সে যুগে গ্রামে ফিরে গিয়ে রামশাস্ত্রীর পক্ষে আত্মরক্ষা সম্ভব হয়েছিল, এ যুগে হলে শেষ পর্যন্ত কতদূর কি হত কে জানে।

এই নাটকীয় চমৎকারিত্বটুকুই কবিতাটির প্রাণ এবং এ কৃতিত্ব আখ্যায়িকায় নেই; এ হচ্ছে কবির সৃষ্টি।

পেশোয়া নারায়ণরাও-এর মৃত্যুর পূর্ণ কাহিনীটি পরিশিষ্টে দেওয়া হল।

কবিতা-দুটির একটির কাহিনী মহারাষ্ট্র-রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতার জীবনী থেকে গৃহীত, অপরটি গৃহীত অনেক পরবর্তী কালের একজন পেশোয়ার জীবনী থেকে। বিষয়-নির্বাচন আকস্মিক বলে মনে হয় না, এর মধ্যে একটি নীতি বর্তমান মনে করবার কারণ আছে। যে-সব গুণের সদ্‌ভাবে রাজ্যপ্রতিষ্ঠারূপ বৃহৎ ও মহৎ কার্য সম্ভব তার দৃষ্টান্ত শিবাজী-চরিত্র—যোদ্ধা ও কূটনীতিজ্ঞ শিবাজীর মধ্যে যে ধর্মপিপাসু উদাসীন ব্যক্তি বিরাজমান সেই চরিত্রটি। আর যে-সব গুণের অভাবে গড়া রাজ্য ভেঙে পড়ে তারই উদাহরণ রঘুনাথ রাও, যিনি ন্যায় ও ধর্মকে পদদলিত করতে দ্বিধা বোধ করেন না।

“শিবাজীর মনে যাহা বিশুদ্ধ ছিল, পেশওয়াদের মধ্যে তাহা ক্রমে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা-রূপে কলুষিত হইয়া উঠিল।[৩২]

এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র শিখসম্প্রদায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য

---

৩২ “শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ”, ইতিহাস।

করেছেন তা বোধ করি পেশোয়াদের আচরণ সম্বন্ধেও অপ্রযোজ্য নয়। "তাহারা ত্যাগ শিখিল না, আত্মসমর্পণ শিখিল না, 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ' এ মন্ত্র ভুলিয়া গেল।"[৩৩] শিবাজী গুরুকে রাজ্য ও রাজধানী দান করে ভিক্ষাঝুলি গ্রহণ করলেন, রঘুনাথ রাও লঙ্ঘন করলেন ন্যায়াধীশের অনুশাসন, দুটিই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একটির তাৎপর্য প্রতিষ্ঠায়, অপরটির ধ্বংসে। বিষয়-নির্বাচনের মধ্যে খুব সম্ভব এই ইঙ্গিতটি আছে।

শিখগুরু ও শিখ-ইতিহাস সম্বন্ধে কথাকাব্যে চারটি ও কাহিনী-কাব্যে একটি মোট পাঁচটি কবিতা আছে। তন্মধ্যে তিনটি গুরুগোবিন্দ সম্বন্ধে, অন্য দুটির প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। কবিতাগুলি রচনার সময় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, কেননা ঐ কালভেদে কবির মতভেদ সূচিত হচ্ছে। এই মতভেদ আরও প্রকট হয়ে উঠবে যদি সমকালে ও পরবর্তীকালে কবির লিখিত প্রবন্ধের সঙ্গে মিলিয়ে গুরুগোবিন্দ, নিষ্ফল উপহার, ও শেষ শিক্ষা কবিতা-তিনটি পড়ি। প্রথম কবিতা-দুটির সঙ্গে পরবর্তীকালে পোষিত মতের পার্থক্য বেশি, যদিচ শেষ শিক্ষা কবিতাটির প্রযোজ্যতাও কম নয়। বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশের আগে কবিতা ও প্রবন্ধগুলির নাম ও রচনাকাল পাশাপাশি সাজিয়ে দিলে বুঝবার সুবিধা হবে।

কবিতা	প্রবন্ধ	
গুরুগোবিন্দ, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ : ১৮৮৮	বীরগুরু, শ্রাবণ ১২৯২ : ১৮৮৫	শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ চৈত্র ১৩১৬ : ১৯১০ —ইতিহাস
নিষ্ফল উপহার, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ : ১৮৮৮	শিখ-স্বাধীনতা, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২ : ১৮৮৫ —ইতিহাস	
শেষ শিক্ষা, ৬ কার্তিক ১৩০৬ : ১৮৯৯	৮৪-সংখ্যক পত্র, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ —ছিন্নপত্রাবলী	

৩৩ "শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ", ইতিহাস

কালানুক্রমিক ভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, বীরগুরু ও শিখ-স্বাধীনতা প্রবন্ধ-দুটি রচনার আড়াই বৎসর পরে গুরুগোবিন্দ ও নিষ্ফল উপহার কবিতা-দুটি লিখিত, প্রবন্ধের বক্তব্যে ও কবিতার মন্তব্যে অমিল নাই। তার পরে ছিন্নপত্রাবলীর পত্রখানি। তখনো পত্রে, প্রবন্ধে কবিতায় মতের ঐক্য। শেষ শিক্ষা কবিতাটি রচনার কাল ১৮৯৯ সাল (ঐ সময়েই, মাত্র কয়েক দিন আগে, প্রার্থনাতীত দান ও বন্দী বীর কবিতা-দুটি লিখিত), তখন পর্যন্ত কবির মতের পরিবর্তন ঘটে নি। তার পরে অনেক কয় বৎসরের ব্যবধানে ১৯১০ সালে পাই শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ ; এই প্রবন্ধের বক্তব্য পূর্বমতের পরিপোষক নয়, বস্তুতঃ দুয়ে দুস্তর পার্থক্য। অবশ্য গুরুগোবিন্দ সিংহের ব্যক্তিগত বীরত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে কবির মতের পরিবর্তন হয় নি, হয়েছিল অন্য বিষয়ে ; আর সেটি ব্যক্তিগত বীরত্ব ও মহত্ত্বের চেয়ে অনেক গভীর ও গুরুতর। যথাস্থানে তার আলোচনা হবে। এখানে উল্লেখ করা সংগত যে ১৯১০ সালের কিছু আগে থেকে, এ-সব বিষয়ে সঠিক দিনকাল নির্ণয় সম্ভব নয়, কবির সুচিরপোষিত অনেক মতে পরিবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যুগধর্মের প্রভাবে বা অন্য কোনো অজ্ঞাত কারণে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল বর্ণাশ্রমধর্ম ও হিন্দু স্বারাজ্যের সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। পরাধীন জাতির মন কখনো সুস্থ হয় না। এই অস্বাস্থ্য জাতির সমস্ত কর্মে প্রকাশ পায়, সাহিত্যেও। সব বিষয়ে ঝোঁক দিয়ে কথা বলবার নেশা তার পক্ষে স্বাভাবিক—ভালোকে অত্যন্ত ভালো, মন্দকে অত্যন্ত মন্দ বলতে পারলে তার জাতিচিত্ত যেন তৃপ্তি পায়। এই মনোভাবের উজ্জ্বলতম প্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রে আর রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের নায়ক গৌরমোহনের চরিত্রে। প্রতিভাবানের হাতে গড়া বলেই কৃষ্ণচরিত্র ও গোরা সত্য হয়ে উঠেছে, প্রতিভাহীনের হাতে পড়লে যা হয় তার দৃষ্টান্ত শশধর তর্ক-চূড়ামণির হিন্দুধর্মের

ব্যাখ্যা আর চন্দ্রনাথ বসুর অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকে সাংখ্যতত্ত্বের আবিষ্কার-প্রচেষ্টা। এই সময়টায় রবীন্দ্রনাথ যুগধর্মে অত্যন্ত বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন, আর সেইজন্যেই তাঁর এই সময়কার রচনায় যেমন সহজে পাঠকের মনোহরণ করতে সমর্থ হয়েছিল এমন আর কোনো সময়ের রচনায় নয়। কথা ও কাহিনী, কাহিনীর কাব্যনাট্য, প্রথম আমলের ছোটো গল্প, চোখের বালি ও নৌকাডুবি এই সময়ের রচনা। গোরায় এসে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে নদী মোড় ঘুরেছে, পাঠকের মনেও খটকা বাধতে শুরু করেছে। কবিচিত্তের এই সামগ্রিক পরিবর্তনের ফলেই রবীন্দ্রনাথ গুরুগোবিন্দ সিংহের রাজনৈতিক কীর্তিকে নূতন দিগন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত করে দেখতে সক্ষম হলেন আর বুঝতে পারলেন—

"শিখদের যিনি শেষ গুরু ছিলেন···সর্বমানবের মধ্যে ধর্মপ্রচার-কার্যকে সংহৃত করিয়া লইয়া শিখদিগকে বলিষ্ঠ করিয়া তোলাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এ কাজ প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্রচারকের নহে; ইহা প্রধানত সেনানায়ক এবং রাজনীতিজ্ঞের কাজ। গুরুগোবিন্দের মধ্যে সেই গুণ ছিল। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ে দল বাঁধিয়া তুলিয়া বৈরনির্যাতনের উপযুক্ত যোদ্ধা ছিলেন। তিনিই ধর্মসম্প্রদায়কে বৃহৎ সৈন্যদলে পরিণত করিলেন এবং ধর্মপ্রচারক গুরুর আসনকে শূন্য করিয়া দিলেন। গুরু নানক যে মুক্তির উপলব্ধিকে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া জানিয়াছিলেন, গুরুগোবিন্দ তাহার প্রতি লক্ষ স্থির রাখিতে পারেন নাই। শত্রুহস্ত হইতে মুক্তিকামনাকেই তিনি তাঁহার শিষ্যদের মনে একান্তভাবে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। ইহাতে ক্ষণকালের জন্য ইতিহাসে শিখদের পরাক্রম উজ্জ্বল হইয়াছিল সন্দেহ নাই, ইহাতে তাহাদিগকে রণনৈপুণ্য দান করিয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু বাবা নানক যে পাথেয় দিয়া তাহাদিগকে একটি উদার পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই পাথেয় তাহারা এইখানেই খরচ করিয়া ফেলিল

এবং তাহাদের যাত্রাও তাহারা এইখানেই অবসান করিয়া দিল।”[৩৪]

গুরুগোবিন্দ সিংহ সম্বন্ধে কবির এই ধারণা সকলে সমর্থন করবেন কি না সন্দেহ তবে অন্ততঃ আচার্য যদুনাথ সরকার এই ধারণার সমর্থক, নতুবা ‘আরংজীবের ইতিহাস’ গ্রন্থে আলোচ্য প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধার করে দিতেন না।[৩৫]

এবারে গোড়ার কথায় ফিরে আসা যাক। বাল্যকাল থেকেই শিখ ও পাঞ্জাবিদের সম্বন্ধে কবির মনে কৌতূহল ছিল আর তার কারণও ছিল।

“একবার লেনু বলিয়া অল্পবয়স্ক একটি পাঞ্জাবি চাকর তাঁহার (মহর্ষির) সঙ্গে আসিয়াছিল। সে আমাদের কাছে যে সমাদরটা পাইয়াছিল তাহা স্বয়ং রণজিতসিংহের পক্ষেও কম হইত না। সে একে বিদেশী তাহাতে পাঞ্জাবি—ইহাতেই আমাদের মন হরণ করিয়া লইয়াছিল। পুরাণে ভীমার্জুনের প্রতি যেরকম শ্রদ্ধা ছিল, এই পাঞ্জাবি জাতের প্রতিও মনে সেই প্রকারের একটা সম্ভ্রম ছিল। ইহারা যোদ্ধা— ইহারা কোনো কোনো লড়াইয়ে হারিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাকেও ইহাদের শত্রুপক্ষেরই অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। সেই জাতের লেনুকে ঘরের মধ্যে পাইয়া মনে খুব একটা স্ফীতি অনুভব করিয়াছিলাম।”[৩৬]

এ গেল একেবারে অল্প বয়সের কথা। তার পরে যখন কবি বছর-বারো বয়সে পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয় যাত্রার পথে অমৃতসরে পৌঁছলেন তখনকার স্মৃতি লেনুর স্মৃতিকে গভীরতর রেখায় অঙ্কিত করল।

৩৪ “শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ”, ইতিহাস।

৩৫ J. N. Sarkar, *The History of Aurangzib*, Vol. III, 3rd Ed., Ch. XXXV.

৩০৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আছে—Rabindranath Tagore, as translated by me in *The Modern Review*, April 1911, pp. 334-38.

৩৬ “পিতৃদেব”, জীবনস্মৃতি।

"অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। অনেকদিন সকালবেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখ-মন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ-উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা এক সময়ে সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন; বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছরির খণ্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।" [৩৭]

বাল্যকালের এই মোহময় 'স্বপ্ন' কিছু পরবর্তীকালে রচনায় রূপ লাভ করল বালক নামে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে।[৩৮] আরও পরবর্তীকালে দুটি শিখ ভজন গানের বাংলা রূপান্তর তিনি করেন।[৩৯] মনের যখন এই চরম অবস্থা তখন গুরুগোবিন্দ সিংহ সম্বন্ধে গুরুগোবিন্দ ও নিষ্ফল উপহার কবিতা-দুটি রচিত। গুরু নানককে বাদ দিলে গুরুগোবিন্দ সিংহ শিখ-গুরুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই শিখ-উপাসক সম্প্রদায়কে যোদ্ধৃ সম্প্রদায়ে পরিণত করেন, পরাধীন দেশের কবির পক্ষে তাঁর প্রতি মোহের আকর্ষণ স্বাভাবিক। মোহগ্রস্ত মন যে চিত্র অঙ্কিত করল বাস্তবের সঙ্গে তার কতখানি মিল তা তখন ধরা পড়ল না। ধরা পড়েছে বাইশ বছর পরে লিখিত শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ প্রবন্ধে।

গুরুগোবিন্দ কবিতার বস্তু বা আখ্যায়িকা কোথায় পেলেন কবি? কবিতাটিতে আখ্যায়িকা বলে কিছু নেই, আছে গুরু-

৩৭ "হিমালয়যাত্রা", জীবনস্মৃতি।

৩ "কাজের লোক কে", বালক, বৈশাখ ১২৯২ : ১৮৮৫।
"বীরগুরু", বালক, শ্রাবণ ১২৯২।
"শিখ স্বাধীনতা", বালক আশ্বিন ও কার্তিক ১২৯২।

৩৯ ক. গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে।
খ. এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর।
—গীতবিতান

গোবিন্দের আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস ও ভবিষ্যতের কল্পনা। আখ্যায়িকা না থাক্, একটা আবহাওয়া আছে। নীচে দুটি অংশ উদ্‌ধৃত হল, একটি কানিংহামের শিখ-ইতিহাস থেকে, অপরটি রবীন্দ্রনাথের বীর গুরু প্রবন্ধ থেকে। বীর গুরু প্রবন্ধের বস্তু খুব সম্ভব তিনি কানিংহামের বই থেকেই পেয়েছেন।

১. যখন তেগ বাহাদুর মারা যান তখন তাঁহার পুত্রের বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর। শহীদ গুরুর জীবনাবসানের শোচনীয় স্মৃতি গোবিন্দের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাঁহার নিজের ক্ষতি এবং দেশের অধঃপতনের কথা চিন্তা করিয়া তিনি মুসলমানদের ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠেন। হিন্দুদের অতীত মহিমা ফিরাইয়া আনিবার জন্য জনসাধারণকে সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন।···

(গোবিন্দ জাতিকে ডাক দিয়া বলেন)— তোমাদের একই আদর্শ এবং লক্ষ্য হইবে; একই নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিবে। নানকের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইবে এবং তাঁহার অনুবর্তী উত্তরাধিকারাদের সম্মান প্রদর্শন করিবে। তোমাদের সম্বোধন হইবে—'জয় গুরুজীর জয়!' [৪০]

২. গুরুগোবিন্দের শিষ্যেরা তাঁহার চারি দিকে জড়ো হইতে লাগিল। সমস্ত শিখজাতিকে একত্রে আহ্বান করিবার জন্য তিনি চারি দিকে তাঁহার শিষ্যদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে সমস্ত পাঞ্জাব হইতে বিস্তর লোক আসিয়া তাঁহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, . দেব-দৈত্য সকলেই নিজের উপাসনা প্রচলিত করিতে চায়; গোরখনাথ রামানন্দ প্রভৃতি ধর্মমতের প্রবর্তকেরা নিজের নিজের এক-একটা পন্থা বাহির করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে মহম্মদ নিজের নাম

৪০ J. P. Cunningham, *The History of the Sikhs*, Ch. III.

উচ্চারণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি, গোবিন্দ, ধর্মপ্রচার, পুণ্যের জয়-বিস্তার ও পাপের বিনাশ-সাধনের জন্য আসিয়াছেন। অন্যান্য মানুষও যেমন, তিনিও তেমনি একজন; তিনি পিতা পরমেশ্বরের দাস; এই পরমাশ্চর্য জগতের একজন দর্শক মাত্র; তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া যে পূজা করিবে নরকে তাহার গতি হইবে। কোরান-পুরাণ পাঠ করিয়া, প্রতিমা বা মৃত ব্যক্তির পূজা করিয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে বা কোনো প্রকার পূজার কৌশলে ঈশ্বর মিলে না। বিনয়ে ও ভক্তিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

তিনি বলিলেন, আজ হইতে সমস্ত লোক এক হইয়া গেল। উচ্চনীচের প্রভেদ রহিল না। জাতিভেদ উঠিয়া গেল। সকলে অত্যাচারী তুর্ক জাতির বিনাশের ব্রত গ্রহণ করিলাম।[৪১]

এই প্রসঙ্গে যতুনাথ সরকার -রচিত আরংজেবের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে কিয়দংশ উদ্ধারের লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

Govind steadily drilled his followers, gave them a distinctive dress and a new oath of baptism, and began a policy of open hostility to Islam. He harangued the Hindus to rise against Muslim persecution, and imposed a fine of Rs. 125 on his followers for saluting any Muhammadan saint's tomb. His aims were frankly martial . . . clearly, Nanak's ideal of the kingdom of heaven to be won by holy living, and holy dying, by humility and prayer, self-restraint and meditation, had been entirely abandoned. . . . In the hills of North Punjab,

৪১ "বীর গুরু", ইতিহাস।

Govind passed most of his life, constantly fighting with the hill Rajahs from Jammu to Srinagar in Garhwal, who were disgusted with his followers' violence and scared by his ambition, or with Mughal officers and independent local Muslim chiefs who raided the hills in quest of tribute and plunder.[৪২]

তিনটি উদ্ধৃত অংশ মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতে মিল আছে, কবি ভিন্ন মত পোষণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে গুরুগোবিন্দ রাজনীতিক, যিনি নানা উপায়ে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে চেষ্টা করছেন, এ বিষয়ে সমকালীন আর দশজন রাজনীতিকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পার্থক্য নেই। কবির মতে গুরুগোবিন্দ কবিতায় অঙ্কিত গুরু—সাধক, যিনি আদর্শ শাসক হয়ে উঠতে চেষ্টা করছেন। বস্তুবিচারে ঐতিহাসিকদের মতকেই মানতে হয়, রবীন্দ্রনাথও মেনেছেন কবিতাটি লিখবার বাইশ বছর পরে লিখিত প্রবন্ধে।

"গুরুগোবিন্দ শিখদের এই ধর্মবোধের ঐক্যানুভূতিকে কর্ম-সাধনার সুযোগে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তিনি একটি বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্মসমাজের ঐক্যকে রাষ্ট্রীয় উন্নতি-লাভের উপায়রূপে খর্ব করিলেন।···কিন্তু গুরুগোবিন্দ কি করিলেন? ঐক্যকেই পাকা করিলেন, অথচ যে মহাভাবের শক্তির সহায়তায় তাহা করা সম্ভব হইল তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, অন্তত তাহার সিংহাসনে আর-একজন প্রবল শরিক বসাইয়া দিলেন।···গুরুগোবিন্দ সাময়িক ক্রোধের উত্তেজনায় ও প্রয়োজন-বোধে বাহনকে প্রবল করিয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু আরোহীকে খর্ব

৪২ 'Guru Govind, His Ideal and Career', *The History of Aurangzib*, Vol. III, 3rd Ed., Ch. XXXV.

করিয়া দিলেন।...এইজন্য বহু শতাব্দী ধরিয়া যে শিখ পরম গৌরবে মানুষ হইবার দিকে চলিয়াছিল তাহারা হঠাৎ এক সময়ে থামিয়া সৈন্য হইয়া উঠিল—এবং ঐখানেই তাহাদের ইতিহাস শেষ হইয়া গেল।"[৪৩]

এ তো বাইশ বছর পরের কথা। বাইশ বছর আগে কি ছবি এঁকেছেন তিনি?

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।'
'নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগুপিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ—
নাই তার কাছে জীবন মরণ
নাই নাই আর কিছু।'

ইতিহাসের সঙ্গে এ চিত্র তো মেলে না। তবে কোথায় পেলেন এ ছবি? এ কি কবির নিজের মনের ধ্যানধারণার প্রক্ষেপ নয়? নিজের স্বপ্নকে ইতিহাসের আধারে আরোপ নয়?

"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবার সময় পাণ্ডবরা এক

৪৩ "শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ", ইতিহাস।

সত্যই কি শিখদের ইতিহাস শেষ হয়ে গেল? রণজিৎ সিংহ ও গুরুগোবিন্দ সিংহের আবির্ভাব না হলেই কি শিখ-ইতিহাস শেষ হয়ে যেত না? এ বিষয়ে যদুনাথ সরকারের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—*The History of Aurangzib*, Vol. III, 3rd Ed., Ch. XXXV.

বৎসর অজ্ঞাতবাস যাপন করেছিলেন— গুরুগোবিন্দ তাঁর গুরুপদ গ্রহণ করবার পূর্বে বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমাদের এখন সেই সময়। এখন যদি গা-ঢাকা দিয়ে নিজের কর্মশালার মধ্যে বসে গভীর গম্ভীর নিবিষ্টভাবে নিজের লোক ও নিজের সমাজের কাজ না করি, যদি একবার আপনার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হতে দিই, সম্পূর্ণতা লাভ করবার পূর্বেই ক্রমাগত নিজের অসমাপ্ত কাজ দেখিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহবা নেবার ইচ্ছে করি, তা হলে কিছুই হবে না।" [৪৪]

এখানে একই সঙ্গে গুরুগোবিন্দর ও নিজের উল্লেখ, দুজনের সাধন-সাম্যের ইঙ্গিত তাৎপর্যপূর্ণ। সে তাৎপর্যটি এই যে, নির্জনে বাস করে প্রস্তুত হয়ে উঠবার যে ইচ্ছা এবং সাধনার দ্বারা পূর্ণতা লাভের যে আকাজ্ক্ষা এই সময় তাঁকে পেয়ে বসেছিল গুরুগোবিন্দ সিংহে তারই আরোপ করেছেন, সে ছবি ইতিহাসের সঙ্গে মিলল কি না ভেবে দেখেন নি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ ঐতিহাসিক ফোটোগ্রাফ নয়। কবির ভাবের রঙে ধ্যানের রেখায় অঙ্কিত ছবি। কবির সত্যের স্থান হয়তো ঐতিহাসিকের সত্যের চেয়ে উঁচুতে, তবু তার ঐতিহাসিকতা স্বীকার করা চলে না। [৪৫]

গুরুগোবিন্দ কবিতাটি রচনার পরদিনে লিখিত হল নিষ্ফল উপহার কবিতাটি। কবিতাটি গুরুগোবিন্দ কবিতার মতো আখ্যায়িকাহীন ভাবোচ্ছ্বাস নয়, একটি স্পষ্ট ভিত্তির উপরে গঠিত। এখানে আখ্যায়িকাটি প্রদত্ত হল।

---

৪৪ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৮৪।

৪৫ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ'—গুরুগোবিন্দের তপস্যাকাল বারো বছর। ইতিহাস বলছে কুড়ি বছর—

"We are told that he remained in obscurity for twenty years"—W. Irvine, *The Later Mughals*, Vol. I, Ch. I.

এখানে কবি স্পষ্টতঃ হিন্দুদের তপস্যাকালের ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

ধনের প্রতি গোবিন্দের বিরাগ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে বলি। গোবিন্দের একজন ধনী শিষ্য তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যের একজোড়া বলয় উপহার দিয়াছিল। গোবিন্দ তাহার মধ্য হইতে একটি বলয় লইয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। দৈবাৎ পড়িয়া গেছে মনে করিয়া একজন শিখ পাঁচ শত টাকা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া একজন ডুবারিকে সেই বলয় খুঁজিয়া আনিতে অনুরোধ করিল। সে বলিল, 'আমি খুঁজিয়া আনিতে পারি, যদি আমাকে ঠিক জায়গাটা দেখাইয়া দেওয়া হয়।' শিখ গোবিন্দকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বালা কোন্‌খানে পড়িয়া গেছে। গোবিন্দ অবশিষ্ট বালাটি লইয়া জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'ওইখানে।' শিখ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আর খুঁজিল না।[৪৬]

কবিতাটিতে গুরুগোবিন্দের ধন সম্বন্ধে উদাসীনতা সুন্দরভাবে চিত্রিত হলেও, মূলের সঙ্গে কিছু প্রভেদ আছে। মূলে আছে গোবিন্দ একখানি বালা ইচ্ছা করে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, কবিতায়

সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

এখানে ঘটনার উপরে কবিকল্পনার জয় হয়েছে মনে হয়। ভক্তের উপহার জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ায় ধন সম্বন্ধে যে উদাসীনতা কিছু উৎকট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা গুরুর মর্যাদার উপযুক্ত নয়। হঠাৎ জলে পড়ে গেল, গুরু ভ্রূক্ষেপ করলেন না, এই কি যথেষ্ট নয়? মূলে আছে শিখ মোটা পারিশ্রমিকের লোভ দেখিয়ে বলয় উদ্ধারের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করল, কবিতায় দাতা নিজেই জলে নামল। দুটিকেই সমর্থন করা চলে। পঞ্চাশ হাজার টাকা

৪৬ "বীর গুরু", ইতিহাস।
মূল আখ্যায়িকা কোথায় আছে অনুসন্ধান করে পাই নি।

মূল্যের বলয় যে ব্যক্তি উপহার দিতে সক্ষম তার প্রাণের মায়া কিছু বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই টাকা দিয়ে বিপজ্জনক কাজে লোক নিয়োগের কথাই সে ভাববে। কবিতায় শিশুটির রঘুনাথ নামকরণ খুব সম্ভব কবিকৃত।

শেষ শিক্ষা কবিতাটি পূর্বোক্ত কবিতা-দুটির কয়েক বছর পরে লিখিত হলেও তখনো তিনি গুরুগোবিন্দ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী ধারণা পোষণ করছেন, পরবর্তীকালে লিখিত শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ প্রবন্ধে মতামত তখনো ভবিতব্যের গর্ভে।

গুরুগোবিন্দর মৃত্যু সম্বন্ধে নানাপ্রকার কাহিনী প্রচলিত আছে। কোনো কোনো বিষয়ে এ-সব কাহিনীর মধ্যে অমিল থাকলেও এক বিষয়ে সব কাহিনী সমান সাক্ষ্য দেয়, গোবিন্দর মৃত্যু আততায়ীর হাতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বীর গুরু প্রবন্ধে গোবিন্দের যে মৃত্যুবর্ণনা দিয়েছেন তা খুব সম্ভব কানিংহামের শিখ-ইতিহাস থেকে গৃহীত। এখানে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করে দেওয়া হল।

> তিনি (গোবিন্দ) একজন আফগানকে কার্যে নিযুক্ত করেন; সে ছিল কিছুটা এডভেঞ্চেরার, কিছুটা বণিক; গোবিন্দ তাহার নিকট হইতে বেশ কিছু অশ্ব ক্রয় করেন। এই বণিক একসময় তাঁহাকে দেয় অর্থ মিটাইয়া দিবার জন্য বলিল। কিন্তু বিলম্ব দেখিয়া সে এমন রুষ্ট ব্যবহার করিল যে গোবিন্দ দারুণ রাগে তাহাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেন। মৃত পাঠানের দেহ সরাইয়া সমাধিস্থ করা হইল। তাহার পরিবার ইহাকে নিয়তির খেলা বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিল। কিন্তু তাহার পুত্রেরা মনের মধ্যে এই প্রতিহিংসা জীয়াইয়া রাখিল এবং উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একদিন নিদ্রিত গোবিন্দকে তাহারা ছুরিকাঘাত করিল; গোবিন্দ জাগিয়া উঠিলেন; আততায়ীরা ধরা পড়িল। তাহাদের ভঙ্গিতে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং বলিল যে তাহারা ঠিকই

করিয়াছে। গুরু (গোবিন্দ) সমস্ত শুনিলেন, তাঁহার মনে পড়িল তাহাদের হতভাগ্য পিতার কথা, হয়তো বা তাঁহার নিজের পিতারও। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে তাহারা উপযুক্ত কাজই করিয়াছে এবং নির্দেশ দিলেন তাহারা যেন অক্ষত অবস্থায় মুক্তি পায়। ১৭০৮ সালে গোবিন্দ গোদাবরী তীরে নুদেরায় নিহত হন।[৪৭]

আহত অবস্থায় ধনুকে ছিলা পরাতে গিয়ে গোবিন্দের মৃত্যু হল এ তথ্যটি কানিংহামে নেই, আরভিনের *The Later Mughals* গ্রন্থে আছে। সেখানে এ বিষয়ে অতিরিক্ত যে তথ্য আছে তা অন্যত্র দেওয়া হল।[৪৮]

রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর সেই ধারাটি অনুসরণ করেছেন যাতে গুরুগোবিন্দর ব্যক্তিগত মহত্ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতে তথ্যগত নিষ্ঠা প্রশংসার যোগ্য।[৪৯]

প্রার্থনাতীত দান কবিতাটির তথ্যাংশ রবীন্দ্রনাথের শিখ-স্বাধীনতা প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে, অবশ্য মূল কাহিনী গৃহীত কানিংহামের শিখ-ইতিহাস গ্রন্থ থেকে। এখানে শিখ-স্বাধীনতা প্রবন্ধে বিবৃত অংশ লিপিবদ্ধ হচ্ছে।

> নাদিরশাহের ভারত-আক্রমণকালে শিখেরা ছোটো ছোটো দল বাঁধিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্তী পারসিক সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিতে লাগিল।…কখনো কখনো

৪৭ গুরুগোবিন্দের মৃত্যু-কাহিনী : দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট।

৪৮ দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট।

৪৯ কিন্তু হলে কি হয়, কবিতাটি শিখসম্প্রদায়ের একাংশের অসন্তোষের কারণ হয়। খুব সম্ভব শিখ-গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীকেই শিখসম্প্রদায় সত্য মনে করেন; রবীন্দ্রনাথ অন্য ধারা অনুসরণ করেছেন, তাতেই অসন্তোষের কারণ। যাই হোক, ব্যাপারটা উভয় পক্ষের মোকাবিলায় সন্তোষজনকভাবে মিটে যায়।—দ্রষ্টব্য : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "উত্তর ভারতে। ১৯৩৫", রবীন্দ্রজীবনী, চতুর্থ খণ্ড।

কেহ বা ধৃতও হইত, কেহ বা হতও হইত, কিন্তু কখনো এমন হয় নাই যে, একজন শিখ ভয়ে তাহার স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছে।··· মুসলমানেরা অধিকসংখ্যক সৈন্য লইয়া দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিল ও শিখদিগকে পরাভূত করিল। লাহোরে এই উপলক্ষে বিস্তর শিখবন্দী নিহত হয়। যেখানে এই বধকার্য সমাধা হয় লাহোরের সেই স্থান সুহিদগঞ্জ[৫০] নামে অভিহিত। এখনো সেখানে ভাই তরুসিংহের কবরস্থান আছে। কথিত আছে, তরুসিংহকে তাঁহার দীর্ঘ কেশ ছেদন করিয়া শিখধর্ম ত্যাগ করিতে বলা হয়। কিন্তু গুরুগোবিন্দের এই বৃদ্ধ অনুচর তাঁহার ধর্ম ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন এবং শিখদের শাস্ত্রানুমোদিত জাতীয় চিহ্নস্বরূপ দীর্ঘ কেশ ছেদন করিতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'চুলের সঙ্গে খুলির সঙ্গে এবং খুলির সঙ্গে মাথার সঙ্গে যোগ আছে। চুলে কাজ কি, আমি মাথাটা দিতেছি।'[৫১]

কবিতাটি তথ্যের সংকীর্ণ পথ দিয়ে চলে প্রশস্ত সার্থকতায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে, কবিকে কল্পনার অপব্যয় করতে হয় নি।

বন্দী বীর জনপ্রিয় কবিতা, এটি ১৩০৬ সালের আশ্বিন মাসে লিখিত হয়। মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে মিলিয়ে কবিতাটি পড়লে দেখা যাবে যে মূল আখ্যায়িকাকে কবি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন, এমন-কি ছোটোখাটো ব্যাপারেও মূলকে লঙ্ঘন করেন নি। সে আলোচনায় প্রবেশের আগে কানিংহামের শিখ-ইতিহাস গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ অনুবাদ করে দিলাম। কবি কানিংহামকেই অনুসরণ করেছেন :

বান্দা ছিলেন গোবিন্দর বাছাই করা শিষ্য। তিনি মূলতঃ দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী এবং বৈরাগী শ্রেণীর সন্ন্যাসী ছিলেন

৫০ সুহিদগঞ্জ না সহিদগঞ্জ ?
৫১ "শিখ-স্বাধীনতা", ইতিহাস।

গুরুগোবিন্দের তিরোধানের পরে তাঁহার শিষ্যদের জীবনেতিহাস হইতেই বুঝা যাইবে গুরু তাঁহাদিগকে কিরূপভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছেন। সাফল্যের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ বান্দা যখন গুরু গোবিন্দের তূণীর সঙ্গে লইয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে পৌঁছিলেন, তখন দলে দলে শিখগণ তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইল। সিরহিন্দের নিকটে মোগল কর্তৃপক্ষকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। বান্দা সেখানকার প্রদেশপালকে পরাজিত করিয়া নিহত করিলেন।...

সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যু সিংহাসন লইয়া আর-একটি দ্বন্দ্বের সূচনা করিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এক বৎসর সিংহাসন দখলে রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফরুখ্‌শিয়রের হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। এই গোলযোগে শিখদের খুব সুবিধা হয়। তাহারা আবার ঐক্যবদ্ধ ও অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিল। বিপাশা ও ইরাবতী নদীর মধ্যভাগে গুরুদাসপুর নামে তাহারা একটি উল্লেখযোগ্য দুর্গ গঠন করিল।...

আব্দুল সামাদ খাঁ তাঁহার সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধপ্রিয় দেশবাসীদের মধ্য হইতে কয়েক সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। লাহোর ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিখ সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বান্দা প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ করিয়াও পরাজিত হইলেন। বিজেতারা পশ্চাদ্ধাবন করিলে বান্দা এক দুর্গ হইতে অন্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নিজের যথেষ্ট ক্ষতি হইলেও তিনি বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শত্রুদেরও যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছিলেন।

অবশেষে তিনি গুরুদাসপুর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং সেখানে শত্রুগণ নীরন্ধ্র অবরোধ রচনা করিল। বাহির হইতে কিছুই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিত

না। সকল রসদ ফুরাইয়া যাইবার পর ঘোড়া, গাধা, এমন-কি নিষিদ্ধ গোমাংস পর্যন্ত বাদ যায় নাই। অবশেষে বান্দা আত্মসমর্পণ করিল। বন্দী বান্দা ও তাঁহার অনুচরদের দিল্লী লইয়া যাইবার কালে কিছু সংখ্যক শিখের ছিন্ন মুণ্ড বর্শাফলকে বিদ্ধ করিয়া পুরোভাগে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। ধর্মান্ধ অর্ধসভ্য বর্বর বিজেতাদের পক্ষে যেরূপ স্বাভাবিক, বান্দা ও বন্দী শিখদের সর্বপ্রকারে অপমানের চরম করা হইয়াছিল। প্রতিদিন একশত শিখকে হত্যা করা হইত। শিখদের মধ্যে আগে শহীদ হইবার জন্য দেখা যাইত প্রতিযোগিতা। অষ্টম দিবসে বান্দা তাঁহার বিচারকদের সম্মুখে আনীত হইলেন। একজন মুসলমান ওমরাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার মতো জ্ঞানবিচারসম্পন্ন লোক কিভাবে এমন পাপ করিতে পারেন যাহার ফলে নরকবাস অনিবার্য। বান্দা উত্তর করিলেন যে, তিনি দুষ্টের দমনের জন্য ভগবানের হাতে যন্ত্রস্বরূপ এবং ভগবানের বিরুদ্ধে অপরাধের শাস্তিই তিনি এখন পাইতেছেন। তাঁহার পুত্রকে তাঁহার জানুর উপর ফেলিয়া তাঁহার হাতে একটি ছুরি ছেওয়া হইল। নিজ পুত্রকে বধ করিবার নির্দেশ তাঁহাকে দেওয়া হইল। নিঃশব্দে এবং অবিচলভাবে তিনি তাহাই করিলেন। তার পর অগ্নিদগ্ধ সাঁড়াশিদ্বারা তাঁহার মাংস ছিঁড়িয়া লওয়া হইল। এই নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যে তাঁহার জীবনের অবসান হইল। মুসলমানেরা বলে যে তাহার কৃষ্ণ-আত্মা পাখায় ভর করিয়া নরকের উদ্দেশে যাত্রা করিল।[৫২]

১৮৮৫ সালে লিখিত শিখ-স্বাধীনতা[৫৩] নামে প্রবন্ধে কবি বান্দার বিবরণ লিখেছেন, কবিতার সঙ্গে তার সামান্যই প্রভেদ।

৫২ J. D. Cunningham, *The History of the Sikhs*, Ch. III.
৫৩ "শিখ-স্বাধীনতা", ইতিহাস।

এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে আরভিন-লিখিত *The Later Mughals* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে।[৫৪]

অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে করে কবিতা ও ইতিহাসের মধ্যে সাম্য প্রদর্শনের আশায় আরভিনের গ্রন্থ থেকে কতক অংশ প্রবন্ধের শেষে[৫৫] তুলে দেওয়া হল। শিখ-স্বাধীনতা প্রবন্ধে সব ঘটনাই সংক্ষেপে আছে, কানিংহামেও আছে। আরভিন-লিখিত বিস্তারিত বিবরণ পড়লে আর কিছু না হোক ঘটনাকালীন শিখদের মনোভাব বেশ বুঝতে পারা যাবে, বন্দী বীরের মতো কবিতাকে আর অবাস্তব মনে হবে না; দেখা যাবে, আখ্যায়িকায় ও কবিতায় তথ্যগত মিল ঘনিষ্ঠ :

সম্মুখে চলে মোগল-সৈন্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া
বর্শাফলকে তুলি।
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে,
বাজে শৃঙ্খলগুলি।
রাজপথ'পরে লোক নাহি ধরে,
বাতায়ন যায় খুলি।

আখ্যায়িকায় আছে সাত শো চল্লিশ, কবিতায় সাত শো।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।

৫৪ Ch. IV.

খুব সম্ভব বইখানি কবির পড়বার সুযোগ হয় নি, কেননা, বন্দীবীর কবিতা লিখিত হওয়ার অনেক পরে বইখানি প্রকাশিত হয়। যদিচ চতুর্থ পরিচ্ছেদের কিয়দংশ ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল (J. A. S. B.) কিন্তু যে অংশে বান্দার কাহিনী আছে তার প্রথম প্রকাশ ঘটে (J. A. S. B.) ১৯০৪ সালে।

৫৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে
বন্দীরা সারি সারি
'জয় গুরুজির' কহি শত বীর
শত শির দেয় ডারি।
সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি
বন্দার এক ছেলে।
কহিল, 'ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।'
দিল তার কোলে ফেলে—
কিশোর কুমার, বাঁধা বাহু তার,
বন্দার এক ছেলে।

এখানে কিছু অমিল আছে। আখ্যায়িকায় বান্দার ছেলে শিশু, "child"—আর মৃত্যুর বিবরণটাও অন্যরকম। "After he [Banda] had been made to dismount and was seated on the ground, his young son was put into his arms and he was told to take the child's life. He refused. Then the executioner killed the child with a long knife, dragged out its liver, and thrust it into the Guru's mouth"। কানিংহামে আছে, বান্দা পুত্রকে হত্যা করলেন; আরভিনের মতে বান্দা পুত্রকে হত্যা করতে অস্বীকার করেছেন। কবি কানিংহামকে অনুসরণ করেছেন, খুব সম্ভব আরভিনের মত তিনি জানতেন না।

মূলে বর্ণিত বীভৎসতা এ যুগের পাঠকের পক্ষে দুঃসহ বিবেচনায় কবি তার কিছু পরিবর্তন করেছেন। পুত্রকে বধ করলে পিতার দুঃখবরণের মহত্ত্ব প্রকাশ পেত, কিন্তু কিশোর কুমারের 'জয় গুরুজি'

বলে মৃত্যুবরণে পুত্র ও পিতা দুজনেরই মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ইতিহাসের তথ্যের উপরে কল্পনার সত্য জয়ী হয়েছে। যে দেশের ইতিহাস নেই সেই দেশই সুখী।

এখানে শেষ সপ্তক গদ্যকাব্যের তেত্রিশ-সংখ্যক রচনাটির আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে— বিষয়সাম্যে প্রাসঙ্গিকতা আছে। কবি-রচিত ইতিহাস গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলিতে রচনাটির বস্তু বা আখ্যায়িকার উল্লেখ নেই। খুব সম্ভব শিখ-ইতিহাস-সম্পর্কিত কবিতাগুলি রচনা-কালেই বস্তুর সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটেছিল, কিম্বা পরবর্তীকালে প্রকাশিত আরভিনের গ্রন্থ থেকে পেয়ে থাকবেন, কিন্তু তখন রচনা করা সম্ভব হয় নি, হয়েছে অনেক পরে।[৫৬] সময়ের ব্যবধানে বক্তব্যে অনেক ব্যবধান ঘটে গিয়েছে। মনের হাওয়ার বদল হয়েছে, দেশের হাওয়ারও; কবির মনে আগের সে উগ্র জাতীয়তাবোধের স্থান দখল করেছে মানবধর্মবোধ। ভিক্ষাদত্ত মুক্তিকে অগ্রাহ্য করে 'নেহাল সিং বালক' বলে উঠল, "চাই নে প্রাণ মিথ্যার কৃপায়, সত্যে আমার শেষ মুক্তি, আমি শিখ।" আগে বর্ণিত শিখবীরগণ প্রাণ দিয়েছে ধর্মের জন্য, গুরুর জন্য, নেহাল সিং প্রাণ দিল সত্যের জন্য। সকলেই বীর, তবে কে কোন্ উদ্দেশ্যে প্রাণ দিল তাতে অনেক প্রভেদ ঘটে, অন্ততঃ কবি তা-ই মনে করেছেন।[৫৭]

৫৬ শেষ সপ্তক (গদ্যকাব্য), প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ (১৯৩৫)

৫৭ Although life was promised to those who became Muhammadans, not one prisoner proved false to his faith. Among them was a youth, whose mother made many supplications to Qutb-ul-mulk, through Ratan Chand, his diwan or principal man of business. She said she was a widow, had but this son, and he had been unjustly seized, being no disciple or follower of the Guru but only a prisoner in his hands. The Wazir interceded and obtained the boy's life. The woman

শেষ সপ্তকের অন্তর্গত রচনাটির একটি স্তবকে আছে মোগল সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ গুরুদাসপুর দুর্গের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা—

ভাণ্ডারে না রইল গম, না রইল যব,
না রইল জোয়ারি ;
জ্বালানি কাঠ গেছে ফুরিয়ে।
কাঁচা মাংস খায় ওরা অসহ্য ক্ষুধায়,
কেউ বা খায় নিজের জঙ্ঘা থেকে মাংস কেটে।
গাছের ছাল, গাছের ডাল গুঁড়ো ক'রে
তাই দিয়ে বানায় রুটি।

আরভিনের গ্রন্থে বর্ণনা পাওয়া যায়—

"... and not having any firewood, ate the flesh raw. ... Many began to pick up and eat whatever they found on the roads. When all the grass was gone, they gathered the leaves from the trees. When these were consumed, they stripped the bark and broke off the small shoots, dried them, ground them down, and used them instead of flour, thus keeping body and soul together. They also collected the bones of animals and used them in the same way. Some assert that they saw a few of the sikhs cut flesh from their thighs, roast it, and eat it."[৫৮]

took the order of release to *Kotwal*, who brought out the prisoner and told him he was free. The youth said 'I know not this woman. What does she want with me? I am a true and loyal follower of the Guru, for whom I give my life. What is his fate shall be mine also.' He then met his fate without flinching.—W. Irvine, *The Later Mughals*, Ch. IV.

৫৮ W. Irvine, *The Later Mughals*, Ch. IV.

এখানে ইতিহাসের তথ্য ও কবির কল্পনা পাশাপাশি হাত ধরে চলেছে, কারো মর্যাদা কেউ ক্ষুণ্ণ করে নি। এরকম রূঢ় বাস্তবকে বোধ করি বাঁধাছন্দে প্রকাশ অসম্ভব, তাই কবিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে গদ্যছন্দ উদ্ভাবন পর্যন্ত। খুব সম্ভব এও একটি কারণ যেজন্য কথাকাব্যের বাঁধাছন্দের যুগে এই ঘটনাটি নিয়ে কবিতা রচনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

বস্তুবিচারের তথ্য সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করে এবারে আমরা এই আলোচনা থেকে লব্ধ কতকগুলি সাধারণ সত্য বা নিয়ম সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

কথাকাব্য সম্বন্ধে তথ্যমূলক আলোচনা শেষ হল। আলোচিত পঁচিশটি কবিতার বস্তু বা মূল আখ্যায়িকা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। কাহিনী নামে পরিচিত নাট্যকাব্যের সংগ্রহ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোনো কাব্য সমগ্রভাবে এমন প্রাচীনবস্তুনির্ভর নয়। নিছক সংখ্যার বিচারে কথাকাব্যের স্থান সকলের আগে। কাহিনী নাট্যকাব্যের বস্তুর অধিকাংশই রামায়ণ ও মহাভারত থেকে গৃহীত বলে পরিচিত; তুলনায় কথাকাব্যের বস্তুর অনেক-গুলিই গৃহীত হয়েছে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে, সে-সব সাধারণ পাঠকের আয়ত্তের বাইরে বলে নীরস মনে হওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও বিস্তারিত ভাবে উদ্ধার করে দিতে হয়েছে। বস্তু সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা না হলে বস্তু কিভাবে শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে বুঝতে পারা যাবে না।

বস্তু বা মূল আখ্যায়িকা অবলম্বন করে কাব্য রচনা করতে গেলে তার পরিবর্তন অপরিহার্য। পরিবর্তন বলতে বোঝায় পরিবর্জন, অর্থাৎ কোনো কোনো তথ্যকে বাদ দেওয়া; বোঝায় পরিবর্ধন, অর্থাৎ কোনো কোনো তথ্য যা বীজাকারে আছে তাদের স্ফুটতর করে তোলা; আর বোঝায় পরিমার্জন, অর্থাৎ যে-সব তথ্য গ্রাম্যতা বা অন্যপ্রকার দোষে অপরিচ্ছন্ন, পরিশীলিত রুচির

প্রলেপ দিয়ে তাদের মালিন্য ঘুচিয়ে উজ্জ্বল করে তোলা। আর-এক প্রকারের স্বাধীনতা কবি গ্রহণ করেন, তাকে বলা যেতে পারে পরিযোজন, অর্থাৎ মূলে যা আদৌ নেই তার আরোপ। চার রকম স্বাধীনতাই কবিদের আছে আর এই স্বাধীনতা গ্রহণের মধ্যেই তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব ধরা পড়ে। কথাকাব্যে বস্তুর পরিবর্জন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের বিস্তারিত বিবরণ আগে দিয়েছি, এবারে দেখতে হবে কবি যে স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের কি পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধপুরাণের আখ্যায়িকাগুলোয়, ভক্তমালের কবিতায়, এমন-কি বন্দী বীরের আখ্যায়িকাটিতেও অতিপ্রাকৃত ঘটনা আছে। রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র অতিপ্রাকৃতকে বর্জন করেছেন। এ যুগ অতি-প্রাকৃতের সাহায্য ছাড়াই মহত্ত্বকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে, বুদ্ধের মহিমা বুঝবার উদ্দেশ্যে জন্মজন্মান্তরের সাক্ষ্য তলব করে না। এ যুগের সুদাস মালী ভগবান তথাগতের "নিরঞ্জন আনন্দমুরতি" দেখে পদ্মফুলের দাম চাইতে, এমন-কি প্রজ্ঞা প্রার্থনা করতেও ভুলে যায়। এ যুগের মানুষ ভিতরের দিকের দরজাটার সন্ধান পেয়েছে, তাই বাইরে আজগুবির অবতারণা করে চোখ ভোলাতে চায় না।

আর-এক প্রকার পরিবর্জনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে অনেকগুলো কবিতায়। বস্তুতে যেখানে স্থূলতা ও বীভৎসতা আছে কবি সেখানে নির্মম ভাবে কলম চালিয়েছেন। অভিসার কবিতাটির বস্তুতে আছে বাসবদত্তা বিকলাঙ্গ হয়েছিল। সে যুগে কোনো কোনো অপরাধের এই ছিল প্রচলিত শাস্তি। এ যুগের কবির চোখে বীভৎস মনে হয়েছে ব্যাপারটাকে, তাই কবি মারীগুটিকায় বাসবদত্তাকে বিকল করেছেন। আবার বন্দী বীর কবিতার বস্তুতে আছে যে, জহ্লাদ বন্দার পুত্রকে হত্যা করে তার যকৃৎ টেনে বের করে এনে ঢুকিয়ে দিল বন্দার মুখে। এ চলতে পারে না এ যুগের কবিতায়—বাদ দিতে হয়েছে। এমন উদাহরণ আরো পাওয়া

যাবে। স্থূলতা ও বীভৎসতা পরিবর্জিত হয়েছে, আবার অতি-প্রাকৃতও একপ্রকার স্থূলতা, তাও পরিবর্জিত হয়েছে।

পরিবর্ধন বলতে বোঝায় বীজাকারে যা আছে তাকে পরিবর্ধিত করে তোলা। প্রভু বুদ্ধের পায়ে দেবার জন্য পদ্মটি নিয়ে এমন দরাদরির কারণ নিশ্চয় এই যে, পদ্ম তখন দুর্লভ হয়েছিল। তা শীতকালেই সম্ভব। এটি বীজ। কবি বীজকে পরিবর্ধিত করে বলছেন—

অঘ্রাণে শীতের রাতে
নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া;
সুদাস মালীর ঘরে
কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কি করিয়া।

শীতের দিনের দুর্লভ পদ্ম—তাও আবার কিনা মালীর সযত্ন রক্ষিত সরোবরের। ঐ পদ্মটি সম্বন্ধে মালীর বিশেষ আগ্রহ স্বাভাবিক, চড়া দাম পাওয়ার ইচ্ছাও স্বাভাবিক। সমস্ত কবিতাটির ভিত্তি পদ্মটি, যা শীতের দিনে "ফুটেছে কি করিয়া"। এই মূল তথ্যটি বাদ দিলে কবিতাটি নিরর্থক হয়ে পড়ে—তাই যা বীজাকারে ছিল তাকে পুষ্ট ও পরিবর্ধিত করে এঁকেছেন কবি। পরিবর্ধনের আর-একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে হোরিখেলা কবিতায়। বস্তুতে আছে, তখন মধুর বসন্তকাল এল, আর রাজপুতানার নরনারী হোরিখেলায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। কবি ঐ ক্ষুদ্র সম্ভাবনাকে অবলম্বন করে তিনটি শ্লোকে চব্বিশটি ছত্রে আকাশে বাতাসে ও মানুষের মনে বসন্তের উন্মাদনার ছবি এঁকেছেন। মূলে যা বাক্য, কবিতায় তা হয়ে উঠেছে রসবাক্য।

পরিযোজনের দৃষ্টান্ত অবিরল। ব্রাহ্মণ, পরিশোধ ও অভিসার কবিতায় মানুষের মনের ভাবনার সঙ্গে মিল রেখে যে নিসর্গের বর্ণনা আছে, যা আর নিছক বর্ণনামাত্র থাকে নি, নরনারীর সুখ-দুঃখ

আশা-নৈরাশ্যের সঙ্গে তরঙ্গিত হয়েছে—এ সমস্তই পরিযোজিত, মূলে এদের উল্লেখমাত্র নেই। বস্তুতঃ এ হচ্ছে এ যুগের চোখে নিসর্গকে দর্শন।

পরিমার্জনের দৃষ্টান্ত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া কঠিন। কিন্তু বস্তুতে আর কবিতায় মিলিয়ে পড়লে অনুভব করতে পারা যায় যে পরিবর্জন, পরিবর্ধন ও পরিযোজন ছাড়াও আর-একটা প্রক্রিয়া চলেছে রচনার সময়ে। একটি সুকুমার, অনুশীলিত, সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন মন কবিতাগুলির উপরে দিব্য প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। এই মনটি অতিপ্রাকৃতে অবিশ্বাসী হয়েও ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, বীভৎসা সম্বন্ধে স্পর্শকাতর হওয়া সত্ত্বেও তথ্যনিষ্ঠ, আর সর্বোপরি পুরাণ ও ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান হওয়া সত্ত্বেও মানবপ্রকৃতির সত্য সম্বন্ধে অধিকতর শ্রদ্ধাবান। এই গেল মনের প্রক্রিয়া। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তার পিছনে আছে অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভা, যা একটিমাত্র দিনে পরিশোধের মতো সুন্দর দীর্ঘ কবিতাটি লিখতে সক্ষম। গাথা কবিতা বাংলা ভাষায় কথাকাব্যের আগে ও পরে অনেক লিখিত হয়েছে, কিন্তু কোথাও যে এমন উৎকর্ষের স্তরে পৌঁছয় নি তার কারণ, তাদের পিছনে এমন বহুগুণান্বিত মন ও প্রতিভার লীলা সক্রিয় ছিল না।

এবারে আমরা উপসংহারের কাছে এসে পৌঁচেছি, কিন্তু তার আগে ছোট একটি প্রসঙ্গ সেরে নিতে চাই। কথাকাব্যের অনেক-গুলো কবিতা সম্বন্ধে নানা জনে নানা উদ্দেশ্যে মত প্রকাশ করেছেন—যদিচ সে-সমস্ত মত সাহিত্যবিচারের এলাকার বাইরে, তাদের প্রত্যক্ষ যোগ হচ্ছে সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে। তাছাড়া অধিকাংশ মন্তব্যই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, যদিচ কোনো কোনো মন্তব্যকে কবি আলোচনাযোগ্য মনে করেছেন। আর কোনো কারণে না হোক, কৌতূহল পরিতৃপ্তি করতে পারে আশায় প্রসঙ্গটির এখানে অবতারণা করা গেল।

যতদূর জানা যায় শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, ব্রাহ্মণ, পূজারিনী, মানী, বন্দী বীর, শেষ শিক্ষা ও বিচারক কবিতাগুলি সম্বন্ধে নানা পক্ষ থেকে নানা রকম আপত্তি উঠেছে। শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা ও পূজারিনী -সংক্রান্ত আপত্তির উত্তরে কবি নিজ মত ব্যক্ত করেছেন। এখানে কবির প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধার করে দেওয়া হল।

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা সম্বন্ধে উত্থাপিত আপত্তির বিরুদ্ধে কবি মন্তব্য করেছেন—

"আমি কবিতায় একটি বৌদ্ধকাহিনী লিখেছিলেম। বিষয়টি হচ্ছে এই :

"একদা প্রভাতে অনাথপিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তী নগরের পথে ভিক্ষা মেগে চলেছেন। ধনীরা এনে দিল ধন, শ্রেষ্ঠীরা এনে দিল রত্ন, রাজঘরের বধূরা এনে দিলে হীরামুক্তার কণ্ঠী। সব পথে পড়ে রইল, ভিক্ষার ঝুলিতে উঠল না। বেলা যায়, নগরের বাহিরে পথের ধারে গাছের তলায় অনাথপিণ্ডদ দেখলেন এক ভিক্ষুক মেয়ে। তার আর কিছুই নেই, গায়ে একখানি জীর্ণ চীর। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে সেই চীরখানি প্রভুর নামে দান করলে। অনাথ-পিণ্ডদ বললেন, অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু সব তো কেউ দেয় নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্যদান মিলল, আমি ধন্য হলুম।

"একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান লোক এই কবিতা পড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন; বলেছিলেন, এ তো ছেলেমেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়। এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি-বা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আব্রু নষ্ট হল। নীতিনিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড়ো হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। হায় রে কবি, একে তো ভিখারিনীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম, তার পরে নিতান্ত নিতেই যদি হয় তাহলে তার পাতার কুঁড়ের ভাঙা ঝাঁপটা কিম্বা একমাত্র মাটির

হাঁড়িটা নিলে তো সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হতে পারত। তথ্যের দিক থেকে এ কথা নতশিরে মানতেই হবে। এমন-কি, আমার মতো কবিও যদি তথ্যের জগতে ভিক্ষা করতে বেরোত তবে কখনোই এমন গর্হিত কাজ করত না, এবং তথ্যের জগতে পাগলাগারদের বাইরে এমন ভিক্ষুক মেয়ে কোথাও মিলত না রাস্তার ধারে নিজের গায়ের একখানি মাত্র কাপড় যে ভিক্ষা দিত; কিন্তু সত্যের জগতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়েছেন এবং ভিখারিনী এমন অদ্ভুত ভিক্ষা দিয়েছে; এবং তার পরে সে মেয়ে যে কেমন করে রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এতবড়ো অপলাপ ঘটে, ও সত্যের কিছুমাত্র খর্বতা হয় না—সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এমনি। রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোকরশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায়, রসজগতে সে-রশ্মি স্থূলকে ভেদ করে অনায়াসে পার হয়ে যায়, তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না। রসজগতে ভিখারির জীর্ণ চীরখানা থেকেও নেই, তার মূল্যও তেমনি লক্ষপতির সমস্ত ঐশ্বর্যের চেয়ে বড়ো।”[৫৯]

এবারে পূজারিনী কবিতা সম্বন্ধে প্রথমে রবীন্দ্রজীবনীকার ও পরে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত হচ্ছে—

“কিছুকাল হইতে মুসলমানদের একদল লোক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু পৌত্তলিকতার ছায়া দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেছেন। মুসলমান ছাত্রদের সেই-সব রচনা স্কুলে কলেজে পড়িতে হয় বলিয়া তাঁহাদের ঘোর আপত্তি। বাংলাভাষা অতি সংস্কৃত-ঘেঁষা, এ লইয়াও আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি ‘মোহম্মদী’ নামে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক মাসিকপত্র রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে নীতি ও

৫৯ গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭।

ধর্ম-বিরোধী কথা আবিষ্কার করিয়াছেন পূজারিনী কবিতায় ও গান্ধারীর আবেদন নাট্যকাব্যে।

"মোহম্মদীর লেখকের মতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩) 'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার' ও 'এক কালে ধর্মাধর্ম দুই তরী 'পরে পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ, তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে'— এই-সকল ইসলাম-নীতি-বিগর্হিত কথা রবীন্দ্রনাথ প্রচার করিতেছেন। এই-সব লেখা মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে পড়া অনুচিত।

"এই মূঢ়তা নীরবে সহ্য করা ধৈর্যশীল কবির পক্ষেও সম্ভব হইল না। তিনি জবাবের একস্থানে লিখিলেন, 'লেখক পাপপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন; আমি সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে তাঁকে এই উপদেশ-টুকু দেব যে, কাব্যে নাটকে পাত্রদের মুখে যে-সব কথা বলানো হয় সে কথাগুলিতে কবির কল্পনা প্রকাশ পায়, অধিকাংশ সময়েই কবির মত প্রকাশ পায় না। প্যারাডাইস লস্টে The Arch fiend বলছেন, To do ought good never will be our task. But ever to do ill our sole delight. সন্দেহ নেই, কথাগুলো উদ্ধতভাবে সুনীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ছাত্র বা অধ্যাপক, কোনো মাসিকপত্রের সম্পাদক বা পাঠক মিলটনকে এ বলে অনুযোগ করে নি যে, পাঠকের মনে দুর্নীতি ও ঈশ্বরবিদ্রোহ বদ্ধমূল করা কবির অভিপ্রেত ছিল। স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা থেকে প্যারাডাইস লস্ট্‌কে উচ্ছেদ করার প্রস্তাব এখনো শোনা যায় নি; কিন্তু বাংলাদেশে কখনোই শোনা সম্ভব হতে পারে না, জোর করে এমন কথা বলার মুখ আজ রইল না।

" 'হোমারের ইলিয়ড বা মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট্‌ মুখ্যতঃ পৌত্তলিকও নয় অপৌত্তলিকও নয়—ওরা সাহিত্য। ওদের গ্রহণ-বর্জন সম্বন্ধে বিচার করবার সময় একমাত্র রসের দিক থেকেই বিচার

কর্তব্য, ধর্মমতের দিক দিয়ে নয়। লজ্জা হয় এই সাদা কথাটারও ব্যাখ্যা করতে।' " ৬০

বিচারক কবিতা সম্বন্ধে (এই সঙ্গে মানী কবিতাটিকে ধরা উচিত) রবীন্দ্রজীবনীকার লিখছেন—"রবীন্দ্রনাথ ইতিপুর্বে বিচারক কবিতাটির জন্য শিক্ষাবিভাগীয় পাঠ্য-নির্বাচন-সমিতির নিকট হইতে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কবি একস্থানে অতি দুঃখে বলিয়াছিলেন, 'সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিয়ে ভাঙা-কপাল আমরা পরস্পরের মাথা ভাঙাভাঙি করছি, অবশেষে কি সাহিত্যের ললাটে বাড়ি পড়তে শুরু হবে?' কিছুকাল পূর্বে শিখদের হস্তেও তাঁহার লাঞ্ছনা হয় গুরুগোবিন্দ সম্বন্ধে শেষ শিক্ষা কবিতার জন্য।"৬০

অন্য একস্থানে রবীন্দ্রজীবনীকার দুঃখ করে বলেছেন—"কথার ন্যায় অপরূপ কাব্যগুচ্ছও সমালোচকদের হাতে বিপর্যস্ত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ ভিক্ষায় অশ্লীলতার ইঙ্গিত আছে, বন্দী বীর মুসলমানদের আত্মসম্মানে আঘাত দিয়াছে, শেষ শিক্ষায় গুরুগোবিন্দ সিংহের নিন্দা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ। শিখদের অভিযোগ গুরুগোবিন্দ সিংহের মৃত্যু-বিষয়ক কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য নহে। দুঃখের বিষয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে রচিত কানিংহাম সাহেবের শিখ-ইতিহাসে ঐ ঘটনাটি লিপিবদ্ধ আছে, এতদিন তাহা কাহারও আত্মসম্মানে লাগে নাই, কবিতা প্রকাশিত হইবার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে এই বিষয় লইয়া সাময়িক পত্রিকায় সমুদ্রমন্থন হয়।"৬১

যাই হোক, কবির সম্বন্ধে শিখ-সমাজের প্রতিকূলতা সহজেই দূর হয়ে গেল। রবীন্দ্রজীবনীকার লিখছেন—"এবার (১৯৩৫ সালে) লাহোরে শিখদের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা হয়। গুরুগোবিন্দ কবিতা লইয়া তাহাদের যে ক্ষোভ ছিল তাহা নিরাকৃত হইল, আকালী

৬০ "উত্তর-ভারতে সফর ও তার পরে", রবীন্দ্রজীবনী, চতুর্থ খণ্ড

৬১ 'কণিকা, কথা, কাহিনী", রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড।

পত্রিকায় কবির বক্তব্য প্রকাশিত হইল। রবীন্দ্রনাথের ঋষিকল্প মূর্তি, তাঁহার শিষ্টাচারে শিখরা মুগ্ধ; একদিন গুরুদ্বারে কবিকে তাহারা বিশেষভাবে সম্মানিত করিল।"[৬২]

ব্রাহ্মণ কবিতা-বিষয়ক বিতর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রবীন্দ্র-জীবনীতে আছে।[৬৩] একদল পণ্ডিত "বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাঽহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি"—এই জবালা-উক্তির রবীন্দ্রনাথ-কৃত মর্মানুবাদ "যৌবনে দারিদ্র্যদুঃখে বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে, জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে, গোত্র তব নাহি জানি, তাত"—স্বীকার করেন না। তাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীনকালে বিধিবহির্ভূত যৌনসম্পর্ক নিয়ে ঢাকাঢাকি করবার প্রথা বা প্রয়োজন ছিল না, সব কথাই খুলে বলা হয়েছে—পুরাণাদিতে এমন অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু ছান্দোগ্যোপনিষদের কোনো টীকাতে রবীন্দ্র-ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় না। কেন? তার কারণ নিশ্চয় তাঁরা কেউ রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত জবালার উক্তিতে দেখতে পান নি। পূর্বতন টীকায় ও রবীন্দ্র-টীকায় কখনো মীমাংসা হবে আশা করা যায় না, কেননা ব্যাকরণ ও ভাষার চেয়ে গভীরতর স্থানে এই প্রভেদের মূল। আর এ সাহিত্যেতর বিষয়ের মীমাংসা করবার দায়িত্ব সাহিত্য-সমালোচকের উপরে অবশ্যই নয়।

সমাজ ও রাজনীতি যখন সাহিত্যের উপরে হস্তক্ষেপ করে তখন কি বিড়ম্বনা ঘটে বর্তমান প্রসঙ্গ তার একটি শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ। সমাজ রাজনীতি ও ধর্ম প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্য ও শিল্পের উপরে মুরুব্বিয়ানা করে আসছে সত্য, কিন্তু যে যুগে আমরা এসে পৌঁচেছি তখন এই-সব মুরুব্বিদের মধ্যে রাজনীতির হাতে একসঙ্গে দণ্ড ও প্রলোভনের ভার ন্যস্ত। বেচারা সাহিত্যের পক্ষে উভয়সংকট কাটিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে পথ চলা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো

৬২ "উত্তর-ভারতে। ১৯৩৫", রবীন্দ্রজীবনী, চতুর্থ খণ্ড।
৬৩ "সাধনার সম্পাদক", রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড।

বহুমানভাজন বিশ্বখ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তির উপরেও মুরুব্বি গদা চালাতে ক্রুটি করে নি। এই ঘটনাটি সামাজিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবার যোগ্য।

এবারে উপসংহার। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নন, আর কথাকাব্যও ইতিহাস নয়—তৎসত্ত্বেও এই কাব্যখানি থেকে বাঙালি সন্তান সুকুমার বয়সে ইতিহাসের প্রথম পাঠ নিয়ে আসছে বললে অন্যায় হবে না। আর তার ফলে বাঙালির ইতিহাসজিজ্ঞাসা বহুল পরিমাণে কথাকাব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও অনুরঞ্জিত হয়েছে। এ দিক দিয়ে বিচার করলে, পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত থেকে অজ্ঞাতসারে বাঙালি-সমাজের দৃষ্টিপরিচালনায় এবং মতামত-গঠনে কাব্যখানির স্থান খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমূহের মধ্যে প্রথম সারিতে। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে, রাজপুত মারাঠা ও শিখ -সম্বন্ধে শিক্ষিত সাধারণ বাঙালি আজ যে মত পোষণ করে তার অনেকটাই কথাকাব্যের প্রভাব-জাত। এ প্রভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতা নিয়ে আলোচনা হলে দেখা যাবে যে, এ ক্ষেত্রে সে প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবের চেয়ে কম নয়, খুব সম্ভব বেশি। এর একটি কারণ, যে সময়ে কথাকাব্যের কবিতাগুলি লিখিত হচ্ছিল তখন কিছুকালের জন্য রবীন্দ্রনাথের মত ও দৃষ্টি দেশের মত ও দৃষ্টির সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। প্রবল জাতীয়তাবোধের সমতরঙ্গে তখন কবি ও পাঠক ভাসমান ছিল। তার পরে, কখনো কখনো ঘটনা-বিশেষকে উপলক্ষ ক'রে কবিতে ও সাধারণে মিল হয়েছে বটে, তবে সামগ্রিক-ভাবে আর স্থায়ী মিল ঘটে নি। কাজেই বলা যেতে পারে কথা-কাব্যের রাজপুত মারাঠা ও শিখ -ইতিহাসের কবিতাগুলো কেবল একক কবির সৃষ্টি নয়, তার পিছনে ছিল সমস্ত সমাজের তাগিদ ও প্রেরণা। এ বিষয়ে আগে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে, কাজেই অতিবিস্তারের মধ্যে না গিয়ে অন্য প্রসঙ্গে প্রবেশ করা যেতে পারে।

কথাকাব্যের কবিতাগুলিকে বিষয়ানুসারে দুই খণ্ডে সাজানো চলে। একটি খণ্ডে বৈদিক ও বৌদ্ধপুরাণের আমলের কবিতাগুলি —আর-এক খণ্ডে রাজপুত মারাঠা ও শিখ -সমাজের কবিতাগুলি; মাঝখানে আছে ভক্তমালের কবিতা-তিনটি, যাদের নায়ক ঐতিহাসিক ব্যক্তি বটে, তবে বিষয়টা ঐতিহাসিক নয়, নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক খণ্ডের মধ্যে ভক্তমালের কবিতা-তিনটি সেতুর মতো, পুরাণ থেকে ইতিহাসে প্রবেশের পথে। এইভাবে দেখলে ও সাজালে কবিতাগুলির মধ্যে বেশ স্পষ্ট একটা pattern দেখতে পাওয়া যায়—পুরাণ, ইতিহাসমুখ এবং ইতিহাস। তবে খুব সম্ভব এ pattern রচনা কবির সচেতন প্রয়াস নয়, অন্তর্নিহিত ভাবের প্রেরণায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিয়মে এই patternটিও গঠিত হয়ে উঠেছে।

আমরা এখানে ঐতিহাসিক খণ্ডের আলোচনা করব, কারণ তার মধ্যে পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা, যা জানবার বিশেষ প্রয়োজন আছে; কেননা, ঐতিহাসিক না হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ধারণাকেই শিক্ষিতসমাজ গ্রহণ করেছে, এমন-কি অনেক ঐতিহাসিকও। কবির সে ধারণার মুখ্য আকর কথাকাব্য, গৌণ আকর প্রবন্ধ। যে বিষয়ে কাব্যে ও প্রবন্ধে অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রেরণায় ও সচেতন চিন্তায় মিল দেখতে পাওয়া যাবে সে বিষয়টিকে কবির সুদৃঢ় ধারণা বলে অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই আলোচনায় আমাদের প্রধান সহায় ইতিহাস নামে প্রকাশিত কবির প্রবন্ধসমষ্টি, যার সাহায্য গোড়া থেকেই অনেকবার গ্রহণ করতে হয়েছে।

ঐতিহাসিক খণ্ডে আছে রাজপুত মারাঠা ও শিখ -সম্প্রদায়ের কাহিনী। রাজস্থানের যে সময়ের কথা কবি লিখেছেন তখন তার গৌরবের যুগ অন্তর্হিত। পদ্মিনী, প্রতাপসিংহ, রাজসিংহ প্রভৃতি ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন, তখন চলছে রাজপুত-

জীবন-সন্ধ্যা। তবু সেই অন্ধকারের মধ্যেও এখানে-ওখানে চোখে পড়ে রতনরাও-এর স্থায়নিষ্ঠা, চোখে পড়ে নকল গড় ধ্বংসের -প্রহসনে বাধা দিতে গিয়ে বীর কুম্ভের প্রাণোৎসর্গ, বীরের ধর্মে প্রভুর ধর্মে বিরোধ মেটাবার উদ্দেশ্যে দুর্গদ্বারে শয়ান দুমরাজের প্রাণহীন দেহ, কানে শুনতে পাওয়া যায় বিবাহ-মণ্ডপ ত্যাগ ক'রে রণক্ষেত্রে ধাবমান সেনাপতির অশ্বক্ষুরধ্বনি। এ-সব হলদিঘাটের যুদ্ধ বা রন্ধ্রমুখ-রোধকারী রাজসিংহের বীর্যকৌশল নয়, কিন্তু বীরত্বের যে বিরাট শিলাখণ্ডে রাজপুত-ইতিহাস গঠিত, এ-সমস্ত তারই ভগ্নাবশেষ নিঃসন্দেহ। এই-সব কাহিনী বর্ণনা উপলক্ষে কবি হয়তো বলতে চেয়েছেন যে, সার্বিক গৌরবযুগ গত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত গৌরবের জের চলতে থাকে। কিন্তু ঠিক কি বলতে চেয়েছেন জোর করে বলবার উপায় নেই, কেননা রাজস্থানের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি ভাষ্য বা মন্তব্য করেন নি, করেছেন শিখ ও মারাঠা ইতিহাস সম্বন্ধে। রূপান্তরে তিনি যদি রাজপুত-জীবন-সন্ধ্যা বিবৃত করে থাকেন তবে আবার রূপান্তরে বিবৃত করেছেন মহারাষ্ট্র-জীবন-প্রভাত, সেই সঙ্গে শিখসম্প্রদায়েরও। নব-অভ্যুদিত মহারাষ্ট্র ও শিখ -সম্প্রদায়কে নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ কবি লিখেছেন, আর তা থেকে কেবল তাদের সম্বন্ধে নয় সাধারণভাবে জাতীয় পতন-অভ্যুদয় সম্বন্ধেও কবির বক্তব্য জানতে পারা যায়—এই জানাটির বিশেষ প্রয়োজন আছে গোড়ায় বলেছি। যথাসাধ্য তাই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব।

কিন্তু তার আগে মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের মন কবির ও তাত্ত্বিকের মন, ঐতিহাসিক বা সংখ্যা-তাত্ত্বিকের মন নয়। এ মনের গতি ভাব থেকে রূপে, রূপ থেকে ভাবে নয়; এ মন দিব্য অন্তর্দৃষ্টির বলে আইডিয়া ও সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, ঐতিহাসিকের পদাতিক মনের মতো ধীর পদক্ষেপে তথ্যের ভূমি সংক্রমণ ক'রে রূপ থেকে ভাবে এবং তথ্য থেকে তত্ত্বে পৌঁছয় না। রবীন্দ্রনাথের

তাত্ত্বিক মন বলে যে, শিখরা "যতোধর্মস্ততো জয়ঃ এ মন্ত্র ভুলিয়া গেল",...এবং তার ফলে "শিখজ্যোতিষ্ক ক্ষণকালের জন্য জ্বলিয়া ক্ষণকালের মধ্যে নিবিয়া গেল।"

এ সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিকগণ যদি-বা স্বীকার করেন, তবু যে প্রক্রিয়ায় কবিমন এ সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে সে প্রক্রিয়া খুব সম্ভব ঐতিহাসিক-রীতি-সম্মত নয়। কেননা, যদিচ ধর্ম শব্দটা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক, ব্যাখ্যা ক'রে তার মধ্যে ঢোকানো যায় না এমন বস্তু অল্পই আছে, তবু নৈসর্গিক কারণকে ধর্মের অন্তর্গত করা যায় কি না সন্দেহ। নদী শুকিয়ে গিয়ে, মরুভূমি এগিয়ে এসে, হিমাঙ্ক দু-চার ডিগ্রি নেমে প'ড়ে কিংবা সমুদ্রের জল ফেঁপে উঠে অনেক সভ্যতার ধ্বংসের কারণ ঘটিয়েছে। এ-সব স্থানেও কি যতোধর্ম-স্ততো জয়ঃ নীতি প্রযোজ্য? ইসলামের প্রতিক্রিয়ায় বাবা নানকের ধর্মপ্রচার আর মোগল বাদশাদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় গুরুগোবিন্দের শিখসম্প্রদায়কে সৈন্যদলে পরিণতকরণ—দুটোই ইতিহাসের প্রতিক্রিয়া। একটির মধ্যে ধর্মের সদ্‌ভাব থাকতে পারে কিন্তু অন্যটির মধ্যে তার অভাব কল্পনা ঐতিহাসিকের কাজ নয়। বাবা নানক ও গুরুগোবিন্দ দুজনকেই ইতিহাস যখন যেমন প্রয়োজন ছিল তেমনি রূপ দিয়েছে, একজনকে করেছে সাধক অন্যজনকে করেছে সৈনিক। দুটোই যুগধর্মের ফল। আর ধর্মের স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে যুগধর্মের স্থান যদি হয় তবে গুরুগোবিন্দের ফৌজ যতোধর্মস্ততো জয়ঃ ভুলে গিয়েছিল এ কথা বলা চলে কি? বস্তুতঃ আত্মরক্ষা যদি ধর্মের অঙ্গ হয় তবে শিখ সৈনিকগণকে ধর্মচ্যুত বলা যায় না, বরঞ্চ বলতে হয় যে মোগল বাদশাদের অত্যাচার ও আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ক'রে তারা আত্মরক্ষারূপ ধর্মকেই রক্ষা করছিল।

"নানক-শিষ্যেরা আজ যুদ্ধ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদল ফৌজে ঢুকিয়া কখনো কাবুলে, কখনো চীনে,

কখনো আফ্রিকায় লড়াই করিয়া বেড়াইবে, নানকের ধর্মতেজে উদ্দীপ্ত উত্তরবংশীয়দের এই পরিণামই যে গৌরবজনক, এমন কথা আমরা মনে করিতে পারি না।"[৬৪]

নানক-শিষ্যেরা যে কাবুলে চীনে আফ্রিকায় যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে তার মূলে নানকের শিক্ষার অভাব নয়। দেশ পরাধীন হয়ে পড়েছিল, তাই অসহায় ভাবে তারা প্রভুর আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য হয়েছে। এখন তারা স্বাধীন দেশের নাগরিকরূপে যুদ্ধ করছে। নিশ্চয় সেটা নিন্দনীয় নয়। পাঞ্জাবে গুরুগোবিন্দ এবং মহারাষ্ট্রে শিবাজী প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি না করলে ঐ-সব অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হত, নানকের এবং মহারাষ্ট্রের ধর্মগুরুদের শিক্ষা তাদের বাধা দিতে পারত না বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। মধ্যযুগে দেশের অন্য অনেক অঞ্চলে অনেক ধর্মগুরু ধর্মপ্রচার করেছেন, তাঁদের শিষ্যসম্প্রদায় তৈরি হয়ে উঠেছে, তারা ফৌজে পরিণত হয়েছে এমন কথা কেউ বলবে না, কিন্তু তার ফলে ঐহিক ও পারত্রিক ক্ষেত্রে সেই-সব শিষ্যসম্প্রদায় অনুসরণযোগ্য মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে এমন মনে করবার কারণ নেই। কোনো কোনো অঞ্চলে ধর্মান্তরিতের সংখ্যা হয়েছে সব চেয়ে বেশি, আবার কোনো কোনো অঞ্চল কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে সর্বপ্রথম তাদের কুক্ষিগত হয়েছে। অপর পক্ষে পাঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্রে ইংরেজকে সব চেয়ে কঠিন যুদ্ধ করতে হয়েছে—আর এই দুই অঞ্চল ইংরেজের পরাধীন হয়েছে সব শেষে। এ-সব সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক তথ্য। কাজেই বলা চলে না যে গুরুগোবিন্দ ও শিবাজীর শিক্ষায় দেশের কেবলই ক্ষতি হয়েছে, বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মগুরুদের শিক্ষায় যাদের বাঁচাতে অক্ষম হয়েছিল এই দুই বীর পুরুষের শিক্ষা তাদের স্বাধীন সামাজিক সত্তাকে অনেক কাল পর্যন্ত রক্ষা করেছিল;

৬৪ "শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ", ইতিহাস।

শেষ পর্যন্ত যে পারে নি তার কারণ ইতিমধ্যে আর-এক বড়ো খেলোয়াড় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির হয়েছিল। ভারতের সেই আঠারো শতকের ভাগাভাগির লাঠালাঠির সামনে সর্বজন-অনুসৃত নীতি ছিল জোর যার মুল্লুক তার, ধর্মের স্থিতিস্থাপকতা যতই বাড়ানো যাক-না কেন ধর্মের কোনো স্থান বা মর্যাদা ছিল, মনে হয় না। যদি স্বীকার করা যায় যে ধর্ম বিস্মৃত হয়েছিল বলেই দেশ পরাধীন হয়েছিল তবে সেই সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে, যারা জয়ী হল সেই ইংরেজ কোন্ ধর্মনীতি অনুসরণ করেছে? রাজনীতির দাবা খেলায় ভারতীয়দের চেয়ে তারা অনেক বড় ওস্তাদ ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তাদের জয়কে যতোধর্মস্ততো জয়ের উদাহরণরূপে নিশ্চয় দেখানো যায় না। অতএব যতোধর্মস্ততো জয়ঃ নীতি যে ইতিহাসের মধ্যে ব্যাপকভাবে সক্রিয় এ কথা বোধ করি স্বীকার করা যায় না।

ইতিহাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি ধারণা এই যে, আদর্শ শাসককে সাধক হতে হবে। রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই —এ তাঁর একটি বহুব্যবহৃত উক্তি। খুব সম্ভব শাসক-সাধক বা রাজসন্ন্যাসীর দৃষ্টান্ত রূপেই তিনি শিবাজী ও গুরুগোবিন্দর চরিত্র বেছে নিয়েছেন আর সেই ভাবেই তাঁদের চিত্রিত করেছেন প্রতিনিধি ও গুরুগোবিন্দ কবিতা-দুটিতে। কবিতা-দুটির বর্ণনার মধ্যেই যদি বীরদ্বয়ের কীর্তি ও কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ হত তবে এ কথা সত্য হত। কিন্তু ইতিহাস যেমন নির্মম তেমনি নিরপেক্ষ। গুরুগোবিন্দ যমুনার তীরে বনে কেবলই সাধনা করেছেন আর ধর্মচর্চা করেছেন ইতিহাস এমন বলে না, তৎকালীন রাজনীতিতে দাবা খেলার সমস্ত চাল দেবার জন্যেই তাঁকে হস্ত প্রসারিত করতে হয়েছে। "In the hills of North Punjab, Govind passed most of his life, constantly fighting with the hill Rajahs from Jammu to Srinagar in Garhwal, who

were disgusted with his followers' violence and scared by his ambition."[৬৫]

গুরুগোবিন্দর আর-এক দিক উপরের বর্ণনা, আর দুয়ের যোগ-দানে ঠিক শাসক-সাধক বা রাজসন্ন্যাসীর মূর্তি অঙ্কিত করে না। আবার শিবাজীর চরিত্রও প্রতিনিধি কবিতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। অনেক কাজ তাঁকে করতে হয়েছে যা শাসক-সাধক বা রাজসন্ন্যাসীর যোগ্য নয়। তৎসত্ত্বেও এ কথা নিঃসন্দেহ যে, তাঁরা দুজনেই ভারতীয় ইতিহাসের দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষ; তৎকালীন ইতিহাসের অভিপ্রায়ের প্রতীক বা বহিঃপ্রকাশ রূপেই তাঁদের দেখতে চেষ্টা করা উচিত, শাসক-সাধক বা রাজসন্ন্যাসী রূপে নয়, কারণ এমন গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো কোনো রাজসিংহাসনে বসেছেন কি না সন্দেহ। তবে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের এ ভাবে চিত্রিত করেছেন তার কারণ, যখন তিনি এ-সব কবিতা লিখছিলেন সেই জাতীয়তাবোধোন্মেষের প্রথম প্রভাতে দেশের চিত্ত ইতিহাসের মধ্যে বের হয়ে পড়েছিল আদর্শ বীরের সন্ধানে, মনের মতো লোক পেতেই তাকে কল্পনার রাজহস্তীর পিঠে চাপিয়ে তূরীভেরীর সমারোহে নিয়ে এসে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে। সমসাময়িক সাহিত্য অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে অনেক অপদার্থ এইভাবে কিছুকাল সিংহাসনের দাবিদার হয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অপদার্থের অভিষেক সম্ভব নয়। তিনি যাঁদের জাতীয় চিত্তের সিংহাসনে বসাতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা যথার্থ বীরপুরুষ এবং জাতীয় প্রতিরোধের প্রতীক।

তাঁরা দুজনেই সপ্তদশ শতকের দোষেগুণে মানুষ, উনবিংশ ও বিংশ শতকের ধারণার সঙ্গে তাঁদের যোগ নেই। তাই

একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।

---

৬৫ *The History of Aurangzib*, Vol. III, 3rd Ed, Ch. XXXV.

কিংবা

তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।

এই-সব ধারণা তৎকালীন নয়, কবির সমকালীন—কবির কাল ও চিত্ত যে স্বপ্ন দেখছিল, কবির কল্পনা ও লেখনী তাকেই জীবন্ত রূপ দান করেছে। দূরকালের উপরে পরবর্তীকালের এই প্রলেপকেই বোধ করি বলে "reading history backward." কবি ও দার্শনিকগণ এইভাবেই ইতিহাস পাঠ করতে অভ্যস্ত।

সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-ধারণা আলোচনার স্থান এখানে নয়, কথার কতকগুলি কবিতাকে অবলম্বন করে তাঁর যে ইতিহাস-ধারণা প্রকাশিত হয়েছে এখানে কেবল তারই আলোচনা চলতে পারে। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে যে স্বভাবতঃ-বিবর্তনশীল কবিমনের সময়-বিশেষের ধারণাকে কবির চূড়ান্ত ধারণা বলে গ্রহণ করা নিতান্ত অনুচিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ইতিহাসের মধ্যে যতোধর্মস্ততো জয়ের লীলা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা হয়তো শেষ জীবনে অপরিবর্তিত ছিল না। সংসারে অধর্মের জয় হয় এ কথা স্বীকার না করলেও ধর্ম যে সব সময়ে জয়ী হয় খুব সম্ভব এ বিষয়ে তাঁর মনে সংশয় জেগেছিল। কাজেই কথাকাব্যে প্রকাশিত কবির ধারণাকে চূড়ান্ত ধারণা মনে না ক'রে উক্ত কাব্য রচনা-কালীন ধারণা বলেই গ্রহণ করতে হবে। যথাসাধ্য তাই দেখাবার চেষ্টা করেছি।

এখানেই আমাদের আলোচনার শেষ। কথার মতো মনোহর কাব্যের আলোচনা মনোহর হল না তার একটি কারণ, আগেই বলেছি, এ আলোচনা রসের আলোচনা নয়, আখ্যায়িকা বা বস্তুর আলোচনা। এ জিনিস স্বভাবতই নীরস, তবু তার প্রয়োজন

আছে। তাজমহলের রসের সাধনাকে ধারণ ক'রে রয়েছে যে-সব পাথর সেগুলো নিশ্চয় এই বস্তুবিচারের মতোই কঠিন ও নীরস। রসের ভিত্তি নীরসতা।

পরিশিষ্ট

কথাকাব্যের চব্বিশটি কবিতার উৎস

উপনিষদ :

১ ব্রাহ্মণ

বৌদ্ধ পুরাণ :

২ শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা
৩ মস্তকবিক্রয়
৪ অভিসার
৫ পরিশোধ
৬ সামান্য ক্ষতি
৭ মূল্যপ্রাপ্তি
৮ নগরলক্ষ্মী
৯ পূজারিনী

ভক্তমাল গ্রন্থ :

১০ অপমানবর
১১ স্বামীলাভ
১২ স্পর্শমণি

রাজপুত-ইতিহাস :

১৩ মানী
১৪ রাজবিচার
১৫ নকল গড়
১৬ হোরি খেলা
১৭ বিবাহ
১৮ পণরক্ষা

মারাঠা-ইতিহাস :

১৯ প্রতিনিধি
২০ বিচারক

শিখ-ইতিহাস :

২১ বন্দী বীর
২২ প্রার্থনাতীত দান
২৩ গুরুগোবিন্দ
২৪ শেষ শিক্ষা

কাহিনী অংশে

২৫ নিষ্ফল উপহার

কবিপ্রতিভার বিদ্যুৎগতির নিদর্শন

১৮৮৮

গুরুগোবিন্দ। ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫
নিষ্ফল উপহার। ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

১৮৯৫

ব্রাহ্মণ। ৭ ফাল্গুন ১৩০১

১৮৯৭

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা। ৫ কার্তিক ১৩০৪

প্রতিনিধি । ৬ কার্তিক ১৩০৪

মস্তকবিক্রয়। ২১ কার্তিক ১৩০৪

১৮৯৯

পূজারিনী। ১৮ আশ্বিন ১৩০৬

অভিসার। ১৯ আশ্বিন ১৩০৬

পরিশোধ। ২৩ আশ্বিন ১৩০৬

সামান্য ক্ষতি। ২৫ আশ্বিন ১৩০৬

মূল্যপ্রাপ্তি। ২৬ আশ্বিন ১৩০৬

নগরলক্ষ্মী। ২৭ আশ্বিন ১৩০৬

অপমানবর। ২৮ আশ্বিন ১৩০৬

স্বামীলাভ। ২৯ আশ্বিন ১৩০৬

স্পর্শমণি। ২৯ আশ্বিন ১৩০৬

বন্দী বীর। ৩০ আশ্বিন ১৩০৬

মানী। ১ কার্তিক ১৩০৬

প্রার্থনাতীত দান। ২ কার্তিক ১৩০৬

রাজবিচার। ৪ কার্তিক ১৩০৬

শেষ শিক্ষা। ৬ কার্তিক ১৩০৬

নকল গড়। ৭ কার্তিক ১৩০৬

হোরি খেলা। ৯ কার্তিক ১৩০৬

বিবাহ। ১১ কার্তিক ১৩০৬

বিচারক। ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬

পণরক্ষা। অগ্রহায়ণ ১৩০৬

দেড় মাসের মধ্যে উনিশটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতা কি এর চেয়ে বেশি!

সত্যকাম-জবালার কবিকৃত গদ্যছন্দে রূপান্তর

সত্যকাম জাবাল মাতা জবালাকে বললে,
"ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করব, কী গোত্র আমার?"
তিনি বললেন, "জানি নে, তাত, কী গোত্র তুমি।
যৌবনে বহুপরিচর্যাকালে তোমাকে পেয়েছি,
তাই জানি নে তোমার গোত্র।
জবালা আমার নাম, তোমার নাম সত্যকাম,
তাই বোলো তুমি সত্যকাম জাবাল।"

সত্যকাম বললে হারিদ্রুমত গৌতমকে,
"ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মচর্যে উপনীত করুন।"
তিনি বললেন, "সৌম্য, কী গোত্র তুমি?"
সে বললে, "আমি তা জানি নে।
মাকে জিজ্ঞাসা করেছি আমার গোত্র কী।
তিনি বলেছেন, 'যৌবনে যখন বহুপরিচারিণী ছিলেম,
তোমাকে পেয়েছি।
আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম,
বোলো আমি সত্যকাম জাবাল'।"
তিনি তখন বললেন, "এমন কথা অব্রাহ্মণ বলতে পারে না।
সত্য থেকে নেমে যাও নি তুমি।
সমিধ্ আহরণ করো সৌম্য, তোমাকে উপনীত করি।"[১]

প্রতিনিধি কবিতার আখ্যায়িকা

কথিত আছে যে (একদা) শিবাজী সিতারা দুর্গ হইতে নীচে দেখিলেন রামদাস নগরে ভিক্ষা করিতেছেন। তিনি তাঁহার মুখ্য করণিক (Chitnis— head writer) বালাজী আবাজীর (Balaji Abaji) নিকট গিয়া একটি আদেশ লিপিবদ্ধ করাইলেন এবং তাহা রাজকীয় শীলমোহর দ্বারা

১ "সম্পূরণ", ছন্দ।

অঙ্কিত করিবার পর, রামদাস যখন প্রাসাদে আসিলেন তখন তাহা তাঁহার ভিক্ষাঝুলিতে অর্পণ করিলেন। রামদাস সেই লিপিটি খুলিয়া পড়িলেন; দেখিলেন শিবাজী তাঁহাকে সমস্ত রাজ্যই দান করিয়াছেন। রামদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার পর রাজা কি করিবেন। এই প্রশ্নের উত্তরে শিবাজী বলিলেন যে, তিনি তাঁহার গুরুর সেবায় বাকি জীবন অতিবাহিত করিতে চান। রামদাস উত্তর দিলেন, "বেশ তাই হোক। এখন আমাকে অনুসরণ করো।" বলিয়া সেই ভিক্ষাঝুলিটি শিবাজীর কাঁধে চড়াইয়া তাঁহাকে ভিক্ষা করিবার আদেশ দিলেন। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রচুর শস্য পাইলেন; (অবশেষে) একটি নদীর তীরে তাঁহারা উভয়েই গেলেন। রামদাস স্বহস্তে দুইটি রুটি প্রস্তুত করিলেন, একটি নিজে খাইলেন, অপরটি খাইলেন শিবাজী। রামদাস তখন জানিতে চাহিলেন যে তাঁহার (শিবাজী) এই নূতন জীবন কেমন লাগিতেছে। শিবাজী জানাইলেন যে তিনি সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত। রামদাস যখন পুনরায় জানিতে চাহিলেন যে শিবাজী তাঁহার আদেশ পালন করিবেন কি না; শিবাজী এবারও সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। তখন রামদাস বলিলেন, "তুমি প্রাসাদে ফিরিয়া যাও এবং আমার প্রতিনিধিরূপে রাজত্ব করো।" শিবাজী সেই আদেশ পালন করিলেন এবং সেইদিন হইতে সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক হিসাবে গৈরিক পতাকা বহন করিতে লাগিলেন।

বিচারক কবিতার আখ্যায়িকা

Rugonath Rao was suspected, but there was no proof of his being the author of the outrage. It was well known that he had an affection for his nephew, and the ministers, considering the extreme jealousy with which many of them viewed each other, are entitled to some praise for having adopted a resolution on the occasion equally sound and politic. They were generally of opinion that, whilst there remained a shadow of doubt, it was on every account advisable to support Rugoba's right to the succession; to this Ram Shastree, who was consulted, made no objections, but dilligently instituted a search

into the whole transactions. About six weeks after the event, having obtained proofs against Rugonath Rao, the Shastree waited upon him and accused him of having given an authority to Somer Sing and Mohummud Yusoof to commit the deed. Rugonath Rao is said to have acknowledged to Ram Shastree that he had written an order to those men, authorizing them to seize Narrain Rao, but that he had never given the order to kill him. This admission is generally supposed to have been literally true; for by the original paper, afterwards recovered by Ram Shastree, it was found that the word *dhurawe*, to seize, was altered to *marawe*, to kill. It is universally believed that the alteration was made by the infamous Anundee Bye; and although Rugonath Rao's own conduct, in subsequently withholding protection even at the hazard of his life, sufficiently justifies the suspicion of his being fully aware of it, the moderate and general opinion in the Mahratta country is that he did not intend to murder his nephew; that he was exasperated by his confinement, and excited by the desperate counsels of his wife, to whom is also attributed the activity of the domestic, Truleea Powar, who was set on by the vindictive malice of that bad woman.

After Rugonath Rao had avowed his having so far participated in the fall of his nephew, he asked Ram Shastree what atonement he could make. 'The sacrifice of your own life', replied the undaunted and virtuous Shastree, 'for your future life cannot be passed in amendment; neither you nor your government can prosper; and for my own part I will neither accept of employment nor enter Poona, whilst you preside in the administration.' He kept his word, and retired to a sequestered village near Waee.[১]

১ Grant Duff, *The History of the Maratha People*, Vol. II.

[পেশোয়া বালাজী বাজীরাও-এর ছিল তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ বিশ্বাস রাও পানিপথে নিহত হইয়াছিলেন। মধ্যম মাধুরাও পিতার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষয়রোগে প্রাণত্যাগ করেন (vide Ballad No. iv on the Suttee of Ramabye)। অতঃপর কনিষ্ঠ নারায়ণ রাও পেশোয়া হন এবং সেই বৎসরই নিহত হন। এরূপ সন্দেহ প্রচলিত আছে যে, নারায়ণ রাও-এর খুল্লতাত রঘুনাথ রাও এই হত্যাপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, যদিও এ সম্পর্কে কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।]

মাধব রাও -এর সিংহাসন-ত্যাগের পূর্বে
তাঁর জীবনসূত্র যখন ছিন্ন হয় নাই,
কী রাজমহিমা ক্ষরিত হ'ত তাঁর দৃষ্টি থেকে !
গগনচুম্বী ছিল তার শক্তি !
কত ভক্তি-উপহার এনেছিল দিল্লীর মর্মর মিনার,
কিন্তু সবই ব্যর্থ হল।
সময় হ'ল এবং তাঁর জীবনসূত্র ছিন্ন হল।
তাঁর সর্ব ক্ষমতা বর্তিল দাদার 'পরে।
মৃত্যুশয্যায় শুয়ে (তিনি বলেছিলেন),
"নারায়ণ রাও, আমার এ আদেশ মেনে চলো,
যাকে আমি দিয়ে যাচ্ছি অভিভাবক রূপে,
রাজকীয় সদয় দৃষ্টিতে সর্বদা দেখবে তাকে,
তার হৃদয় যেন তোমার হয়।
আর দাদা, এখনকার মতো পরেও সর্বদা
অনুগত হস্তে আপনি তাকে রক্ষা করবেন,
স্নেহ-দৃষ্টিতে সর্বদা তাকে দেখবেন।"
এই বলে জীবন-দীপ তাঁর নির্বাপিত হল।
যে আলো দক্ষিণাপথে দেদীপ্যমান ছিল,
রক্তপাতে তা নির্বাপিত হ'ল।

যে উজ্জ্বল রত্ন আমরা নিরীক্ষণ করতাম,
চিরতরে তা হারিয়ে গেল।
হে আমাদের নিহত প্রভু, ছল-হৃদয় সে,
যার বিশ্বাসঘাতক তরবারি তোমাকে আঘাত করেছে।
শেষকৃত্য সব যখন শেষ হল,
যুবরাজ ও অভিভাবক, উভয়েই চাইল
সে সিংহাসন, যে সিংহাসন
এক লুপ্তগৌরব জাতির অধীশ্বর
সাতারার উচ্চ দুর্গে শূন্য আড়ম্বরে
পূর্ণ করেছিল। রাজা নব পেশোয়াকে
শীলমোহর ও পোষাক দান করলেন।
পেশোয়া চললেন বাড়ির পথে। উচ্চস্বরে
জয়ঢাক বাজল। নাসিকের পবিত্র তরঙ্গে
পেশোয়া তাঁর অন্তর ধৌত করতে গেলেন।
সেখান হতে যখন পুণার প্রাসাদে ফিরলেন
তখন তাঁর হৃদয় ঈর্ষান্বিত আশঙ্কায় জর্জরিত।
'দাদা'র উপর তিনি সতর্ক দৃষ্টি
রাখলেন। আর গুপ্তচর দল অনবরত
মিথ্যার জাল বুনে চলল।

যখন রাও পলাইয়া যাইতেছিলেন তখন রক্ষী সমরসিং সৈন্য-সামন্তসহ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। সকল পথচারী জনতা তাহাদের পলায়নপর প্রভু ও পেশোয়ার বিশ্বাসঘাতক পশ্চাদ্ধাবনকারীদের মহানন্দে আলিঙ্গন করিল। রাও যখন কৃতাঞ্জলিপুটে 'দাদা'কে মিনতি করিয়া বলিলেন, "অতীত ভুলে যান, আমাকে রক্ষা করুন, আমার প্রাণ ভিক্ষা দিন," তখন তাঁহার মাথা 'দাদা'র বুকের কাছে অবনত হইয়া আসিয়াছিল। 'দাদা' প্রকৃতির বন্ধনের জোর উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহার অভয় হস্ত প্রসারিত করিলেন। তাঁহার নিষ্ঠুর আদেশ শিথিল করিয়া বলিলেন, "উহাকে প্রাণে মারিয়ো না।" "যে আলো দক্ষিণাপথে দেদীপ্যমান ছিল, রক্তপাতে তা নির্বাপিত হ'ল। যে উজ্জ্বল রত্ন আমরা নিরীক্ষণ করতাম, চিরতরে তা হারিয়ে গেল। হে আমাদের নিহত

প্রভু! ছল-হৃদয় সে, যার বিশ্বাসঘাতক তরবারি তোমাকে আঘাত করেছে।"

পুঞ্জীভূত কাষ্ঠে অগ্নি সংযুক্ত হইল। নারায়ণ রাও-এর জীবনদীপ নির্বাপিত হইল। নারী-মোহান্ধ নির্বোধ 'দাদা' রাজ্যেশ্বর হইল। বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলনা বহুদূর প্রবাহিত হইয়া চলিল। অভিষেকসজ্জা ও অনুমোদন আনিবার জন্য অমৃত দূত হইয়া রাজার নিকট চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে গেলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ঋষি। তাঁহারা 'দাদা'র অধিকারের ন্যায্যতা প্রচার করিলেন এবং সমস্ত বিরুদ্ধ অভিযোগ স্তব্ধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেবাদিদেব 'দাদা'কে আশীর্বাদ করিয়া ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শিবপ্রসাদে ন্যায়ের রাজত্ব শুরু হইয়াছে এবং সকল মানুষ এক পবিত্র বিস্ময়ানুভূতিতে অভিভূত হইয়াছে। তাঁহার ক্ষমতার জয়পতাকা চিরকাল উড্ডীন থাকিবে।" এই পর্যন্ত কবি মুকুন্দ রাজাদের মহিমা ও পাপ কীর্তন প্রার্থনা করিতেছেন যেন প্রলয়কাল পর্যন্ত 'দাদা'র রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। "যে আলো দক্ষিণা পথে দেদীপ্যমান ছিল, রক্তপাতে তা নির্বাপিত হ'ল। যে উজ্জ্বল রত্ন আমরা নিরীক্ষণ করতাম, চিরতরে তা হারিয়ে গেল। হে আমাদের নিহত প্রভু, ছল-হৃদয় সে, যার বিশ্বাসঘাতক তরবারি তোমাকে আঘাত করেছে।"

দাদাসাহেব রঘুনাথ রাও-এর অপর নাম। ইনি রমোবা নামেও পরিচিত। তিনি নিহত পেশোয়া ও তাঁহার উত্তরাধিকারীর খুল্লতাত। মাধব এবং পরে নারায়ণ রাও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি দুর্বল, হীন এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্ত্রী আনন্দীবাঈ-এর প্রভাবাধীন ছিলেন। আনন্দীবাঈ ছিলেন নির্লজ্জ এবং ভীষণ প্রকৃতির। তাঁহার এবং মাধব ও নারায়ণ রাও-এর মাতা গোপিকা বাঈ-এর মধ্যে ছিল প্রচণ্ড শত্রুতা।

গুরুগোবিন্দের মৃত্যু-কাহিনী

গুরুগোবিন্দের মৃত্যু সম্পর্কে সাধারণতঃ একই কাহিনী অল্পবিস্তর পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত। একটু বিস্তৃত আকারে কেহ কেহ বলেন যে, মৃত পাঠানের বিধবা স্ত্রী তাহার পুত্রদের প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্রমাগত উত্তেজিত করিত। অনেকে আবার, বিশেষতঃ মুসলমান লেখকবৃন্দ, বলেন যে, গুরুগোবিন্দ তাঁহার কার্যের জন্য অনুতপ্ত হন। অনেক শিখ লেখকও এই

অভিমত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, মৃত পাঠানের পুত্রদের প্রতি গোবিন্দর চিত্ত এমন স্নেহাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তিনি তাহাদের সহিত (শতরঞ্চ) খেলা করিতেন এবং খেলার ফাঁকে ফাঁকে তাহাদিগকে (তাহার উপর) প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিতেন। কারণ, জীবন তাঁহার কাছে দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের হস্তে মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন। সির উল মুতাখেরিন্ (The Seirool Mutakhereen) বলেন যে, স্বীয় পুত্রদের মৃত্যু-বিয়োগের বেদনায় গুরুগোবিন্দ মারা যান।—J. D. Cunningham, *The History of the Sikhs*, Ch. III.

আরভিনের গ্রন্থে অতিরিক্ত তথ্য

The tradition in the Sikh books (Sakhi Book, 198) is somewhat different. The murderer is stated to be the son of Said Khan, and the grandson of Painda Khan. Possibly the latter was the opponent whom Guru Govind slew, In opposition to his own precept, which prohibited all friendship with Muhammadans, Govinda allowed this boy to come about him. One day, after they had played at Chaupar, a sort of draughts, Guru Govinda lay down to rest, two daggers recently given to him being by his side. The boy took up one of the daggers and inflicted three wounds. Govinda Singh sprang up, crying out, 'The Pathans have attacked me.' One Lakha Singh ran in and cut off the boy's head. The wounds were sewn up, and for fifteen days all went well. Then, on the 2nd of some lunar month, two bows were brought to the Guru. In trying to bend them, the Guru's wouds opened, during the 3rd and 4th he was insensible, and on 5th of that month he expired.

—*The Later Mughals*, Ch. I.

The triumphal entry with the prisoners took place on the 17th Rabi I, 1128 (10th March, 1716). The road from Agharabad to the Lahori Gate of the palace, a distance of several miles, was lined on both sides with troops. Banda sat in an iron cage placed on the back of an elephant. He wore a long heavyskirted Court dress (Jama) of gold brocade, the pattern on it being of pome-granate flowers, and a gold embroidered turban of fine red cotton cloth. Behind him stood, clad in' chain mail, with drawn sword in hand, one of the principal Mughal officers. In front of the elephant were carried, raised on bamboo poles, the heads of Sikh prisoners who had been executed, the long hair streaming over them like a veil. Along with these, the body of a cat was exposed at the end of a pole, meaning that, even down to four-footed animals, everything in Gurdaspur had been destroyed. Behind the Guru's elephant followed the best of the prisoners, seven hundred and forty in number. They were seated, two and two, on camels without saddles. One hand of each man was attached to his neck by two pieces of wood, which were held together by iron pins. On their heads were high caps of a ridiculous shape made of sheep's skin and adorned with glass beads. A few of the principal men, who rode nearest to the elephant, had been clothed in sheep's skin with the woolly side outwards, so that the common people compared them to bears. When the prisoners had passed, they were followed by the Nawab Mhd. Amin Khan Chin, accompanied by his son, Qamr-ud-din Khan and his son-in-law, Zakaria Khan. In this order the procession passed on through the street to the palace.

The streets were so crowded with spectators that to pass was difficult. Such a crowd had been rarely seen

The Muhammadans could hardly contain themselves for joy. But the Sikhs, in spite of the condition to which they had been reduced, maintained their dignity and no sign of dejection or humility could be detected on their countenances. Many of them, as they passed along on their camels, seemed happy and cheerful. If any spectator called out to them that their evil deeds and oppressions had brought them where they then were, they retorted, without a moment's hesitation, in the most reckless manner. They were content, they said, that fate had willed their capture and destruction. If any man threatened that he would kill them then and there, they shouted, "Kill us, kill us, why should we fear death ? It was only through hunger and thirst that we fell into your hands. If that had not been the case, you know already what deeds of bravery we are capable of."

By the Emperor's order the Guru Banda, with Taj Singh and another leader, was made over to Ibrahim-ud-din Khan, Commander of the artillery, and they were placed in prison at the Tirpoliya or Triple Gate. The Guru's wife, his three-year-old infant, and the child's wetnurse, were taken by Darbar Khan, the nazir, and placed in the harem. With the exception of between twenty and thirty of the chief men, who were sent to prison with Guru, the remaining prisoners were made over for execution to Sarbarah Khan, the city "Kotwal" or head of the police. The work began at the "chabutra" or chief police office, on the 22nd Radi I (15th March, 1716), and one hundred men were executed every day for a week. All observers, Indian and European, unite in remarking on the wonderful patience and resolution with which these men underwent their fate. Their attachment and devotion to their leader were wonderful to behold. They had no fear of death, they called the executioner "Mukt", or the Deliverer, they cried out to him joyfully "O Mukt ! kill me first !" Everyday one

hundred victims met their fate and artificers were kept in attendance to sharpen the executioner's swords. After the heads had been severed from the bodies, the bodies were thrown into a heap, and at nightfall they were loaded into carts, taken out of the city, and hung up on the trees.

At length on the 29th Jamadi II, 1128 (19th June, 1716) Banda and his remaining followers were led out to execution. The rich Khatris of the city, who were secretly favourable to his tenets, had offered large sums for his release. But all these offers were rejected. The excution was entrusted to Ibrahin-ud-din Khan, the kotwal. The Guru, dressed as on the day of his entry, was again placed on an elephant and taken through the streets of the old city to the shrine of Khawaja Qutb-ud-din Bakthiyar Kaki, and there paraded round the tomb of the Emperor Shan Alam Bahadur Shah. After he had been made to dismount and was seated on the ground, his young son was put into his arms and he was told to take the child's life. He refused. Then the executioner killed the child with a long knife, dragged out its liver, and thrust it into the Guru's month. His own turn came next. First of all his right eye was removed by the point of a butcher's knife, next his left foot was cut off, then his two hands were severed from his body, and finally he was decapitated. His companions were also executed at the same time. His wife was made a Muhammadan and given to Dakhini Begum, the Emperor's maternal aunt.[১]

১ W. Irvine, *The Later Mughals*, Vol. I, Ch. IV.

রবীন্দ্রনাটকের রূপান্তর ও নামান্তর

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক নাটকের মূল কাহিনী গ্রন্থান্তর হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধজাতক বা ঐ-জাতীয় প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাঁহার মূল গল্প সংগৃহীত। কাব্যনাট্য বলিতে আমরা যে-শ্রেণীর রচনা বুঝি তন্মধ্যে কেবল 'সতী'র গল্পাংশ একটি মারাঠি ব্যালাড হইতে এবং 'মালিনী'র গল্পাংশ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র- সম্পাদিত 'দি স্যানসৃক্রিট বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব্ নেপাল' নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র গল্পাংশ কবির স্বকল্পিত। অবশিষ্ট সমস্তগুলির মূল কাহিনী মহাভারতের অন্তর্গত।

সাহিত্যিকগণ অনেক সময়েই তাঁহাদের রচনার মূল প্রাচীন গ্রন্থ হইতে লইয়া থাকেন এবং নিজের প্রয়োজন ও রুচি -অনুসারে পরিবর্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নূতন অর্থারোপ করিয়া থাকেন। এই-সব প্রক্রিয়ার দ্বারা পুরাতন কাহিনী তাঁহার স্বকীয় হইয়া ওঠে এবং এই স্বকীয়তার মধ্যে কবির বিশেষ পরিচয় থাকিয়া যায়। মূল কাহিনীটা অনেক পরিমাণে বাঁশের কঞ্চিখানার মতো, তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে বল্লরী বিতানিত হয়, সেটাই সমালোচকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মহাভারত হইতে কালিদাস শকুন্তলার কাহিনী লইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার শকুন্তলা ও মহাভারতকারের শকুন্তলা স্বরূপত ভিন্ন। মূল কাহিনীকে পরবর্তী কবি যে কেবল নাট্যরূপ দিয়াছিলেন তাহাই নয়, ওই নাট্যরূপের মধ্যে কবির স্বরূপও রহিয়া গিয়াছে। শকুন্তলা নাটকে প্রেমের যে বিচিত্র পরিণাম গ্রথিত, প্রেমকে যে সন্তানমুখী লক্ষ্যে পরিচালিত করিয়া সার্থকতা দেওয়া হইয়াছে তাহা একান্তভাবে কালিদাসীয়। এখানেই কালিদাসের নিজস্ব পরিচয়।

প্রাচীন কবিগণের সহিত অর্বাচীন কালের কবিগণের প্রধান প্রভেদ এইখানেই। বেদব্যাস বা বাল্মীকির চেয়ে কালিদাস যে

প্রতিভায় উচ্চতর স্তরের ছিলেন এমন নয়। রামায়ণ ও মহাভারতে মহাকবিগণের ব্যক্তিত্বের সন্ধান করিলে হতাশ হইতে হইবে, অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের কালিদাসের কাব্যে কালিদাসের পরিচয় পাওয়া অসম্ভব নয়। আবার আরও অর্বাচীন কালের রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা নাটক কালিদাসের শকুন্তলার চেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরের রচনা এমন দাবি নিশ্চয় কেহ করিবেন না। কিন্তু চিত্রাঙ্গদায় যে রস আছে, শকুন্তলায় তাহার স্ফুরণ হয় নাই, শকুন্তলার মূল কাহিনীতে তাহার একেবারেই অসদ্ভাব। শকুন্তলা ও চিত্রাঙ্গদা ঘটনাবিন্যাসে এক না হইয়াও জীবনতত্ত্ব-বিচারে অভিন্ন নয়। দুই-ই প্রেমের বিকাশের, প্রেমের পরিণামের এবং সন্তানজন্ম দ্বারা প্রেমের সার্থকতার কাব্য। কিন্তু তবু কত প্রভেদ! চিত্রাঙ্গদা মনের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বেদনাকে অনুভব করিয়াছে শকুন্তলায় তাহা অজ্ঞাতপ্রায় ছিল, মূল কাহিনীতে কি শকুন্তলার, কি চিত্রাঙ্গদার কোথাও তাহা নাই।

প্রাচীন ও অর্বাচীন কাব্যে মূল প্রভেদটা এইখানে, একটিতে কবির পরিচয় আছে, অপরটিতে নাই; বা থাকিলেও নিতান্ত প্রচ্ছন্ন। এমন-কি, প্রাচীন ও অর্বাচীন গীতি-কবিতা সম্বন্ধেও ইহা সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য নহে। তবে এখানে আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয় কাব্য ও নাটক। হোমারের কাব্যে আর সকলকেই পাই কেবল হোমারকেই পাই না। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'তে দান্তেকে সর্বাগ্রে পাই—বস্তুত তাঁহার ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই সমগ্রটি দুলিয়া রহিয়াছে। মিল্‌টন যতই নিরপেক্ষতার ভান করুন 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্যে তাঁহার পিউরিটান রুচি ও সৌন্দর্যবিলাসী কবিপ্রকৃতি দুই-ই বিদ্যমান। সত্য কথা এই যে, 'প্যারাডাইস লস্টে'র যে দ্বন্দ্ব তাহা দেবদানবে নয়, মিল্‌টনের দ্বিধাগ্রস্ত প্রকৃতির মধ্যে, তাঁহার পিউরিটান স্বভাব ও কবিপ্রকৃতির মধ্যে। প্রাচীন কাব্য প্রধানত জগন্ময় (Objective), অর্বাচীন কাব্য প্রধানত মন্ময় (Subjec-

tive)—পৃথিবীর কাব্যপ্রবাহ জগন্ময়তা হইতে মন্ময়তার অভিমুখে চলিয়াছে।

এখন এই মন্ময়তার প্রভাবে এবং ফলে অর্বাচীন কাব্যে অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে, প্রাচীন কাব্যে যাহার অস্তিত্ব ছিল না বলিলেও হয়, হয়তো বীজাকারে মাত্র ছিল।

প্রাচীন কবিগণ জগৎ ও জীবনের রাজপথগুলির যাত্রী ছিলেন; গলি, উপগলি ও অন্ধিসন্ধির সন্ধান বড় রাখিতেন না। কাব্যের চরিত্রগুলিকেও তাঁহারা মোটা তুলিতে আঁকিতেন, ছায়াতপের দ্বারা সূক্ষ্ম বর্ণবিলাস ফুটাইবার দিকে তাঁহাদের ঝোঁক ছিল না। অর্বাচীন কালের কবিরা সংসারের রাজপথ ছাড়িয়া গলিঘুঁজি বাহিয়া মানবচিত্তের সূক্ষ্ম রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রাচীনদের এ-সব সূক্ষ্ম কাজের দিকে মন ছিল না। খুব সম্ভব তখনকার সমাজও এজন্য প্রস্তুত ছিল না। নূতন জায়গায় আসিয়া পড়িলে প্রথমে রাজপথ ও প্রকাণ্ড দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিতেই সময় যায়। গলিঘুঁজির জ্ঞান বিশেষ পরিচয়ের পরে আসে। প্রাচীন কবিগণ এ-সংসারে নূতন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হোমার রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিন হাজার বৎসর আগেকার লোক, ব্যাস-বাল্মীকি আরও আগেকার, কত হাজার বৎসর কে জানে। তাঁহারা যে-জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে-জগৎ কবির দৃষ্টিতে নূতন ছিল। জীবনের রাজপথগুলি এখন সুপরিচিত; তাই কবি ও শিল্পীরা ক্রমেই অধিকতর সংকীর্ণ পথে, অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত পথে, অচলিত পথে যাত্রা করিয়াছেন।

রাজপথ সরল ও প্রশস্ত; গলিপথ কেবল সংকীর্ণ নয়, সে পথে গন্তব্য স্থলে পৌঁছিতে হইলে অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে হয়, গলিপথের গতি সূক্ষ্ম ও জটিল। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্— মহাভারতের অন্তর্গত গান্ধারীর আবেদনের মূল কাহিনীতে গান্ধারী দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করিবার জন্য আবেদন করিতেছেন—সে আবেদন কত প্রত্যক্ষ, কত স্পষ্ট, কত সংক্ষিপ্ত ও সরল।

"এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে আপনি ঐ কুলপাংশুল দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করুন। হে নরনাথ! আপনি পুত্রবৎসলতাবশত তৎকালে বিদুরবাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই কুলান্তক ফল উপস্থিত হইয়াছে। শান্তি, ধর্ম ও মন্ত্রিবর্গের পরামর্শানুসারে আপনার যেরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহা যেন অবিকৃত ভাবেই থাকে; অসমীক্ষ্যকারিতা আপনার নিতান্ত দোষাবহ। ক্রূরহস্তে নিপতিতা হইলে রাজলক্ষ্মী ক্ষণধ্বংসিনী হয়; কিন্তু সরলের রাজশ্রী পুরুষপরম্পরাক্রমে পুত্রপৌত্রগামিনী হইয়া থাকে।"

এই সরল ও সংক্ষিপ্ত বাক্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর সুদীর্ঘ সূক্ষ্মবেদনাময় বহু অনুভূতির শাখাপ্রশাখা-জালরচিত উক্তির তুলনা করিলেই প্রভেদটা কোথায় বুঝিতে পারা যাইবে।

মূল কাহিনীর ধৃতরাষ্ট্রের উত্তর অনুরূপ স্থূলার্থবোধক। "প্রিয়ে! যদি বংশনাশ হয়, তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না; কিন্তু পুত্রেরা যে-রূপ ইচ্ছা করিতেছে, তাহার অন্যথা না হউক; পাণ্ডবদিগের সহিত পুনরায় তাহাদিগকে দ্যূতারম্ভ করিতে হইবে।

এ ধৃতরাষ্ট্র পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার ব্যক্তি। প্রাচীন যুগের মানুষেরা পাথর ছুঁড়িয়া মারিত। ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি প্রস্তরযুগের যোদ্ধাদের অস্ত্রের মতোই স্থূল, কারুকার্যহীন, গুরুভার এবং প্রত্যক্ষফলদায়ী। এমন মোটাতুলির ছবি একালের পাঠক সহ্য করিবে না। একালের পাঠক অনেক দেখিয়া, অনেক ঠেকিয়া সহজরসের নাস্তিকে পরিণত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ ঘুচিতেই চায় না, কাজেই অনেক কলাকৌশল, অনেক ছল-ছলনা অবলম্বন করিয়া কবিকে সন্তর্পণে পথ চলিতে হয়। অর্বাচীন কবিদের কাজ বড় কঠিন।

এ তো কালের ধর্ম। অর্বাচীন কালের কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কালের ধর্ম বা বিশেষ স্বভাবের পরিচয় তো থাকিবেই। কিন্তু কেবল ওইটুকু থাকাই যথেষ্ট নয়, কারণ ইহা তো কালের

সামান্য লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিলক্ষণও থাকা আবশ্যক—এবং অবশ্যই আছে।

চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়-অভিশাপ অল্পদিন ব্যবধানে রচিত। এ দুইটি কাব্যনাট্যে কবি নরনারীর প্রেমের বিকাশ, পরিণাম ও সম্ভাবিত দ্বন্দ্বের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই এ-দুটির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও পরিবর্জনাদি ব্যাপারে তাঁহাকে যে পন্থা অনুসরণ করিতে হইয়াছে—পরবর্তী কালের কাব্যনাট্যে তাহা সম্ভব হয় নাই।

পরবর্তী কালের গান্ধারীর আবেদন, নরকবাস, সতী ও কর্ণকুন্তীসংবাদে ধর্মাধর্মের বৈচিত্র্য-পরীক্ষাই কবির লক্ষ্য। ধর্মের স্বরূপকে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই এই-সব কাব্যে মূলের পরিবর্তন, পরিবর্জনাদি করিতে হইয়াছে। মালিনী কাব্যনাট্যে এই দুটি সূত্র, প্রেম ও ধর্ম গ্রন্থিযুক্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই তাহার ব্যবস্থা আবার বিচিত্রতর, পূর্বোক্ত দুটি হইতেই ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ় কল্পনা মানবহৃদয়ের মর্ম-প্রবেশিনী দৃষ্টি, তুরীয় রুচি, সূক্ষ্ম সমবেদনা এবং ঘনাপিনদ্ধ ভাষা—এ সমস্তই তাঁহার একান্ত নিজস্ব, "মহাকবির কল্পনাতে ছিল না তার ছবি।" এখন রবীন্দ্রনাথের কালের ধর্মের সহিত তাঁহার নিজস্ব কবিধর্ম যুক্ত করিলেই তাঁহার কাব্যের, এ ক্ষেত্রে তাঁহার কাব্যনাট্যের স্বরূপ জানিতে পারা যাইবে।

২. বিদায়-অভিশাপ

কচ ও দেবযানীর উপাখ্যানকে রবীন্দ্রনাথ বিদায়-অভিশাপ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মহাভারতীয় মূল কাহিনীকেও কিঞ্চিৎ ভিন্নার্থে বিদায়-অভিশাপ বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কচের প্রণয়লাভে হতাশ দেবযানী বিদায়কালে তাহাকে শাপ দিয়াছে যে,

যে বিদ্যার তরে,
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার

সম্পূর্ণ হবে না বশ, তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

ক্ষুব্ধ নারীচিত্তের আশাভঙ্গকে সম্পূর্ণ মার্জনা করিয়া কচ তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছে যে—

আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে,
ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য সমাপ্ত। এইখানেই দেবযানীর বিদায়-ব্যথার রক্তিম দিগন্তে চিরকালের মতো কচ অস্তমিত হইল। কিন্তু মূল কাহিনীর সমাধান পৃথক্‌রূপ। দেবযানী তাহাকে শাপ দিল যে, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার অপরাধে তাহার সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী হইবে না। এই শাপের প্রতিবাদে কচ দেবযানীকে অভিশাপ দিয়া বলিল যে—"তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা নিষ্ফল হইবে এবং অন্য কোনো ঋষিকুমারও তোমার পাণিগ্রহণ করিবে না।" এইরূপে শাপ-প্রতিশাপে সমাপ্ত মূল কাহিনী দ্বিগুণ অর্থে বিদায়-অভিশাপ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেবযানীর শাপের প্রত্যুত্তরে কচের বরদান।

রবীন্দ্রনাথ কচকে যে মহত্ত্ব দিয়াছেন মূলে তাহা নাই, সেখানে দেবযানী ও কচ দুইজনেই প্রগল্‌ভ। অবস্থা বিচার করিলে দেবযানীকে ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু বিদ্যালাভান্তে স্বদেশে প্রস্থানোন্মুখ কচের কলহপরায়ণতা আদৌ পুরুষোচিত নয়। এই পৌরুষ রবীন্দ্রনাথের দান। বিশেষ, মূল কাহিনীর কচ দেবযানীর অশেষ উপকারের জন্য তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ, তাহার প্রতি প্রেমপরায়ণ নয়, কাজেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করাতে কচের দিক হইতে কোনোরূপ ত্যাগের মহিমা প্রকাশ পায় নাই। রবীন্দ্রকাব্যের কচ গোপনে দেবযানীর প্রতি প্রণয়াসক্ত, কিন্তু কর্তব্যপাশ এমন করিয়াই তাহাকে বাঁধিয়াছে, প্রণয়িনীর আশা পরিত্যাগ করা ছাড়া

তাহার গত্যন্তর নাই। অথচ মূলমূল কাহিনী প্রায় অবান্তর, গুরুপুত্রী ও সহোদরা জ্ঞান করিতো কাহিনীটি মনে পড়িবার সামাজিক, নৈতিক নয়। রবীন্দ্রনাদিত হইয়াছিল। ভাবটিকে প্রধান বাধা নৈতিক, কর্তব্যবুদ্ধি কচবেন একটি অবলম্বন সন্ধান বাহিরের কোনো বাধা তাহার নাই বলিমনে পড়িয়া গেল। কবি প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে পরিত্যাগ কর
প্রকাশিত। এ-সব কথা স্মরণে রাখিলোশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, রবীন্দ্রনাথের কচ মূল কচ হইতে অধিকতরাঙ্গদার কাহিনী। এই

দেবযানীচরিত্র অঙ্কনে খুব বেশি কৃতি মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নাই। মূলের দেবযানী হইতে বিদায়-অ
অধিকতর ছলাকলাময়ী, মনের বেদনাকে স্ব
প্রকাশ করিবার শক্তিও তাহার অধিক, মনোভাবেতী যদি অনুভব তপোবনপ্রকৃতিকে অঙ্কিত করিয়া দেখাইবার ক্ষমতা য় ভুলিয়েছে এ সমস্তই আধুনিক কালোচিত লক্ষণ। কোনো প্রা.অংশে ভাগ পক্ষে ইহা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু এ-সমস্ত দেবযানযে তার অনুষঙ্গ মাত্র, তাহার চরিত্রের ভিত্তি দুর্জয় নারীপ্রকৃতি, া বর, প্রণয়পিপাসা, সে প্রগল্‌ভা এবং আশাভঙ্গহেতু নিষ্ঠুরা। প্রাদি কাব্যে অঙ্কিত সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির দলভুক্তা সে নয়। এই কারণেই সে বিশিষ্ট, নিঃসঙ্গপ্রায় বলিয়াই সে একান্তভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্রৌপদী অবস্থান্তরে পড়িলে এরূপ হইতে পারিত। গ্রীক নাটকের মীডিয়া ও ক্লাইটেমনেস্ট্রা তাহার উপমাস্থল। মূলে বর্ণিত দেবযানীর অভিমান ও দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠাকে দাসীত্বে নিয়োগ, সপত্নীরূপে তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য এবং যযাতিকে নিজের পাণিগ্রহণ করিতে অভিনব যুক্তিপ্রয়োগ, এ-সব গুণ 'আদর্শ' নারী-চরিত্রের যোগ্য নয়, এ সমস্তই অর্বাচীন কালোচিত, দেবযানী প্রাচীনতম 'মডার্ণ উওম্যান'। বেচারা যযাতির অপরাধ কি? কূপমধ্যে নিপতিত দেবযানীর হাত ধরিয়া সে উঠিয়াছিল। অমনি

আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, এখন

প্রাচুর্য মূলেই আছে। রবীন্দ্রনাথ
কেবল কিঞ্চিৎ নরম করিয়াছেন মাত্র।
ঘরে ঢুকিয়া বনের দুরন্ত বিহঙ্গী কিঞ্চিৎ
এত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিদায়কালীন
প্রাণধর্মের প্রবলতা স্পষ্ট বুঝিতে পারা

দিপর্বে 'অর্জুনের চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ' নামে
ইহা হইতে কেবল এইটুকু জানিতে পারা যায়
উপলক্ষ্যে অর্জুন মণিপুরে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারী
বনমধ্যে দেখিতে পাইলেন। পরে তাহার পরিচয়
ণপুররাজের নিকট গিয়া চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিবার
য জানাইলেন। রাজা বলিলেন, তাঁহার পুত্র হইবার কথা
, তৎস্থলে কন্যা জন্মিয়াছে; যদি তাহার গর্ভজাত পুত্র মণিপুর
রাজ্যের বংশধর হইবার প্রতিশ্রুতি লাভ করে, তবে অর্জুন বিবাহের
অনুমতি পাইতে পারে। রাজা এইরূপ জানাইলে, অর্জুন বাঞ্ছিত
অঙ্গীকার করিয়া চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিলেন।

এই সামান্য কাহিনীটুকুর উপরে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কাব্য স্থাপিত। মূলের ঘটনা একটি কাহিনীর কঙ্কাল, রবীন্দ্রনাথ কঙ্কালে প্রাণদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাকে রূপান্তর দিয়াছেন। দেবযানীর মতো চিত্রাঙ্গদাও 'মডার্ণ উওম্যান', তবে প্রভেদ এই যে, মূলের দেবযানী বেগশালী ব্যক্তিত্বময়ী, মূল চিত্রাঙ্গদায় ব্যক্তিত্বের চিহ্নমাত্রও নাই। মূলের নামরূপটিকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি জটিল, বিচিত্রভাববহুল চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

বস্তুত, এই কাব্যখানির পক্ষে মূল কাহিনী প্রায় অবান্তর, কারণ রামজন্মের পূর্বে রামায়ণের মতো কাহিনীটি মনে পড়িবার আগেই কবির মনে কাব্যের ভাবটি উদিত হইয়াছিল। ভাবটিকে ঝুলাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে যখন তিনি একটি অবলম্বন সন্ধান করিতেছিলেন তখন কাহিনীটি তাহার মনে পড়িয়া গেল। কবি বলিতেছেন—

'এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেই সঙ্গে মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনী কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেকদিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল।'[১]

এইবারে ভাবটি সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

'কেন জানি না হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে, সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার স্ব-রূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্‌কার দিতে পারে। এ-যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চরিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।'[১]

এই সূচনা-অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে চিত্রাঙ্গদা কাব্যের প্রকৃত মূল কোথায়। এই কাব্যের মদন ও বসন্ত চরিত্রদ্বয় আসিল

১ সূচনা, চিত্রাঙ্গদা, র-র, তৃতীয় খণ্ড।

কোথা হইতে, চিত্রাঙ্গদার বর্ষকালস্থায়ী রূপলাভের বরপ্রাপ্তি ঘটিল কোন্ প্রয়োজনের সূত্রে, আবার সেই দেবদত্ত সৌন্দর্যের ছদ্মবেশ ছিন্ন করিয়া চিত্রাঙ্গদাই বা কোন্ সাহসে মুক্তিলাভ করিল—সমস্তই সংক্ষেপে এই সূচনাটিতে বিবৃত আছে। বস্তুত চিত্রাঙ্গদা কাব্যের প্রকৃত মূল মহাভারতীয় উপাখ্যানে নয়, কালিদাসের শকুন্তলা কাব্যে—এ কথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই বলিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের কচ ও অর্জুন দুইজনেই কর্তব্যপরায়ণ বীরপুরুষ। অর্জুনের কর্তব্যবুদ্ধি, ক্ষাত্রধর্ম সুখাবেশে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেও মণিপুর-প্রজাগণের প্রয়োজনের মুহূর্তে জাগিয়া উঠিয়াছে।

দেবযানীর মতো রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাও প্রগল্‌ভা ও দুর্দম ইচ্ছাশক্তিশালিনী নারী। কিন্তু অভীষ্টলাভ হওয়াতে দেবযানীর মতো ইচ্ছাশক্তির চরমে যাইবার আবশ্যক তাহার ঘটে নাই, কিন্তু প্রয়োজন হইলে সে যে দেবযানীর সঙ্গে তাল রাখিয়া সঙ্কল্পের শেষসীমা পর্যন্ত যাইতে প্রস্তুত—তাহার প্রমাণ তাহার চরিত্রেই আছে। শকুন্তলা কাব্যে ও চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যে সাদৃশ্য থাকিলেও শকুন্তলা-চরিত্র ও চিত্রাঙ্গদা-চরিত্র ভিন্ন কালধর্মের সৃষ্টি। পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে শকুন্তলা বলিয়াছিল—বৎস, তোমার অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা করো। অনুরূপ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা অনুরূপ উত্তর দিত কি না সন্দেহ। দেবযানী তো নিশ্চয়ই দিত না। তাহারা অর্বাচীন, তাহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগের মানুষ, আর শকুন্তলা সেই প্রাচীন কালের মানুষ, যখন সপত্নীজনের সেবা করিয়া নারীকে পতিগৃহের আদর্শ হইয়া উঠিতে হইত।

৪. গান্ধারীর আবেদন

গান্ধারীর আবেদন সম্বন্ধে বক্তব্য আগেই প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, মূলে ও রবীন্দ্রনাথের রচনায় আসল প্রভেদটা কোথায়। মূলে যাহা স্থূল, সংক্ষিপ্ত এবং

প্রাচীনকাব্যধর্মী—রবীন্দ্রনাথ তাহাতে সূক্ষ্মতা, জটিলতা ও অর্বাচীন কাব্যধর্ম আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি মূলের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। গান্ধারীর চরিত্র উভয়ত্রই সমরূপ। ধর্মভীরুতা গান্ধারী-চরিত্রের স্বরূপ। পুত্রেরা যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে জননীকে প্রণাম করিলে তিনি কখনো বলেন নাই যে তোমার জয় হোক, সর্বদাই বলিতেন ধর্মের জয় হোক। এইরূপ ধর্মনিষ্ঠা জননীর পক্ষেই অধর্মাচারী পুত্রের নির্বাসনপ্রার্থনা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের রচনাতে মূলের এই স্বরূপটি সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।

৫. কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

মহাভারত মহাকাব্যে কর্ণের ন্যায় ট্র্যাজিক-চরিত্র আর আছে কি না সন্দেহ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও সে অধিরথসূতপুত্র নামে খ্যাত। অর্জুনের যশে সে ঈর্ষিত, অথচ রাজকুলে জন্ম নহে বলিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত। দুর্যোধনের অনুগ্রহে সে রাজপদ পাইয়াছে, অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার বহুপ্রতীক্ষিত সময় আসন্ন। কিন্তু যে দৈব জন্মমুহূর্তে তাহার অদৃষ্টে ট্র্যাজেডির বীজ বপন করিয়া দিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে নূতন সুযোগ পাইয়া কুন্তীর মুখে তাহাকে জানাইয়া দিল যে, অর্জুন তাহার ভ্রাতা। নিষ্ঠুর নিয়তি তাহাকে ও অর্জুনকে মুখোমুখি করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইল না—উভয়ের ভ্রাতৃসম্পর্ক জ্ঞাপন করিয়া দিল—এমন না হইলে যে ট্র্যাজেডির চরম হয় না।

মহাভারতকার কর্ণ-চরিত্রের ট্র্যাজেডিকে স্থূল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—ঘটনাবিন্যাসের অপেক্ষা সূক্ষ্মতর উপায় অবলম্বন করেন নাই। প্রাচীন কবিদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক শিল্পরীতি। রবীন্দ্রনাথ কেবল ঘটনাবিন্যাসই করেন নাই, তাহার চিত্তের ভাবনাবিন্যাসকেও দেখাইয়া দিয়াছেন। এইরূপে ঘটনা ও ভাবনার

টানাপোড়েনে রবীন্দ্রনাথের কর্ণ মূলের চেয়ে জটিল, অধিকতর ভাবগ্রাহী—অর্থাৎ আধুনিক হইয়া উঠিয়াছে।

মূলে দেখিতেছি যে, কর্ণ কৃতঘ্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে ভাবিয়াই কুন্তীর অনুরোধে কৌরবপক্ষ ত্যাগ করিতে সম্মত হয় নাই। কর্ণ বলিতেছে—

'যাহারা স্বামীর নিকট কৃতকার্য হইয়া তাঁহার কার্যকাল উপস্থিত হইলে উপেক্ষা করে, সেই-সকল ভর্তৃপিণ্ডাপহারী পাতকিগণের ইহলোক বা পরলোকে সম্পত্তিলাভ হয় না। অতএব হে আর্যে! আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের হিতার্থ স্বীয় সাধ্যানুসারে তোমার পুত্রগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া সৎপুরুষোচিত অনৃশংস কার্যানুষ্ঠান করিব, আপনার বচনানুরূপ কার্য অর্থকর হইলেও তদনুষ্ঠানে কদাপি সম্মত হইব না।'

পরিষ্কার উত্তর, কিন্তু এরকম উত্তর কেবল প্রাচীন কাব্যেই সম্ভবপর ছিল। রবীন্দ্রনাথ অন্নঋণ, প্রভুর প্রতি কর্তব্যের বন্ধন, ক্ষাত্রধর্ম প্রভৃতির উপরেই কর্ণ-চরিত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু তদতিরিক্ত যে ট্র্যাজিক ব্যঞ্জনার আরোপ করিয়াছেন, তাহা একান্তই আধুনিক। আর, ওইটুকু আছে বলিয়াই কর্ণকে কেবল বীর বলিয়া সম্ভ্রম করি না, দুরদৃষ্ট বলিয়াই আপন মনে করি। জন্মমুহূর্ত হইতেই সে দুরদৃষ্টের স্রোতে ভাসমান।

রবীন্দ্রনাথের কর্ণ বলিতেছে—

> আজি এই রজনীর তিমির-ফলকে
> প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
> ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
> অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
> চরম বিশ্বাস-ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন
> জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত, আশাহীন
> কর্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময়

শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে-পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।

এ উক্তি নিতান্তই আধুনিক কালোচিত, ইহা একপ্রকার 'অহৈতুক বিষাদ', ইহা হ্যামলেটের বিষাদ বা হ্যামলেটিয়ানা।

মহাভারতের কুন্তী কর্ণকে পরিচয় দিতে আসিয়াছেন কি উদ্দেশ্যে? যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্র-নাশের আশঙ্কাতেই তিনি কর্ণকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিতে আসিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অর্জুনের হাতে কর্ণেরও যে জীবননাশের আশঙ্কা আছে তাহাতে তিনি বড় উদ্বেলিত নহেন। কর্ণ যেমন অভয় প্রদান করিলেন যে, অর্জুন ভিন্ন কুন্তীর অপর চার পুত্রের প্রাণনাশ করিবেন না—অমনি কুন্তী আশ্বস্ত চিত্তে ফিরিয়া চলিলেন। বোধ করি, অর্জুন সম্বন্ধে তাঁহার মনে তেমন উদ্বেগ ছিল না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কুন্তী কেবল স্বার্থবোধেই কর্ণকে ফিরাইয়া লইতে আসেন নাই। তাহার প্রতি যে অন্যায় হইয়া গিয়াছে, সেই অন্যায়ের প্রতিকার করাও তাঁহার একটি উদ্দেশ্য ছিল। এই কানীন পুত্রটির বিচ্ছেদে তাঁহার মাতৃহৃদয়ে দুঃখের অন্ত ছিল না। মূল কুন্তীচরিত্রে সে-ভাব আছে মনে হয় না।

তার পরে মূলের কুন্তী যেমন অবাধে আত্মপরিচয় এবং কর্ণের জন্মরহস্য বলিতে পারিয়াছে তাহা এ যুগে আর সম্ভবপর নয়। কুন্তী বলিয়াছে—তুমি আমার কানীন পুত্র, আমি কন্যাবস্থায় সর্বাগ্রে কুন্তীরাজভবনে তোমাকে প্রসব করিয়াছি। ভুবনপ্রকাশক ভগবান্ দিনকর আমার গর্ভে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন।

অত্যন্ত প্রাঞ্জল, এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্ব্যর্থ নাই। এ-সব বিষয় এমন করিয়া প্রকাশ কোনো আধুনিকের পক্ষে সম্ভব নয়—প্রাচীনেরা পারিতেন, তখনকার সমাজকে এতপ্রকার সুকুমার সংস্কারে আচ্ছন্ন করে নাই, সবই খোলাখুলি ছিল। এখনকার সমাজে গাত্রাবরণ, বাক্যাবরণ ও মনের আবরণ সবই তখনকার চেয়ে অনেক অধিক।

মহাভারতকার যে-কথাটা এত সহজে এবং এত সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিতে রবীন্দ্রনাথকে অনেক সংযম করিতে, আভাস-ইঙ্গিত প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, তৎসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিষয়টাকে অকথিত রাখিয়া পাঠকের অনুমানের উপরে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। এই রুচিবোধের সৌকুমার্যের কতক আধুনিকযুগীয়, কতক রবীন্দ্রনাথীয়। এ বিষয়ে তিনি কেবল আধুনিক নন, আধুনিক যুগের চরম দৃষ্টান্তস্থল। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ ও কুন্তী দুই জনেই মূলানুগ থাকিয়াও অর্বাচীন কালের মহাকবির স্পর্শে আধুনিক যুগোচিত সৌকুমার্য, সূক্ষ্মতা ও ভাববিন্যাসের জটিলতা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কর্ণের হ্যামলেটী মনোবৃত্তি-সুলভ 'অহৈতুক বিষাদ' বিশেষ ভাবে আধুনিক যুগের ধর্ম।

৬. নরকবাস

মহাভারতের বনপর্বে সোমক নৃপতির বৃত্তান্ত আছে। এই বৃত্তান্তে আছে যে, সোমক রাজার জন্তু নামে একমাত্র পুত্র ছিল। একদিন সোমক পুত্রের ক্রন্দন শুনিয়া ঋত্বিকসহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, একটি পিঁপড়া তাহাকে কামড়াইয়াছে। তখন সোমক ঋত্বিককে বলিলেন—একমাত্র পুত্র হইবার কি জ্বালা! কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না। ঋত্বিক বলিলেন যে, যজ্ঞাগ্নিতে জন্তুর বসার দ্বারা আহুতি প্রদান করিলে শতপুত্রলাভ হইবে। রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন। যথাশাস্ত্র যজ্ঞাগ্নিতে জন্তুর মেদের আহুতি প্রদত্ত হইলে সোমকের শতপত্নী শতপুত্র লাভ করিলেন। জন্তুও প্রধান মহিষীর গর্ভে পুনরায় জন্মিল।

তার পর যথাকালে প্রথমে ঋত্বিকের ও পরে সোমকের মৃত্যু হইল। সোমক স্বর্গে গমন করিবার সময়ে নরকে ঋত্বিককে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নরকবাসের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া অবগত হইলেন যে, সেই যজ্ঞ করাইবার পাপে তাহার এই দশা ঘটিয়াছে।

তখন সোমক ধর্মরাজকে বলিলেন—হে ধর্মরাজ! আমার যাজককে এই নরক হইতে বিমুক্ত করুন, আমি স্বয়ং এই নরকাগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিব; ইনি আমার গুরু, আমারই নিমিত্ত এই নরকানলে দগ্ধ হইতেছেন। যম কহিলেন—হে রাজন! একজনের কর্মফল অন্যে ভোগ করিতে পারে না। ঐ দেখো, তোমার সমুদয় সৎকর্মের ফল বিদ্যমান রহিয়াছে। সোমক কহিলেন—এ-ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি-ব্যতিরেকে আমি পবিত্রলোক ভোগ করিতে বাসনা করি না; স্বর্গেই হউক আর নরকেই হউক, আমি ইঁহার সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি। ইঁহার ও আমার কর্মসকল সমান, অতএব আমাদের দুইজনের পুণ্যাপুণ্যফল সমান হউক। যম কহিলেন—যদি তোমার এইরূপ অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে উহার সহিত সমকাল নরক ভোগ কর, পরিশেষে তোমরা উভয়েই সদ্গতি লাভ করিবে।

ইহাই মূল কাহিনী। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বস্তভাবে মূলকে অনুসরণ করিয়াছেন। সোমকের স্বর্গবাস-ইচ্ছা পরিত্যাগ ও স্বেচ্ছায় নরকবাস-ব্রত গ্রহণ মূলানুগ। নূতনের মধ্যে নরকচারী প্রেতগণের সৃষ্টি।

মূলগল্প কাহিনী আকারে কথিত। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে নাট্যরূপ ও নাটকীয়তা দান করিয়াছেন। সোমকের মৃত্যুর পরে স্বর্গগমন-কালে নরকের প্রেতগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে—এখানেই নাটকের ঘটনার স্থান। রবীন্দ্রনাথের নরকের বর্ণনাটি নূতন এবং মনস্তত্ত্বসঙ্গত, প্রেতগণ বলিতেছে,

স্বর্গের পথের পার্শ্বে এ বিষাদলোক,
এ নরকপুরী। নিত্য নন্দন-আলোক
দূর হ'তে দেখা যায়, স্বর্গযাত্রীগণে
অহোরাত্রি চলিয়াছে, রথচক্রস্বনে
নিদ্রা তন্দ্রা দূর করি ঈর্ষাজর্জরিত

আমাদের নেত্র হতে। নিম্নে মর্মরিত
ধরণীর বনভূমি, সপ্ত পারাবার
চিরদিন করে গান, কলধ্বনি তার
হেথা হতে শুনা যায়।

একদিকে স্বর্গ, আর একদিকে মর্ত, মাঝখানে স্বর্গ হইতে মর্তে যাতায়াতের পথের পার্শ্বে বিষাদলোক নরকপুরী, ঈর্ষাই এখানকার ধর্ম।

এই নরকলোকে সোমক ও ঋত্বিক প্রেতগণের কৌতূহল মিটাইবার আশায় তাহাদের মর্তলীলা এবং ঋত্বিকের নরকে আসিবার কারণ বিবৃত করিয়াছে। তাহাদের প্রদত্ত বিবরণে নাটকীয় লক্ষণ অবিরল। মূল কাহিনীর কাঠামো রবীন্দ্রনাথের রচনায় অবিকৃত আছে সত্য, সোমকের স্বেচ্ছায় স্বর্গলাভ-ত্যাগের সঙ্কল্পও মৌলিক—তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বও অল্প নহে। সে কৃতিত্ব কল্পনার ঐশ্বর্যে ও ভাষার গাঢ়বন্ধ সংহতিতে।

৭. বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া

কালমৃগয়া ও বাল্মীকি-প্রতিভার মূল কাহিনী রামায়ণের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথ মূল হইতেই তাঁহার নাটক ছু'খানির বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মূলের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ এতই শিথিলভাবে যুক্ত, অবান্তর বিষয় এত প্রবেশলাভ করিয়াছে যে, এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক, নাটক ছুটি কিংবদন্তীর উপরে নির্ভর করিয়া লিখিত বলিলেও চলে।

৮. মালিনী

রবীন্দ্রনাথের মালিনী নাটকের মূল কাহিনী রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'দি স্যানস্‌ক্রিট বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব্ নেপাল' গ্রন্থের 'মহাবস্তুবদান' অধ্যায়ের অন্তর্গত। এই কাহিনীর পূর্বোল্লিখিত

কাহিনীগুলির মতো সুপরিজ্ঞাত নহে বলিয়া সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

এক প্রত্যেক-বুদ্ধ বারাণসীতে ভিক্ষার্থ গিয়াছিল। কিন্তু ভিক্ষা না পাইয়া যখন সে ফিরিয়া আসিতেছে তখন একটি বালিকা তাহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া আসিয়া সেবার দ্বারা খুশী করিল। প্রত্যেক-বুদ্ধের মৃত্যুর পরে তাহার সমাধির উপর একটি স্তূপ রচনা করিয়া দিয়া বালিকাটি মাল্য ও সুগন্ধের দ্বারা তাহাকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিত। বালিকাটি প্রার্থনা করিত, প্রত্যেক পরবর্তী জন্মে সে যেন পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার প্রার্থনা সফল হইল। পরবর্তী জন্মে সে বারাণসীর রাজা কৃকির কন্যারূপে মাল্যচিহ্ন ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম হইল মালিনী। মালিনী কাশ্যপ ও তাহার শিষ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ্য দ্বারা তাহাদের তৃপ্তিসাধন করিল। রাজসভাতে ব্রাহ্মণগণের অসীম ক্ষমতা। তাহারা মালিনীর আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে তাহার প্রতি নির্বাসনদণ্ড-দানের আদেশ দিতে বাধ্য করিল। মালিনী এক সপ্তাহের অবকাশ চাহিয়া লইল। এই সময়ের মধ্যে তাহার পাঁচশত ভ্রাতা, রাজ-অমাত্যগণ, সেনাপতিগণ ও নাগরিকগণ সকলেই আর্যধর্মে দীক্ষা লইল। তাহারা মালিনীকে নিজেদের আধ্যাত্মিক ত্রাতারূপে স্বীকার করিল। তাহারা রুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিল—ভীত ব্রাহ্মণগণ আসিয়া রাজার আশ্রয় লইল। তাহাদের অনুরোধে মালিনীর নির্বাসনাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইল বটে, কিন্তু তাহারা সকল দুর্গতির মূলস্বরূপ কাশ্যপকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে দশজন সৈন্যকে পাঠাইয়া দিল। ইহারা কাশ্যপ কর্তৃক দীক্ষিত হইল। পরে আরও অধিকসংখ্যক লোক কাশ্যপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে তাহারাও আর্যধর্মে দীক্ষিত হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা বুঝিল আর লোক পাঠান বৃথা—কারণ তাহারা বিপক্ষের দলবৃদ্ধিমাত্র করিতেছে। তাহারা নিজেরাই উদ্দেশ্য-

সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হইল। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহারা কাশ্যপের আশ্রমের দিকে যাত্রা করিল। কাশ্যপ পৃথ্বী দেবীকে আবাহন করিয়া ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিল। পৃথ্বী একটি তাল গাছ উন্মুলিত করিয়া ব্রাহ্মণগণের দিকে নিক্ষেপ করিল—তাহার ফলে সকলে পিষ্ট হইয়া প্রাণে মরিল।

ইহাই মালিনী নাটকের মূল কাহিনী। এই কাহিনী পড়িলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, রবীন্দ্রনাথের মালিনী নাটকের সহিত ইহার সংযোগ নিতান্তই আংশিক। মালিনী কাশীরাজের কন্যা। সে নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। কাশ্যপ তাহার গুরু। রাজকন্যার নবধর্মগ্রহণে রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ অসন্তুষ্ট হইয়া রাজার নিকটে আবেদন করিয়া তাহার নির্বাসনদণ্ডের আদেশ আদায় করিয়া লইয়াছে এবং এই আদেশের ফলে রাজ্যের একদল মালিনীর প্রতি সমবেদনাশীল হইয়া উঠিয়াছে। মূল কাহিনীর সহিত নাটকের এইটুকু মাত্র মিল। বাকি অংশে যাহার ফলে ঘটনা নাটক হইয়া উঠিয়াছে—সমস্তই কবি কর্তৃক উদ্ভাবিত।

সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্কর- চরিত্র কবির মৌলিক পরিকল্পনা। ইহারাই তো বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণের নেতা। বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ রাজকন্যার আনুগত্য স্বীকার করিলে অসহায় ক্ষেমঙ্কর পররাজ্য হইতে সৈন্যসংগ্রহের আশায় প্রস্থান করিল—রাখিয়া গেল সুপ্রিয়কে। ইহার পরে যাহা ঘটিল পাঠকগণ জানেন। মালিনীকে বাদ দিলে সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্করই নাটকের প্রধান দুইটি চরিত্র—আর নাটকের প্রথম অংশের ব্রাহ্মণ-বিদ্রোহের ঘটনাকে ছাড়িয়া দিলে নাটকের উপসংহারে ক্ষেমঙ্কর কর্তৃক সুপ্রিয়কে হত্যা নাটকের প্রধান ও চূড়ান্ত ঘটনা।

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

'এমন সময়ে স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে

এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হ'ল দুই হাতের শিকল তার মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।...অনেক কাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেকদিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হ'ল।'[১]

কবির উল্লিখিত স্বপ্নাদ্য ঘটনা হইতে শেষতম দৃশ্যটিকে পাইলাম—মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এক বন্ধু কর্তৃক অপর বন্ধুকে হত্যা। এখন এই দুই বন্ধুর নামকরণ করিয়া—স্বপ্নের ইঙ্গিত অনুসারে ঘটনাস্রোতের উজানে গেলেই সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্করের কাহিনীকে পাওয়া যাইবে। মূল কাহিনীর সহিত স্বপ্নলব্ধ ঘটনার যোগ করিলেই নাটকটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। কেবল বাকি থাকে নাটকের অন্তর্লোকের সংবেদন। সে-সংবেদন মালিনী নাটক গ্রথিত হইবার অনেক আগে হইতেই বাষ্পরূপে কবির মনে একটা আশ্রয় খুঁজিতেছিল। মালিনীর মূল কাহিনী কবির দৃষ্টিতে পড়িবামাত্র এই ভাব রূপপরিগ্রহ করিল। অনেক শিল্পী রূপ হইতে ভাবে যান, আবার অনেকে ভাব হইতে রূপে গিয়া পৌঁছেন। এই রকমে শিল্পলোকে 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা' চলিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত ভাব হইতে যাত্রা করিয়া রূপে গিয়া উপনীত হইয়া থাকেন। যে-ভাব হইতে মালিনী নাটকের রূপে গিয়া কবি পৌঁছিয়াছেন তাহার স্বরূপ-ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—

'আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকারতত্ত্ব নয় সে,

১ র-র, ৪র্থ খণ্ড, মালিনী, সূচনা।

মূর্তিশালার মাটিতে পাথরের নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসেনি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করেনি। সত্য যার স্বভাব, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক, সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।... এই ভাবের উপরে মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা সেইটেতেই এর কাব্যরস।' [১]

কাজেই দেখা যাইতেছে, মূল কাহিনী, স্বপ্নলব্ধ কাহিনী এবং এই ভাব-সংবেদন—এই তিনটিকে একত্র গ্রথিত করিলে মালিনী নাটকের সম্পূর্ণ রূপ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, মূল কাহিনীর অতি-প্রাকৃত অংশ, স্থূলত্ব এবং কাশ্যপ কর্তৃক শত্রুগণের হত্যার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বর্জিত হইয়া নাটকখানি স্ফটিকশিলার নির্মলতা ও দীপ্তি লাভ করিয়াছে।

৯. নৃত্যনাট্য শ্যামা

নৃত্যনাট্য শ্যামার কবিপ্রদত্ত পূর্বতন রূপ 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত 'পরিশোধ' কবিতা। দুইটিরই মূল কাহিনী রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থের মহাবস্তুবদান অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে।

তক্ষশিলাবাসী বজ্রসেন নামে এক বণিক বারাণসীর এক মেলাতে অশ্ব-বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। পথে তাহার সর্বস্ব খোওয়া যায় ও সে নিজে আহত হয়। যখন সে ভাঙা এক মন্দিরে ঘুমাইতেছিল নগরপাল কর্তৃক সে চোর বলিয়া ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার মতো হয়। এমন সময়ে নগরের বারাঙ্গনা-প্রধানা শ্যামার চোখে সে পড়ে। বজ্রসেনের পুরুষোচিত সৌন্দর্যে সে আকৃষ্ট হয়। শ্যামা তাহাকে রক্ষা করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিল।

---

১ র-র, ৪র্থ খণ্ড, মালিনী, সূচনা।

বারাণসীর এক শ্রেষ্ঠীপুত্র শ্যামার রূপে মুগ্ধ ছিল। শ্যামার ইচ্ছায় ও তাহার পরিচারিকার কৌশলে উক্ত শ্রেষ্ঠীপুত্র নিজের অজ্ঞাতসারে বজ্রসেনের পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলে বজ্রসেন মুক্তি পায়।

শ্যামা বজ্রসেনকে ভালোবাসিত, বজ্রসেনও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। কিন্তু উক্ত শ্রেষ্ঠীপুত্রের মৃত্যুর কারণ জানিতে পারায় তাহার মনে শান্তি ছিল না, সে শ্যামাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। একদিন উভয়ে যখন ভ্রমণে বাহির হইয়াছে তখন সে শ্যামাকে মদ্যপানে অচেতন করিয়া গলা টিপিয়া জলে ডুবাইয়া ফেলিয়া রাখিয়া আসে। তাহার ধারণা হইয়াছিল শ্যামা মরিয়াছে। উক্ত স্থানের নিকটেই শ্যামার মা উপস্থিত ছিল। তাহার চেষ্টায় শ্যামা প্রাণে বাঁচিয়া উঠিল। বাঁচিয়া উঠিয়া তক্ষশিলানিবাসিনী এক ভিক্ষুণীর সাহায্যে বজ্রসেনকে সে প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইল।

ইহাই মূল কাহিনী। পরিশোধ কবিতায় ও নৃত্যনাট্যে মূল ঘটনার বিশেষ পরিবর্তন সাধিত না হইলেও নরনারীর ভাবনায় বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রথমত শ্রেষ্ঠীপুত্র উত্তীয় জানিয়া শুনিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে। নিষ্ফল প্রেমের পরিণামস্বরূপ সফল মৃত্যুকে সে আনন্দে গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, বজ্রসেনের দ্বিধা নূতনভাবে কবি-কর্তৃক চিত্রিত হইয়াছে। শ্যামাকে সে ভালোবাসে —কিন্তু সেই ভালোবাসার অন্তরায় উত্তীয়ের মৃত্যু। শ্যামাকে আঘাত ও বর্জনের পরে সে যে অনুশোচনা অনুভব করিয়াছে তাহাতে তাহার চরিত্র একরূপ ট্র্যাজিক মহত্ত্ব পাইয়াছে। প্রণয়পীড়িত শ্যামা যখন তাহাকে শেষবারের জন্য প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল— তখন নিজের ক্ষমাহীনতায় ধিক্‌কৃত হইয়া বজ্রসেন গাহিয়াছে—

প্রিয়ারে নিতে পারিনি বুকে
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি।

জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে-অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজন-শরণ প্রভু॥

প্রেম ও পাপ, বিচার ও ক্ষমার মধ্যে দোদুল্যমান বজ্রসেনের চরিত্র অশ্বত্থপত্রশীর্ষে কম্পমান শিশিরবিন্দুর মতো অসহায় এবং করুণার পাত্র। ইহা সর্বতোভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব, মূলে ইহার কিছুই নাই।

শ্যামার ধর্মাধর্মবিবর্জিত প্রেমের সর্বস্বভাবও রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত। যাহার জন্য শ্যামা নীতিধর্ম এমন অনায়াসে লঙ্ঘন করিল তাহাকে হারাইতে বাধ্য হইয়া শ্যামার পাপের প্রতি নয়, শ্যামার মুগ্ধ নারীহৃদয়ের প্রতি সুকৌশলে কবি পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আগেই বলিয়াছি যে, ঘটনার পরিবর্তনে নয়, পাত্রপাত্রীর ভাবনার পরিবর্তনেই মূলের সহিত কবিকৃত কবিতাটি ও নৃত্যনাট্যের প্রধান পার্থক্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক নাটককে পরবর্তী কালে রূপান্তর ও নামান্তর দিয়াছেন, তাহা ছাড়া নূতন সংস্করণের সময়েও অনেক নাটককে প্রভূত পরিমাণে সংস্কৃত করিয়াছেন। কোনো কোনো নাটকের রূপান্তর এত অধিক হইয়াছে যে, দু'খানিকে স্বতন্ত্র নাটক বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত, যেমন রাজা ও রানী এবং তপতী। কিন্তু এরূপ আমূল পরিবর্তনের বিষয় ছাড়িয়া দিলেও রূপান্তর ও নামান্তরভেদে অনেকগুলি নাটকের দুটি করিয়া রূপ প্রচলিত আছে। বর্তমানে আমরা তত্ত্বনাট্য পর্যায়ের রূপান্তর ও নামান্তরেরই আলোচনা করিব। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় এই-সব

রূপান্তর ও নামান্তরের উদ্দেশ্য কি এবং তাহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কি পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্যের সব শাখার মধ্যে নাটক সবচেয়ে বেশি বাস্তব-ঘেঁষা। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক হারাইলে তাহার এক মুহূর্তও চলে না। নাটক শ্রব্যকাব্য। দর্শক ও অভিনেতা, প্রযোজক ও লেখক—এতগুলির সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিলে তবে নাটকের রসোদ্বোধন ঘটে। নাট্যকারকে এই-সব বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রচনা করিতে হয়। তার পরে যে উপলক্ষ্যে অভিনয় তাহার দাবীও আছে। সময়ের পরিবর্তনে রচনার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। তা ছাড়া যোগ্যতর অভিনেতা দেখা দিলে তাহার শক্তির দাবীও মানিয়া লইতে হয়। এদিক দিয়া বিচার করিলে নাটককে যৌথ শিল্প বলা উচিত, যূথের যথাযথ সমাবেশেই নাটকের রসোৎকর্ষ।

এবারে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নাটক লিখিয়া সমাপ্ত করিবার পরেও লেখক কেন তাহার পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। এমন পরিবর্তন সব সময়ের সব দেশের নাটকেই ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাট্যের বহুল রূপান্তর ও নামান্তরের ইহা একটি প্রধান কারণ। কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

নাটকীয় প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট শক্তি নহে। তাঁহার প্রতিভার অক্ষয় তূণীরে বহু অস্ত্র আছে, নাটকীয় প্রতিভা তাহাদের অন্যতম, কিন্তু সে অস্ত্র মুখ্যস্থানীয় নয়। বহু নাটক তিনি রচনা করিয়াছেন, সংখ্যার বিচারে তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্যে কাব্যের পরেই নাটকের স্থান, এ-সবই সত্য। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাট্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রকাশ নয়। যে রচনায় প্রতিভার মুখ্য প্রকাশ, তাহাই নিখুঁত হইবার সম্ভাবনা; আর যে রচনায় প্রতিভার গৌণ শক্তির প্রকাশ, তাহাতে খুঁত থাকিয়া যাইবার আশঙ্কা। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। আর সেই অসম্পূর্ণতার বোধই কবি-গুরুর মনে

এক প্রকার অস্বস্তি জাগাইয়া রাখিয়াছে। আর এই অস্বস্তিবোধের ফলেই ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি নাটকগুলিকে ঢালিয়া সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মনে করিলে অন্যায় হইবে না। আমাদের এই সিদ্ধান্তের একটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। এক শ্রেণীর নাটককে আমরা কাব্যনাট্য বলিয়াছি, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ, বিদায়-অভিশাপ, নরকবাস, গান্ধারীর আবেদন প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর রচনায় নাটকের চেয়ে কাব্যের দাবী বেশি; ইহাদের অঙ্গে নাটকের লক্ষণের চেয়ে কাব্যের লক্ষণ অধিকতর প্রকট। আর যেহেতু রবীন্দ্রপ্রতিভার মুখ্য বিকাশ কাব্যে, গৌণ বিকাশ নাটকে, অধিকতর কাব্যলক্ষণাক্রান্ত এই-সব নাটক সম্পূর্ণতর আকার লাভ করিয়াছে, ইহাদের অঙ্গে খুঁত নাই বলিলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে অধিকাংশ নাটকের উপরে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু কাব্যনাট্যগুলিকে আর স্পর্শ করেন নাই। অসম্পূর্ণতাজাত যে অস্বস্তিবোধ অন্য নাটকগুলি সম্বন্ধে ছিল, কাব্যনাট্যগুলি সম্বন্ধে তাহা অনুভব করিবার কারণ তাঁহার মনে ছিল না।

অসম্পূর্ণ শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের শিল্পীর মনে যে অস্বস্তি অনুভূত হইয়া থাকে—তাহাই রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার অধিকাংশ নাট্যরচনার উপরে বারংবার হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য করিয়াছে। এ বিষয়ে তুলনাস্থানীয় রবীন্দ্রনাথের দোসর গ্যয়টে। নাটকীয় প্রতিভা গ্যয়টের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়, অথচ বহুতর নাটক তিনি রচনা করিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের মতোই একই কারণে তিনি বারংবার তাহাদের সংস্কারসাধন করিয়াছেন। এই-সব সংস্কারের ফলে রূপান্তর ও নামান্তরগুলি সম্পূর্ণতর আকার লাভ করিয়াছে কি না, সেটা বিচারের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করে নাই, রূপান্তর ও নামান্তরগুলি মৌলিক রচনার চেয়ে মোটের উপরে উন্নততর, সম্পূর্ণতর রচনা নয়। কিন্তু এই-সব অসম্পূর্ণতার মধ্যেও কবির

মনের ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে। সেই পরিচয় দানই আলোচনার উদ্দেশ্য।

শারদোৎসব নাটকের নামান্তর ঋণশোধ। ঋণশোধের সহিত শারদোৎসবের প্রধান পার্থক্য ঋণশোধের ভূমিকা ও শেখর-চরিত্রের সন্নিবেশ।[১] ইহা ১৯২১ সালের কথা।

১৯২২ সালে কলিকাতায় ঋণশোধের অভিনয়ের সময়ে পূর্বোক্ত ভূমিকা পরিত্যক্ত এবং একটি নূতন ভূমিকা সংযোজিত হয়।[২]

এ-দুটি পরিবর্তন ছাড়া আরও পরিবর্তনের চিহ্ন ঋণশোধে বর্তমান।

১৯২১ সালে ঋণশোধ নাটক অভিনয় উপলক্ষ্যে কতকটা অংশ সংযোজিত হয়।[৩]

১৯২১ সালের ভূমিকায় শারদোৎসবের সন্ন্যাসীকে সম্রাট বিজয়াদিত্যরূপে দেখানো হইয়াছে। তিনি শারদোৎসবে বাহির হইয়া পিঞ্জরীর বীণকার সুরসেনের বীণা শুনিতে যাইবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯২২ সালের ভূমিকায় নায়ক রাজা, মন্ত্রী, তাঁহাদের কোনো বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই। উভয়ের কথোপকথনে শারদোৎসবের অন্তর্নিহিত মর্ম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কোনো ঘটনার উল্লেখ নাই।

ঋণশোধ নাটককে শারদোৎসবের উচ্চতর সংস্করণ বলিয়া মনে হয় না। ভূমিকাগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য নাটকের মর্মব্যাখ্যা। 'শারদোৎসব' নামে যাহা সাধারণভাবে উক্ত হইয়াছিল, 'ঋণশোধ'

১ গ্রন্থপরিচয়, ঋণশোধ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩শ খণ্ড

২ গ্রন্থপরিচয়, শারদোৎসব, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭ম খণ্ড

৩ গ্রন্থপরিচয়, ঋণশোধ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩শ খণ্ড। ঐ পরিবর্তন মুদ্রিত ঋণশোধ নাটকে নাই। অভিনয়ের স্টেজকপিতে বর্তমান। ঐ স্টেজকপি নাটকের শ্রুতিকার বর্তমান লেখকের নিকটে রক্ষিত।

নামে তাহা স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রূপান্তর ও নামান্তরগুলির একটি প্রধান উদ্দেশ্য কবির আত্মব্যাখ্যার ইচ্ছা। ব্যাখ্যার আতিশয্যের দ্বারা শিল্পবস্তু কদাচিৎ উন্নততর রূপ লাভ করিয়া থাকে। এ-সব ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে মনে হয় না।

১০. অরূপরতন

'রাজা' নাটকের নামান্তর অরূপরতন। কিন্তু 'রাজা' নাটকের রূপান্তরও বর্তমান। 'রাজা' নাটকের প্রথম সংস্করণ ও রচনাবলী-সংস্করণে কিছু ভেদ আছে। প্রথম সংস্করণের চেয়ে রচনাবলী-সংস্করণ আকারে কিছু বড়। রচনাবলী-সংস্করণের প্রথম দৃশ্যে অন্ধকার কক্ষ, সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা কথোপকথনে নিযুক্ত। প্রথম সংস্করণের প্রথম দৃশ্যে পাই পথ এবং বিদেশী নাগরিকগণকে। অন্ধকার কক্ষকে দ্বিতীয় দৃশ্যরূপে দেখানো হইয়াছে। এ দিক দিয়া বিচার করিলে প্রথম সংস্করণকে উন্নততর বলা চলে। বিদেশী নাগরিকগণের আলোচনায় যে কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়, নাটকের গতির পক্ষে তাহা বিশেষ সাহায্য করে, সেই গতির বেগে অন্ধকার কক্ষের রহস্য গভীরতর হইয়া ওঠে। ইহা ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দুই সংস্করণে নাই, রসেরও তারতম্য ঘটিয়াছে মনে হয় না।[১]

অরূপরতনের দুইটি সংস্করণ বর্তমান, একটি ১৩২৬ সালের, অপরটি ১৩৪২ সালের, দুটিই মূল নাটকের চেয়ে আকারে অনেক ছোট।

১৩২৬ সালের সংস্করণে অদৃশ্য রাজার উত্তর-প্রত্যুত্তর বর্জিত হইয়াছে। ১৩৪২ সালের সংস্করণে পুনরায় অদৃশ্য রাজার কথোপকথন প্রবিষ্ট হইয়াছে। এদিক দিয়া বিচার করিলে ১৩২৬ সালের সংস্করণকে উচ্চতর শিল্পসৃষ্টি মনে করা উচিত। কেননা,

১ গ্রন্থপরিচয়, রাজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড

রাজা যদি দৃষ্টিগোচর না হন, তবে তাঁহার শ্রুতিগোচর হওয়াও উচিত নয়। চক্ষু যেমন ইন্দ্রিয়, কর্ণও তেমনি আর একটি ইন্দ্রিয়। যিনি অতীন্দ্রিয় তিনি সব ইন্দ্রিয়ের পক্ষেই সমান অগোচর। ১৩২৬ সালের সংস্করণে রাজাকে ইন্দ্রিয়গোচর না করিয়াও তাঁহার প্রভাবকে সর্বব্যাপী করিয়া তোলা হইয়াছে। সেই প্রভাবের ফলেই নাট্য-ব্যাপার ঘটিতেছে বলিয়া দেখানো হইয়াছে। এই বিষয়ে উক্ত সংস্করণ 'রাজা' ও 'অরূপরতনে'র সমস্ত রূপান্তর ও নামান্তরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শুধু ঐটুকু দিয়া নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই সংস্করণে মূল পাত্র-পাত্রীকে গৌণ স্থান দিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর জনতার কৌতুককর দৃশ্যগুলিকে মুখ্য করিয়া তোলা হইয়াছে এবং তার ফলে নাটকখানি লঘু হইয়া পড়িয়া রসহানি ঘটিয়াছে।

১৩৪২ সালের সংস্করণে অদৃশ্য রাজার কথোপকথন পুনরায় শ্রুত হইয়াছে। অন্য বিষয়ে ইহা প্রায় ১৩২৬ সালের সংস্করণের অনুরূপ।

সমগ্র রূপের বিচার করিলে বর্তমান লেখকের মতে রচনাবলী-সংস্করণই শ্রেষ্ঠ, যদিচ অদৃশ্য রাজার কথাবার্তা একটি খুঁত বলিয়াই মনে হয়। ওটাকে একটা 'কনভেনশন' বা সংস্কাররূপে ধরিয়া লইতে আপত্তি আছে, যেহেতু ১৩২৬ সালের সংস্করণ প্রমাণ করিয়াছে যে, রাজাকে সর্বতোভাবে বাদ দিয়াও তাঁহার প্রভাবকে নাটকের মধ্যে সক্রিয় করিয়া তোলা সম্ভব।

১১. গুরু

"সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি 'গুরু' নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশিত করা হইল।"

মূল নাটকের চেয়ে 'গুরু' আকৃতিতে ছোট এবং প্রকৃতিতে লঘুতর হইয়াছে। মূল নাটকে পাত্রগণের মধ্যে যে-সব তত্ত্বালাপ

ছিল, নামান্তরে তাহাদের অনেক অংশ বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু যে নাটকের প্রাণই হইতেছে তত্ত্ব, তত্ত্ব বাদ পড়িলে তাহা সব সময়ে সহজ-গ্রাহ্য হয় না, সহজে অভিনয়যোগ্য হইতে পারে। এই কারণেই নামান্তর মূল নাটকের চেয়ে দীনতর হইয়া পড়িয়াছে।

মূল নাটকের 'শোণপাংশু' নামান্তরে 'যূণক'। এ পরিবর্তন অনুমোদনযোগ্য। কারণ 'শোণপাংশু'র প্রকৃত অর্থ না জানিয়াও অনুমান করা চলে যে, শোণিত যাহাদের পাণ্ডু বা ফিকা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু শোণপাংশুদের প্রকৃতির দ্বারা এ অর্থ সমর্থিত হয় না। 'যূণক' বলিতে যৌবনের ভাব এবং যবন বা বিদেশীর ভাব সূচিত হয়। যূণকের মধ্যে দুটি ভাবই আছে, তারা বিদেশীও বটে আবার যৌবনের দীক্ষাপ্রাপ্তও বটে!

এই নামের পরিবর্তন বাদ দিলে অপর কোনো বিষয়ে গুরু নাটকে কোনো নূতন বা উন্নততর গুণের সমাবেশ হইয়াছে মনে হয় না।[১]

১২. রথযাত্রা

রথের রশির পূর্বতন রূপ রথযাত্রা ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রথের রশি তাহারই পরিবর্তিত ও পুনর্লিখিত রূপ।[২]

রথযাত্রা ও রথের রশির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দুটি। প্রথম নামটি, দ্বিতীয় রথযাত্রা লিখিত গদ্যে, আর রথের রশি লিখিত গদ্যছন্দে।

রথযাত্রায় কবির দৃষ্টি রথখানার উপরে, আর রথের রশিতে তাঁহার দৃষ্টি যে-টানের জোরে রথখানা চলে, তাহার উপরে। দুইয়ে

১ গ্রন্থপরিচয়, গুরু, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩শ খণ্ড

২ গ্রন্থপরিচয়, কালের যাত্রা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২শ খণ্ড

অনেক প্রভেদ। এ বিষয়ে রথের রশি অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

১৩. শিবের ভিক্ষা

কবির দীক্ষার পূর্বপাঠ ১৩৩৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় শিবের ভিক্ষা নামে প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল।[১]

এখানেও পরিবর্তন নামের। নামের পরিবর্তন ভাবের পরিবর্তন সূচনা করে। পূর্বতন পাঠে শিবকে বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে, পরবর্তী আকারে শিবভক্ত কবিই প্রধান। 'কালিদাসের মতো আমাদের কবিও শৈব।'

আর একটি পরিবর্তন গদ্য হইতে গদ্যছন্দে, পূর্বতন পাঠ গদ্যে লিখিত, পরবর্তী পাঠ লিখিত গদ্যছন্দে।

১৪. তাসের দেশ

তাসের দেশ নাটকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইয়া বাহির হয় ১৩৪৫ সালে। রচনাবলীতে দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠই গৃহীত হইয়াছে।

"প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা' অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত আকারে 'প্রথম দৃশ্যে' পরিণত হইয়াছে। পত্রলেখা চরিত্র নূতন সংযোজিত হইয়াছে।" [২]

সংস্করণভেদে তাসের দেশে রসের ও ভাবের তারতম্য ঘটে নাই।

রূপান্তর ও নামান্তরের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যে কোথাও কোথাও সামান্য পাঠান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু সে-সব তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

১ গ্রন্থপরিচয়, কালের যাত্রা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২শ খণ্ড
২ গ্রন্থপরিচয়, তাসের দেশ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩শ খণ্ড

উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, নাটকগুলির রূপান্তর ও নামান্তরের নানা কারণ বিদ্যমান, তন্মধ্যে বাস্তবের দাবী একটি হইলেও তাহা মুখ্য কারণ নয়। আসল কারণ অসম্পূর্ণ শিল্পসৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ও নিখুঁত করিবার প্রয়াস। কিন্তু ইহাতে কবি সিদ্ধকাম হইয়াছেন মনে হয় না, যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপান্তর ও নামান্তর মূল রচনার চেয়ে দীনতর মূর্তিতে দেখা দিয়াছে।[১] সেই সঙ্গে আছে অতি ব্যাখ্যা ও আত্মব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা হইতেই অনেক স্থলে একই নাটকে একাধিক ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। নাটকের রূপান্তর ও নামান্তরে নূতন নামকরণ করিবার সময়ে কবি দুইটি নিয়ম অনুসরণ করিয়াছেন মনে হয়।

পূর্বনাম নির্বিশেষ হইলে নূতন নামে তাহাকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিবার সঙ্কল্প। তাই শারদোৎসব হইয়াছে ঋণশোধ; রাজা হইয়াছে অরূপরতন; শিবের ভিক্ষা হইয়াছে কবির দীক্ষা; রথযাত্রা হইয়াছে রথের রশি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পূর্বনাম নির্বিশেষ, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নামান্তর তুলনায় বিশিষ্ট। শারদোৎসব বলিতে উৎসবের বিশেষ প্রকৃতিকে বুঝায় না, ঋণশোধ-নামকরণের দ্বারা উৎসবের বিশেষ প্রকৃতি নির্দিষ্ট হইয়াছে। রাজা নিতান্ত সাধারণ সংজ্ঞা, তুলনায় অরূপরতন বিশিষ্ট, রাজার প্রকৃতি ইহাতে নির্দিষ্ট।

আর একটি নিয়ম হইতেছে, পূর্বনামে যাহা ঋণাত্মক (Negative), নূতন নামে তাহাকে ধনাত্মক (Positive) করিয়া তোলা হইয়াছে।

১ রাজা ও রানীর নামান্তররূপে তপতীকে গ্রহণ করিলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যাইতে পারে। নাটকরূপে না হইলেও শিল্পবস্তুরূপে তপতী রাজা ও রানীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু তপতীকে নামান্তর না বলিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নাটক বলিয়াই ধরা উচিত। অবশ্য তপতী তত্ত্বনাট্যশ্রেণীর অন্তর্গত নয়, যথাস্থানে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

তাই অচলায়তন হইয়াছে গুরু; যক্ষপুরী হইয়াছে রক্তকরবী। অচলায়তন ও যক্ষপুরী দুটা নামই ঋণাত্মক, নাম দুটিতে স্থান দুটির অন্ধকার অবস্থার সূচনা করিতেছে; তুলনায় গুরু ও রক্তকরবী ধনাত্মক, নূতন নামে স্থান দুটির আশা ও মুক্তির সূচনা।

নাটকগুলির রূপান্তর ও নামান্তর হইতে কবিমনের কিছু পরিচয় পাওয়া গেল, আবার নূতন নামগুলি হইতেও কবিমনের আরও কিছু পরিচয় পাওয়া গেল।

রাজা নাটকের মূল কাহিনীর অনুবাদ প্রদত্ত হইল।[১]

বারাণসীরাজ সুবন্ধুর প্রধানা মহিষী আয়ুদার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শূরসেনের অন্তর্গত কান্যকুব্জ রাজার কন্যা সুদর্শনাকে বিবাহ করিল। সুদর্শনা পতিকে অত্যন্ত কুৎসিত দেখিয়া পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেল। কুশ কান্যকুব্জে গিয়া বিবিধ কলায় তাহার কৃতিত্ব দেখাইয়া সুদর্শনার মন প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্বশুরের পরামর্শে, কুশ যতীশ্বর নামে একটি রত্ন নিজ মস্তকে ধারণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ অপরূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্যে বিভূষিত হইলে, তখন পত্নী তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিল।[২]

এই স্বল্পাক্ষর, শিল্পসৌন্দর্যহীন ও সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতবর্জিত কাহিনীটির মধ্যে রাজা নাটকের বীজের সন্ধানলাভ পাঠকের পক্ষে সহজ নয়; স্পষ্টভাবে না বলিয়া দিলে নিতান্তই কঠিন। কাজেই নাট্যকারের পক্ষে এই বীজ হইতে উক্ত মহীরুহ সৃষ্টি করা যে কত শক্ত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু আবার এক হিসাবে এই কঠিন কাজটি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তেমন

১ কুশ জাতক, No. B 32, *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, Rajendralal Mitra.

২ এই কাহিনীটিকে ভিত্তি করিয়া আরও পরবর্তী কালে শাপমোচন নামে নৃত্যনাট্য লিখিত হইয়াছে।

কঠিন হয় নাই; কারণ রাজা নাটকের মূল ভাবটি অনেকদিন হইতেই বাষ্পাকারে তাঁহার মনের মধ্যে ভাসিতেছিল, এখন একটি কাহিনীর আশ্রয় পাইয়া দানা বাঁধিয়া সুসংহত, উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে আত্মপ্রকাশ করিল মাত্র।[১]

মূল কাহিনীকে নাটকে রূপান্তরিত করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথকে দুই দিক হইতে কাজ করিতে হইয়াছে, একদিকে কাহিনীটিকে যেমন শিল্পসৌন্দর্যে ভূষিত করিতে হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি আবার ইহাতে আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত সঞ্চার করিয়া দিতে হইয়াছে। বরঞ্চ শাপমোচন নৃত্যনাট্যের সঙ্গে কাহিনীটির যোগ ঘনিষ্ঠতর। শ্বশুরালয়ে গিয়া পত্নীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কুশের কলাবিলাসকে নৃত্যনাট্যে ফলাও করিয়া দেখানো হইয়াছে; যতীশ্বর রত্নধারণের মতো স্থূল বিষয় অবশ্যই দেখানো হয় নাই, যে-জ্যোতিতে বিগতরূপ অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহা তালভঙ্গরূপ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের পূর্ণতার জ্যোতি।

কিন্তু রাজা নাটকে ঘটনাস্রোত অন্যপথগামী।

কাহিনীর রাণী সুদর্শনা পতিকে কুৎসিত দেখিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল; নাটকের রাণী সুদর্শনা দেখিয়াছে যে, তাহার পতি

১ ১৯০৬ সালে প্রকাশিত খেয়া কাব্যে শুভক্ষণ, ত্যাগ, আগমন, দুঃখমূর্তি, মুক্তিপাশ, প্রভাতে, দান, বালিকাবধূ প্রভৃতি একগুচ্ছ কবিতা আছে। রাজা নাটকের 'রাজা' ও সুদর্শনার মধ্যে যে পতি-পত্নীর সম্বন্ধ দেখানো হইয়াছে এই কবিতাগুলির তাহাও একটা বৈশিষ্ট্য। আর তিনি কেবল পতিমাত্র নন, জগৎপতি বা রাজাও বটেন। আগমন কবিতাটিতে রাজাকে "আঁধার ঘরের রাজা" বলা হইয়াছে। রাজা নাটকের মহিষী সুদর্শনা নিজে স্বামী সম্বন্ধে ঠিক ঐ অভিধাই ব্যবহার করিয়াছে। প্রভেদের মধ্যে এই, নাটকে যাহা ডালপালা মেলিয়া পূর্ণাঙ্গে বিকশিত হইয়াছে, খেয়ায় লিরিক কবিতাগুলিতে তাহা আভাসে কথিত মাত্র। শুধু খেয়া কাব্যে নয়, আরও উজানে অগ্রসর হইলে নাটকে বর্ণিত ভাবটিকে ইতস্ততঃ আভাসে-ইঙ্গিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তবে খেয়া কাব্যে ভাবটি দানা বাঁধিয়া উঠিবার মুখে। 'আঁধার ঘরের রাজা'র উক্তিতে তাহা প্রমাণ হয়।

কেবল কুৎসিত নয়, ভীষণ। তাহার ধারণা হইল, এই জন্যই রাজা অন্ধকার ঘরের বাহিরে তাহার সঙ্গে দেখা করেন না। রাণী ক্রোধে ও আত্মধিক্কারে পতিগৃহ ত্যাগ করিল।

তার পর নানা অবস্থাবিপর্যয়ের পরে, আধ্যাত্মিক দুঃখভোগের অন্তে অন্ধকার ঘরের বাহিরে বিশ্বের আলোকের মধ্যে রাজা যখন দেখা দিলেন তখন রাণী বলিয়া উঠিল, 'তুমি সুন্দর নও প্রভু; তুমি অনুপম।'

মূল কাহিনীতে কেবল সুদর্শনা ও কুশকে (রাজাকে) পাই, নাটকের অন্যান্য সমস্ত পাত্রপাত্রীই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, তাহাদের উল্লেখমাত্রও মূলে নাই। তাহা ছাড়া মূলের কুশ (রাজা) ও সুদর্শনার চরিত্রে আধ্যাত্মিক বিবর্তন ঘটাইয়া তাহাদিগকে অনেক উচ্চতর শ্রেণীতে তোলা হইয়াছে; মাধুর্যের খাতিরে সুদর্শনা নামটিকে কবি রক্ষা করিয়াছেন মাত্র।

অন্যান্য নাটকের মূল সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে—

অচলায়তন নাটকে ধ্বজাগ্রকেয়ূরী, মারীচি, মহামারীচি, পর্ণশবরী, উষ্ণীষ-বিজয়, শৃঙ্গভেরিঙ্গ প্রভৃতি যে-সব মন্ত্রের ও ব্রতের উল্লেখ আছে সেগুলি রবীন্দ্রনাথের কল্পিত নয়; 'দি স্যান্‌সক্রিট বুদ্ধিস্ট লিটারেচার অব্ নেপাল' নামে পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থে এই-সব ধারণীমন্ত্রের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। অমঙ্গল নিবারণের আশায় বা অভীষ্ট ফললাভের ইচ্ছায় এই-সব মন্ত্র আবৃত্তি করা হইত বা লিখিয়া কবচে ভরিয়া ধারণ করা হইত।

মুক্তধারা নাটকের মূল প্রায়শ্চিত্ত নাটকে অনুসন্ধান করা যাইতে পারে—যদিচ কেবল প্রত্যক্ষভাবে ধনঞ্জয় বৈরাগীকেই পূর্বনাটক হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

রথের রশি নাটকের ঘটনা, অর্থাৎ রথের দিনে রথ না চলা এবং

অন্ত্যজদের টানে রথের চলা বর্তমান লেখক কর্তৃক বিবৃত একটি বাস্তব ঘটনা হইতে গৃহীত।

তাসের দেশ নাটকের মূল 'একটা আষাঢ়ে গল্প' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প।—গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড এবং রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭শ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

কাব্যবিষয়ক

কীট্‌সের 'এণ্ডাইমিওন' কাব্যের প্রথম ছত্রটি—A thing of beauty is a joy for ever, কিন্তু খসড়ায় ছত্রটি ছিল—A thing of beauty is a constant joy ; দু'য়ের মধ্যে অর্থগত প্রভেদ নাই, শব্দগত প্রভেদও যৎসামান্য, a joy for ever-এর স্থানে a constant joy, কিন্তু ঐ সামান্য প্রভেদেই রসের দুস্তর তারতম্য ঘটিয়াছে, একটি বাণীর অমর মুদ্রাঙ্কমণ্ডিত, অপরটি কবির একটি ধারণার বিবৃতি মাত্র। আসল কথা এই যে, কাব্য ও অ-কাব্যের মধ্যে একটি পদক্ষেপের মাত্র ব্যবধান। বিবাহসভায় বরবধূ একত্র সমপদক্ষেপে সপ্তপদ গমন করিয়া থাকে, ঐ সপ্তপদ গমনের পরে তাহারা দু'য়ে এক হইয়া দম্পতিতে পরিণত হয়। কিন্তু আবার ঐ সভাতেই উদ্যোক্তাগণ কত যাতায়াত করিতেছে—তাহারা যে একক সেই এককই থাকিয়া যায়। কাব্যে বাক্য ও অর্থ নিরন্তর সপ্তপদী গমনচেষ্টা করিতেছে, যেখানে যথাতাল গতিসম্পন্ন হইতেছে, সেখানে বাক্য ও অর্থ দম্পতিতে পরিণত হইয়া 'জগতঃ পিতরৌ:' হইয়া উঠিতেছে। প্রভেদ সামান্যই—কিন্তু সামান্য প্রভেদের মধ্যেই কাব্যের মর্মগত রহস্য নিহিত। A constant joy যে কাব্য নয়, কাব্যের খসড়া মাত্র, তার কারণ ওখানে বাক্য ও অর্থের সমতাল সপ্তপদী গমন সম্পন্ন হয় নাই—a joy for ever-এ তাহা ঘটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে রসের গাঁটছড়া বাঁধা হইয়াছে, অন্যটিতে সেরূপ কোনো রহস্যময় অনিবার্য বন্ধন নাই।

এবারে রবীন্দ্রনাথের একটি ছত্র লইয়া বিচার করা যাক। 'বর্ষা-মঙ্গল' কবিতার একটি ছত্র—'গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে।' কোনো কোনো সংস্করণে কবিকৃত পরিবর্তন এইরূপ—'গুরু গর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে।' দু'য়ে প্রভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট। শেষেরটিকে

অকাব্য বলিব না বটে, কিন্তু প্রথমটির তুলনায় অনেক নীচে তাহার আসন। একটিতে মুগ্ধ সৌন্দর্য—অপরটিতে মহৎ সৌন্দর্য চোখে পড়ে। বর্ষার ঘনঘটার মধ্যে গুরুগর্জনসম্বলিত বিদ্যুদ্‌বিকাশে চোখে পড়িল একটি নীপমঞ্জরী, আর একটিতে সমস্ত দিগন্তের হৃৎকম্পন ধ্বনিত হইয়া উঠিল; একটির নায়ক মানুষ, তাহার চোখে পড়িতেছে ক্ষুদ্র মুগ্ধ একটি 'নীপমঞ্জরী'—আর একটি নায়কনিরপেক্ষ, কে দেখিল না দেখিল কবি সন্ধান করেন নাই। গুরু-গর্জনের আনন্দময় সঙ্কেতে নীল অরণ্যরেখা পুলকিত হইয়া উঠিল, মানব-নিরপেক্ষ আদিম প্রকৃতি ওখানে আপন ভাবাবেগে আপনি আন্দোলিত হইতেছে; একটিতে মানুষের দৃষ্টির বিষয়ীভূত 'Close-up shot' আর একটিতে বিশ্বব্যাপী প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দন; দুই-ই সুন্দর, কিন্তু একটি মুগ্ধ সুন্দর আর একটি মহৎ সুন্দর, একটি মুগ্ধ বা Pretty আর একটি মহৎ বা Grand; একটি মুগ্ধ কাব্য আর একটি মহৎ কাব্য। অথচ কত সামান্য প্রভেদে এই তারতম্য ঘটিয়াছে—দুটিমাত্র শব্দের অদলবদল, নীপমঞ্জরী আর নীল অরণ্য। এত সামান্য প্রভেদে কাব্যে অকাব্যে বা মুগ্ধ কাব্যে ও মহৎ কাব্যে প্রভেদ ঘটিয়া থাকে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণ প্রকাশ হইবার ফলে কবির অনেক কবিতার খসড়া-রূপটি দেখিতে পাওয়া গেল। প্রত্যেক খণ্ড রচনাবলীর পরিশিষ্টরূপে গ্রন্থপরিচয় অংশ সংযোজিত হইয়াছে এবং সম্পাদকগণ অশেষ অধ্যবসায় সহকারে নানা স্থান হইতে অনেক কবিতার সম্পূর্ণ বা আংশিক পূর্বরূপ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাহার ফলে পাঠক ও সমালোচক সকলেরই কবিতাগুলি তুলনায় পড়িবার সুযোগ হইয়াছে। রসিক কেবল তুলনায় রসভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন, কিন্তু সমালোচক ইচ্ছা করিলে দুটি রূপে মিলাইয়া কবিচিত্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখিতে পারেন, দেখাইতে পারেন। খসড়া কবিতা কিভাবে পূর্ণরূপ

গ্রহণ করিয়াছে, কেন তাহার রূপান্তর ঘটিল, একটি হইতে অন্যটিতে সংক্রমণে কবিচিত্তের কি রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে —এতদিনে তাহা বুঝিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ণাঙ্গ কবিতায় কবিচিত্তের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ, খসড়ায় তাঁহার প্রতিভা ভাঙা-গড়ার মধ্যে প্রকাশিত; পূর্ণাঙ্গ শিল্পের ইন্দ্রধনু বিশ্লেষণ সহজ নয়, খসড়ায় সে অসুবিধা নাই, তাহাতে কবিকে যেন নেপথ্যে পাওয়া যাইতেছে যখন তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবার অবকাশ পান নাই। নেপথ্যের পরিচয় শিল্পের চূড়ান্ত রূপ না হইতে পারে, কিন্তু সেটা দৃষ্টির মধ্যে থাকিলে চূড়ান্ত পরিচয়টিও পূর্ণতর হইয়া উঠিবে বলিয়া বিশ্বাস। এখানে কল্পনা কাব্যের তিনটি অতিপ্রসিদ্ধ কবিতার খসড়া-রূপ লইয়া আলোচনা করিব ইচ্ছা করিয়াছি।[১]

প্রথমে 'প্রকাশ' কবিতাটিকে লওয়া যাইতে পারে। খসড়ায় ইহার নাম 'ধরা-পড়া'—অবশ্য বন্ধনীমধ্যে 'প্রকাশ' শব্দটিও লিখিত আছে। খসড়ায় চারিটি মাত্র শ্লোক—আকারে অনতিদীর্ঘ। পূর্ণাঙ্গ কবিতাটি দীর্ঘ, নয়টি শ্লোক-সমন্বিত। কিন্তু আসল প্রভেদ আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতে। খসড়াটি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, পূর্ণাঙ্গ রূপ কেবল দীর্ঘতর নয়, মহত্তর। খসড়ায় কবির যে কলম বাম হাতে চলিয়াছে, পূর্ণাঙ্গ রূপে তাহার দক্ষিণ হাতের চাল, কবির দাক্ষিণ্য প্রকাশের আর বিরাম নাই।

খসড়া হইতে খানিকটা উদ্ধার করা যাইতে পারে—

> চাঁদের সাথে চকোরীর
> নলিনী সাথে তপনের
> মেঘের সাথে বিজুরির
> প্রণয় শুধু স্বপনের;

১ চৌর-পঞ্চাশিকা, পিয়াসী ও প্রকাশ কবিতার খসড়া-রূপ—গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭ম খণ্ড।

সে-সব চোখে চোখে কথা,
সে-সব মহাগোপনতা,
লুকানো কত ছল-ভরা,
কাহার কাছে কবে কোথা,
প্রথমে পড়েছিল ধরা।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবিরশ্মি' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, কবিতাটির প্রেরণার মূলে শেলির 'Love's Philosophy'-র আইডিয়া বর্তমান। কথাটা সত্য বলিয়াই মনে হয়। খসড়ার শেষ ক'টি ছত্র শেলির কবিতার শেষ ক'টি ছত্রের প্রায় ভাবানুবাদ—

কহিল সুখে মুখ চুমি—
'পড়িল ধরা ত্রিভুবন
পড়িনু ধরা আমি তুমি।'

শেলির কবিতায় আছে—

What are all these kissings worth
If thou kiss not me?

অবশ্য শেলির কবিতার সঙ্গে কাব্যশিল্প হিসাবে কবিতাটির তুলনা হয় না, আবার পূর্ণাঙ্গ কবিতাটির সঙ্গেও খসড়ার তুলনা হয় না—দু'য়ের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ ঘটিয়া গিয়াছে—একটি অতি উচ্চাঙ্গের কাব্য আর একটি নিতান্তই অকাব্য। পূর্ণাঙ্গ কবিতাটির দুটি ছত্র উদ্ধার করা যাইতে পারে, অধিক অনাবশ্যক, কবিতাটি সুপরিচিত।

হাজার হাজার বছর কেটেছে
কেহ তো কহে নি কথা,
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে,
তরুরে ঘিরেছে লতা;

এ দু'য়ের মধ্যে তরতমের প্রভেদ মাত্র নয়, কাব্য-অকাব্যের প্রভেদ —এ কথা আগেই বলিয়াছি। কেন এমন হইল?

খসড়ায় রবীন্দ্রনাথের মন শেলির কল্পনার অক্ষরেখা অনুসরণ

করিতেছিল, তাই অক্ষম ভাবানুবাদের বেশি হয় নাই ; পূর্ণাঙ্গ রূপে তাঁহার মন নিজের কল্পনাকে অনুসরণ করিয়াছে। এটি প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ—পূর্ণাঙ্গ কবিতায় ছন্দের অবাধ প্রসার। যে অনন্তকালের প্রণয়-ইতিহাস কবি লিখিতে বসিয়াছেন,

চাঁদের সাথে চকোরীর
নলিনী সাথে তপনের

হ্রস্বায়ত ছন্দ তাহার যোগ্য বাহন নহে,

হাজার হাজার বছর কেটেছে,
কেহ তো কহে নি কথা-র

উদার অবাধ বিস্তারই তাহার প্রকাশের যথার্থ ক্ষেত্র। খসড়ার ক্ষুদ্র পিঞ্জরে উদাত্ত কল্পনার যে গরুড় মুদিতপক্ষ ছিল, পূর্ণাঙ্গ রূপের আকাশজোড়া খাঁচায় সে মুক্তপক্ষ হইবার স্থান পাইয়াছে—আর সেই স্থান পাইয়াছে বলিয়াই খসড়ার শেলি-অনুসারী কল্পনা পূর্ণাঙ্গ রূপটিতে স্বাবলম্বী হইয়া মহত্তর সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

তৃতীয় কারণ—রবীন্দ্রনাথ হাজার হাজার বছরের রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবার দায়িত্ব 'কবি'র উপর অর্পণ করিয়াছেন, খসড়ায় এই মানবিক সূত্রটি নাই বলিলেই চলে—একবার মাত্র 'কবি'র উল্লেখ আছে, তাহাও আবার নিতান্ত গৌণ রূপে—

পরের দিনে কবি-গীতে
রটিয়া যেত সে বারতা !

খসড়ায় প্রকৃতিই প্রধানপদবাচ্য, কবির স্থান নিতান্তই যেন পাদ-টীকায় ; পূর্ণাঙ্গ রূপে সমস্ত বিশ্বরহস্যের ঘনীভূত বাসরকেন্দ্রে কবিকে স্থাপন করা হইয়াছে, তার ফলে প্রাকৃতিক রহস্য মানবিক রহস্যের ভাষায় প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছে—যাহা ছিল প্রাকৃতিক সত্য, তাহা শিল্পের সত্য হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ঘটকরূপে দেখা দিয়া কবি মানব ও প্রকৃতির সম্বন্ধকে শিল্পের বাস্তবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে।

এই-সব তথ্য হইতে প্রভেদের কারণ কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইবে, কিন্তু চরম কারণটি অর্থাৎ আসল রহস্যটি বুঝাইবার উপায় নাই, যদি থাকিত তবে তো রহস্যই হইত না, আর যথার্থ কবিতার প্রাণ সর্বদাই রহস্যনির্ভর।

মনে হয় যেন আলোতে ছায়াতে
রয়েছে কি ভাব ভরা,
হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর
কিছুই পড়ে না ধরা।

কবির পক্ষেও যেমন, সমালোচকের পক্ষেও তেমনি। সৃষ্টির আদিম রহস্য ফাঁস করিয়া দিবার অভিশাপ কবির সৃষ্টি নিজ শিরে বহন করিতেছে। কবির বাচালতার ফলে সৃষ্টি সতর্ক হইয়া গিয়াছে—সেই দৃষ্টান্তে 'কবি'র সৃষ্টিও গুণ্ঠন আরও আঁটিয়া লইয়াছে—সমালোচকের কাছে তাহার শেষ রহস্য কিছুতেই উদ্‌ঘাটন করিবে না,

শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে
সন্দেহ হয় মনে
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন
বন হ'তে উপবনে।

সেই হাওয়ার ইশারা ধরিয়া যতটুকু বলা সম্ভব—তাহাই বলিলাম।

এবারে চৌর-পঞ্চাশিকা কবিতাটির খসড়ায়ও পূর্ণাঙ্গ রূপে তুলনা করা যাইতে পারে। খসড়াটি দীর্ঘতর, কাজেই পূর্ণাঙ্গ রূপে অনেক কথা বাদ পড়িয়াছে—

যবনীরা নবনীনির্মল শুভ্র রূপে
অলিন্দে বসিয়া
না কহে স্বদেশকথা অতি চুপে চুপে
দীর্ঘ নিশ্বসিয়া।
দূরে হতে কঞ্চুকীর পদশব্দ শুনি
আচম্বিতে উঠি

বসন সম্বরি যত সলজ্জা তরুণী
নাহি যায় ছুটি।

সুন্দর চিত্র—এ চিত্র পূর্ণাঙ্গ রূপে নাই, এমন আরও মনোরম চিত্র বাদ পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপটিই যে শ্রেষ্ঠতর রূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কারণ কি?

প্রথমত, মূলের অক্ষরবৃত্ত ছন্দ পূর্ণাঙ্গ রূপে মাত্রাবৃত্তে পরিবর্তিত হইবার ফলে এমন একটি ললিত ঝঙ্কার ধ্বনিত হইয়াছে যাহাতে বিদ্যার অলঙ্কারশিঞ্জিত মনে পড়িয়া যায়—সমস্ত কবিতাটির মধ্যে প্রণয়ের যে ললিতকোমল ভাবটি প্রকাশিত, তাহার উপযুক্ত ছন্দো-বাহন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ নয়, মাত্রাবৃত্ত।

দ্বিতীয় কারণ, পূর্ণাঙ্গ রূপে 'ওগো সুন্দর চোর'—এই ধ্বনিকে ধুয়ারূপে গ্রহণ করিয়া বারংবার আবৃত্তি করা হইয়াছে। সম শব্দের বা প্রায়-সম শব্দের সুনিপুণ পুনরাবর্তনে কাব্যে একপ্রকার মোহ উৎপন্ন হয়—'ওগো সুন্দর চোর'-এর পৌনঃপুনিক আবর্তনে তাহাই ঘটিয়াছে, একটি সূক্ষ্ম উজ্জ্বল মোহময় ইন্দ্রধনুময় কুয়াশা জমিয়া উঠিয়াছে—নির্বাপিতদীপানলশিখা বাসরভবনের বহুদিনগত রহস্য প্রকাশের পক্ষে ঐ কুয়াশাটির বড় প্রয়োজন ছিল। জাদুকর যেমন মায়াযষ্টি বুলাইয়া ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে, 'ওগো সুন্দর চোর'-এর মায়াযষ্টি সেইরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

আরও একটি কথা, 'সুন্দর' শব্দের সুনিপুণ প্রয়োগ, অর্থাৎ শব্দটিকে একাধারে বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে নিয়োগেও কবিতাটির মাধুর্য অল্প বাড়ে নাই; বিশেষভাবে ঐ শব্দটি বারংবার আবর্তনশীল ধুয়ার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া অর্থগৌরবের দ্বিত্ব মনকে আঘাতের পর আঘাত করিয়া আপন মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলে।

এবারে তৃতীয় কবিতা—'পিয়াসী'। এই কবিতাটির খসড়া ও পূর্ণাঙ্গ রূপের মধ্যে শিল্পগত তারতম্য সামান্যই, এমন-কি, খসড়াটিকেও অনেকে শিল্পের সুষ্ঠুতর প্রকাশ মনে করিলে বিস্মিত

হইবার কিছুই নাই। তবু সূক্ষ্ম বিচারে মনে হয় যে, চূড়ান্ত রূপটিই শ্রেষ্ঠতর, তাহার তিনটি শ্লোকে অগ্রগতির তিনটি পদক্ষেপ। প্রত্যেক শ্লোকের প্রথম ছত্র এবং শেষ ছত্র বিশ্লেষণ করিলে ক্রমবিকাশের গতি লক্ষ্য করা যাইবে।

প্রথম শ্লোকের 'আমি তো চাহি নি কিছু' দ্বিতীয় শ্লোকের 'আমি তো কহি নি কথা' এবং তৃতীয় শ্লোকের 'আমি তো যাই নি কাছে'-র মধ্যে 'পিয়াসী'র মনোভাবের যে ক্রমপরিণতি কবিতাটির অর্থগৌরববৃদ্ধিতে সাহায্য করে—খসড়ায় তাহা একেবারেই নাই। প্রত্যেক শ্লোকের শেষ ছত্রেও নৈরাশ্যের একটা ক্রমপরিণতি আছে—অবশ্য ইহা খসড়া ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দুটিতেই আছে, প্রায় সমগুরুত্বেই আছে, তবু পূর্ণাঙ্গ রূপের ছত্রগুলিই যেন অধিকতর সৌষ্ঠবসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। মোটের উপরে বলা যায়—চৌর-পঞ্চাশিকা ও প্রকাশ কবিতার দুটি রূপের মধ্যে যে দুস্তর বাধা—পিয়াসীর ক্ষেত্রে তেমন নয়; এমন-কি, একটা ছাড়িয়া অপরটিকে পছন্দ করিলে দোষ দেওয়া যায় না।

এখন রবীন্দ্রকাব্য-আলোচনায় গভীরভাবে ও বিস্তারিতভাবে প্রবেশের সময় আসিয়াছে, রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তরের আলোচনা এবারে আরম্ভ হওয়া উচিত। এতদিন সে আলোচনার উপাদানের অভাব ছিল, রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণ প্রকাশিত হইবার ফলে সে অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। আরও দূর হওয়া আবশ্যক। এইজাতীয় আলোচনার উপাদান আরও অধিক পরিমাণে পাঠক-সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

২

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কবিতাগুলিতেই পাঠান্তর বেশি। আগের দিকেও আছে, তবে তুলনায় কম। পাঠান্তরবাহুল্য পূরবী হইতে যেন বেশি করিয়া দেখা দিয়াছে, ইহার কারণ অনুসন্ধান করা

আবশ্যক। এমন হওয়া অসম্ভব নহে যে, প্রথম দিকের পাঠান্তরগুলি রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এ যুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রাহ্য নয়। প্রথমজীবনের কাব্যের যে-সব পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে পাঠান্তরগুলি লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলির সঙ্গে শেষজীবনের পাণ্ডুলিপির তুলনা করিলে সহজেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে। আরও একটি কথা, সেটি আমাদেরই অনুকূলে। রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণের গ্রন্থপরিচয় অংশে যে-সব পাঠান্তর মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার ভিত্তি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, পাণ্ডুলিপিতে লিখিত সবগুলি পাঠান্তর গ্রন্থপরিচয়ে মুদ্রিত করা সম্ভব হয় নাই; সংখ্যায় তাহারা আরও বেশি। কাজেই শেষজীবনের কাব্যে পাঠান্তর যে জীবনের পূর্বার্ধের চেয়ে অনেক বেশি—এ কথা স্বীকার করিয়া লইতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

এবারে প্রশ্ন—কেন এমন হইল? অনেকে বলিতে পারেন যে, কবিতা তো একেবারে স্বয়ম্পূর্ণ মূর্তিতে প্রথমেই দেখা দেয় না—মনের মধ্যে অনেক ওলটপালট, অনেক রদবদল চলিতে থাকে, সেগুলিকে কেহ ধরিয়া রাখে না, ধরিয়া রাখিলে সেগুলিও পাঠান্তর বলিয়া গৃহীত হইতে পারিত। ও-সব যেন শ্লেটের লেখা, লিখিবার পরেই মুছিয়া ফেলা হয়। ওয়ার্ডস্বার্থের অভ্যাস ছিল যে, বনে-বাদাড়ে ঘুরিবার সময়ে মনে মনে কবিতা রচনা করিতেন, তখন নিশ্চয়ই অনেক রদবদল হইত, বাড়িতে ফিরিয়া চূড়ান্ত রূপটি লিপিবদ্ধ করিতেন, সে-সব পাঠান্তর হাওয়ায় মিশিয়া গিয়াছে, কেহ ধরিয়া রাখে নাই। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও নিশ্চয় এ নিয়ম প্রযোজ্য। কাজেই কোনো কবিতার পাঠান্তর পাওয়া না গেলেই ধরিয়া লওয়া উচিত নয় যে, কবিতাটি একেবারে স্বয়ম্ভুমূর্তিতে দেখা দিয়াছে। এ সমস্তই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু হাওয়ার উপরে নির্ভর করিয়া তো আলোচনা চলে না। লিপিবদ্ধ প্রমাণকে স্বীকার

করিয়া লইয়াই আলোচনা চালাইতে হইবে। এ ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ প্রমাণ আমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে। সেটি কি, প্রথমেই বলিয়াছি —কবির শেষজীবনের কাব্যে পাঠান্তরের সংখ্যা জীবনপূর্বার্ধের চেয়ে অনেক বেশি।

এখন, পাঠান্তর সাধারণত দুই শ্রেণীর হইতে পারে। একটি ক্রমবিকাশমূলক, অপরটি সমান্তরালমূলক। কবির বিবেচনায় কবিতার যে রূপটি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত তাহাই রক্ষিত হয়— অনেক সময়ে কবিতার বিবর্তনের রূপসমূহ যদি মনে মনে না হইয়া লিখিত আকারে হইয়া থাকে সেগুলি খাতার মধ্যে থাকিয়া যাইতে পারে। বলা যাইতে পারে যে, ঐগুলি কবিতার বিবর্তনের ধাপ— ঐ ধাপগুলি উত্তীর্ণ হইয়া কবিতাটি তাহার চূড়ান্ত রূপে পৌঁছিয়াছে। এই শ্রেণীর পাঠান্তরকে ক্রমবিকাশমূলক বা বিবর্তনমূলক পাঠান্তর বলা চলে।

আর-এক শ্রেণীর পাঠান্তর আছে—তাহাকে সমান্তরাল পাঠান্তর বলিয়াছি। কোনো কবিতার হয়তো তিনটি পাঠ আছে, তাহাদের সৃষ্টির মূলে বিবর্তনের নিয়ম সক্রিয় নয়;—একটির চেয়ে আর একটি শিল্পসৃষ্টি হিসাবে যে উন্নততর এমন নয়, তিনটিই সমান ভালো বা তিনটিই সমান মন্দ; অর্থাৎ কবিতাটি যেন সমুখের দিকে না বাড়িয়া গঙ্গার ইলিশের মতো পাশের দিকে বাড়িয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর পাঠান্তরকে সমান্তরাল বলা অন্যায় হইবে না। এই দুই শ্রেণীর পাঠান্তরের আলোচনাই শিক্ষাপ্রদ। ক্রমবিকাশমূলক পাঠান্তরের আলোচনা অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য—কারণ ক্রম-বিকাশের একটা লক্ষ্য আছে—এবং চূড়ান্ত রূপে সে লক্ষ্যটিকে আমরা পাইতেছি। কিন্তু সমান্তরাল শ্রেণীর আলোচনা তেমন অনায়াসসাধ্য নয়—এখানে কবির লক্ষ্য কি আমরা স্পষ্ট জানিতে পাই না, অনেক সময়ে একেবারেই জানিতে পাই না। কেন তিনি পাঁচটি অল্পবিস্তর সমান রূপ সৃষ্টি করিতে গেলেন, কেনই-বা

সেগুলিকে চূড়ান্ত মর্যাদা না দিয়া পাঠান্তরের গাদায় নিক্ষেপ করিলেন, সমুখের দিকে হস্ত প্রসারিত না করিয়া, কেন তিনি পাশের দিকে হাত বাড়াইয়া মরিতেছিলেন—এ-সব রহস্য সত্যই দুর্জ্ঞেয়।

পাঠান্তরের এই দুটি মূলশ্রেণী ছাড়াও অন্যরূপ পাঠান্তর হইতে পারে—কিন্তু সে কথা প্রসঙ্গত আসিবে।

৩

এখন, রবীন্দ্রনাথের একটি প্রসিদ্ধ কবিতার প্রসঙ্গে এই দুই শ্রেণীর পাঠান্তরের আলোচনা করিব। কবিতাটি মহুয়া কাব্যগ্রন্থের —উজ্জীবন। সৌভাগ্যবশত এই একটি কবিতারই দুই শ্রেণীর পাঠান্তর বর্তমান, তাহাতে আলোচনা অনেক পরিমাণে সুসাধ্য হইয়া আসিবে।

মহুয়া কাব্যে মুদ্রিত পাঠ-কেই চূড়ান্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। খুব সম্ভবত ইহার প্রথমতম রূপ—

উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি ধূর্জটির ক্রোধবহ্নিশিখা
হে মন্মথ, মনসিজ, হে মনের মায়ামরীচিকা—
তৃষ্ণামরুবিহারে বিলাস—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

ইত্যাদি।[১]

এবারে কবিতাটির পূর্ণাঙ্গ রূপ এবং এই প্রাথমিক রূপের মধ্যে তুলনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়—একটি হইতে আর-একটির বিকাশ হইয়াছে—অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ ক্রমবিকাশের। পাঠান্তরটি অসম্পূর্ণ বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। এ অনুমান সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে, পাঠান্তরের শেষ পর্যন্ত যাইবার প্রয়োজন কবি বোধ করেন নাই, তার আগেই পূর্ণতর রূপটি

---

১ গ্রন্থপরিচয়, মহুয়া, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫শ খণ্ড। "তপতীর পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ-স্বতন্ত্র পাঠ। অসম্পূর্ণ?"

তাঁহার কল্পনায় উদ্ভাসিত হওয়াতে অপূর্ণ রূপটিকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এ যেমন গেল কবিতাটির ক্রমবিকাশমূলক পাঠান্তর, তেমনি আছে সমান্তরালমূলক পাঠান্তর, তাহাদের তিনটি রূপ।[১] মহুয়ার চূড়ান্ত পাঠ ধরিলে চারিটি—আর পূর্বে উল্লিখিত ক্রমবিকাশমূলক পাঠ ধরিলে সবশুদ্ধ পাঁচটি।

এখানে সমান্তরাল পাঠান্তর তিনটিই আলোচ্য। পাঠ তিনটি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ আর যাই হোক ক্রমবিকাশের নয়;—একটির চেয়ে আর একটি সমৃদ্ধতর নয়; আবার একটির সঙ্গে আর একটির প্রভেদ মূলগত নয়, নিতান্তই শাখাগত; এ যেন অনেকটা অন্ধভাবে হস্তক্ষেপ—কোন্ রত্নের অন্বেষণে? যাহারই অন্বেষণ হোক, ফলকথা তিনটি পাঠান্তর সমান্তরালভাবে বিরাজ করিতেছে; শুধু তাই নয়, পাঠান্তরের কোনো কোনো অংশ চূড়ান্তরূপে গৃহীত পাঠটির চেয়েও সুন্দর ও সমৃদ্ধ।[২]

এবারে মহুয়া কাব্যগ্রন্থের আর কতকগুলি পাঠান্তরের আলোচনা করা যাইতে পারে।

---

১ (১) গ্রন্থপরিচয়, মহুয়া, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫শ খণ্ড
(২) তপতী ১ম সং, পৃঃ ৫২-৫৫
(৩) তপতী ৩য় সং, পৃঃ ৪-৫

২ পূর্ণাঙ্গ রূপে আছে—'দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ'; সমান্তরাল পাঠে আছে—'সঙ্কট-বন্ধুর তব দীর্ঘ রাজপথ'। ব্যঞ্জনার গুণে 'সঙ্কট-বন্ধুর' পূর্ণাঙ্গরূপের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, কেননা, 'সঙ্কট-বন্ধুর' বলিতে দুঃখসুখের বন্ধুরতাকেই বোঝায় না—আরও কিছু বেশির সংকেত করে, সেই সংকেতটুকু 'দুঃখে সুখে বেদনা'র স্পষ্টোক্তির মধ্যে নাই।

তার পরে 'দীর্ঘ রাজপথ'—শুধু 'পথ'-এর চেয়ে সমৃদ্ধতর। মহুয়া প্রেমের কাব্য, তপতী প্রেম-ব্যতিক্রমের নাটক; যাহারই পটভূমিতে কবিতাটিকে দেখা যাক—প্রেমের 'রাজপথ' বর্ণনাই সার্থকতর বলিয়া মনে হয়। এমন-কি, সাধারণভাবে গ্রহণ করিলেও সংসারে প্রেমের অভিযান রাজপথরূপেই বর্ণন-যোগ্য, শুধু 'পথ' তাহার পক্ষে নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। চূড়ান্ত পাঠটিতে প্রেমের অভিযানের বন্ধুরতাই শুধু আছে, পাঠান্তরে তাহার বন্ধুরতা ও প্রসার দুটি গুণকেই পাইতেছি।

মহুয়ার বরণ কবিতাটির একটি পাঠান্তর গ্রন্থপরিচয়ে আছে।[১] চূড়ান্ত রূপ ও পাঠান্তর, দুটিই দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান, তবে প্রথমোক্তটির শ্লোকব্যূহের ছত্রসজ্জা অনিয়মিত, শেষোক্তটির নিয়মিত। ভাবের ঐশ্বর্যের পূর্ণাঙ্গ রূপটিই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর।

তুমি যেন মহাকালসমুদ্রের তটে
নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে
দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যান-মাঝে উমার ভৈরবী।

এই অংশের অনুরূপ পাঠান্তরে নাই।

তবে এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণীয়। বলাকার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা—এবং অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা তো বটেই—অনিয়মিত শ্লোকব্যূহে রচিত। এমন হইবার কারণ কি ? এই উপলক্ষে মনে রাখা আবশ্যক যে, গদ্য-ছন্দ অনিয়মিত শ্লোকব্যূহ হইতেই উদ্ভূত, আর তাহা অনিয়মিত শ্লোকব্যূহেরই একটা চূড়ান্ত রূপ।

মহুয়া কবিতার পাঠান্তর অষ্টাদশমাত্রার একটি সনেটে[১] ; চূড়ান্ত রূপটি অনেক দীর্ঘ, কাজেই অনেক অতিরিক্ত বস্তুতেও পূর্ণ। কিন্তু এখানেও পূর্বোক্ত সমস্যার সাক্ষাৎ পাই। নিয়মিত শ্লোকব্যূহের স্থলে কবি অনিয়মিত শ্লোকব্যূহকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

অন্তর্ধান ও বিরহ দুটি কবিতা, কিন্তু গ্রন্থপরিচয়ে এ দুটি একটিমাত্র দেহে শৃঙ্খলিত।[১] শৃঙ্খল মোচন করিয়া, যাহারা স্বভাবত স্বতন্ত্র তাহাদের ভিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

এইজাতীয় পাঠান্তরের সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে পাইব, কখনো দুইকে এক করা হইয়াছে, কখনো এক দুই হইয়া গিয়াছে। এই শিল্পগত অস্থিরতা একপ্রকার আত্মাগত অশান্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া

১ গ্রন্থপরিচয়, মহুয়া, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫শ খণ্ড

মনে হয়। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক যাহাতে কবির অন্তর্লোক সম্বন্ধে অনেক রহস্য জানিতে পারা যাইবে।

পরিশেষ কাব্যগ্রন্থের 'বিচিত্রা' কবিতাটির পাঠান্তর আলোচনাযোগ্য। পূর্ণতর রূপটি দীর্ঘতর এবং হালকা ছন্দে রচিত; পাঠান্তরটির ছন্দ গম্ভীর, আকারও তুলনায় ছোট। কিন্তু একটি কারণে পাঠান্তরটি আমার কাছে কাব্য হিসাবে শ্রেষ্ঠতর মনে হয়—এখানে শিল্পীর উপরে তাত্ত্বিকের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ ঘটে নাই। চূড়ান্ত রূপের শেষ শ্লোক দুটি একেবারেই অবান্তর, কবিতাটির মধ্যে না ছিল তাহাদের সম্ভাবনা, রসোদ্বোধনের জন্য না আছে তাহাদের আবশ্যক, বরঞ্চ সচেতন তত্ত্বসৃষ্টিপ্রয়াস দ্বারা রসভঙ্গ হইয়াছে বলিয়াই আমার ধারণা। এ রকম উদাহরণ রবীন্দ্রকাব্যে আরও আছে, তবে শেষের দিকের কাব্যেই তাহাদের সংখ্যা বেশি।

শেষ সপ্তক কাব্যের প্রায় সবগুলি কবিতারই একাধিক রূপ, কোনো কোনো কবিতার তিনটি করিয়া রূপ বর্তমান। মূল কাব্যখানির সঙ্গে সংযোজন ও গ্রন্থপরিচয় অংশ মিলাইয়া পড়িলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে। কোনো কোনো কবিতার—যেমন 'ঘটভরা' কবিতাটির—তিনটি রূপই গদ্য-ছন্দে লিখিত। অনেক কবিতার একটি রূপ গদ্য-ছন্দে, একটি রূপ পদ্যে লিখিত; কোনো কোনো কবিতার সঙ্গে আবার পরবর্তী কাব্য প্রান্তিকের ঘনিষ্ঠ মিল।

বিভিন্ন রূপগুলি পড়িলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এগুলি ক্রমবিকাশমূলক নয়, সমান্তরাল। একটির সঙ্গে আর-একটির যেটুকু প্রভেদ, তাহাতে কোনোটিকে নিশ্চিতভাবে উন্নততর রূপ বলা যায় না, কোনোটা-বা এক অংশে উন্নত, কোনোটা-বা আর-এক অংশে উন্নত। মোট কথা সমান্তরালতাই ইহাদের প্রধান লক্ষণ।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠিবে। কাব্যের সমান্তরাল রূপ কি

সম্ভব? ক্রমবিকাশমূলক অবশ্যই সম্ভব, কেননা ক্রমবিকাশের ধাপে ধাপেই কাব্য চরম রূপে গিয়া পৌঁছায়। কিন্তু সমান্তরাল রূপ কি করিয়া সম্ভব? অপরপক্ষ বলিতে পারেন—সম্ভব যে তাহা তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কিন্তু এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না—সমান্তরাল রূপ আদৌ কেন?

আমার সাধ্যানুসারে প্রশ্নটার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। সূক্ষ্ম বিচারে শব্দের প্রতিশব্দ সম্ভব নয়, অথচ অভিধানে তো প্রতি-শব্দের অভাব নাই। একটা উদাহরণ লওয়া যাক। শিখী ও কলাপী দুই-ই ময়ূর, ওদুটি ময়ূরের প্রতিশব্দ। ইহাই স্থূল বিচার। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার বা শিল্পীর বিচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

'উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে।'

এখানে 'কলাপী'র বদলে 'ময়ূর' বা অন্য প্রতিশব্দে চলিত কি? মেঘসন্দর্শনে হৃষ্ট ময়ূরের বিস্ফারিত পুচ্ছের প্রতিই এখানে কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ, কাজেই অভিধান যাহাই বলুক, এখানে কবির ভাব-প্রকাশের একটি মাত্র শব্দ বর্তমান, সেটি 'কলাপী'।

আবার আর-একটি ছত্র লওয়া যাক—

'ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া;'

এখানে 'কলাপী' একেবারেই অচল, এখানে কবির দৃষ্টি ময়ূরের শিখাটির প্রতি নিবদ্ধ। কেন এমন হইল? প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে মেঘোদয়ে ময়ূরের কলাপ মেলিবার প্রশস্ত স্থান আছে, ভবন-বলভিতে সে সঙ্কুচিতসত্তা, তাই কবি কল্পনার রশ্মি ঐ ক্ষুদ্র শিখাটির উপরে মাত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন।

আরও একটি উদাহরণ লওয়া যাক্—

'ময়ুর, করো নি মোরে ভয়।'

এখানে শিখীও নয়, কলাপীও নয়; কারণ এখানে পাখীটির কোনো অঙ্গের প্রতি বা বিশেষ কোনো অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় নাই—তাহার মূল সত্তাটিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। মূল

শব্দটি ময়ূর, অন্যগুলি প্রতিশব্দ। কিন্তু শিল্পীর বিচারে প্রতিটিই স্বতন্ত্র শব্দ—একটির বদলে আর-একটি অচল।

এখন সূক্ষ্ম বিচারে শব্দের যদি প্রতিশব্দ সম্ভব না হয়, কাব্যেরও প্রতিরূপ সম্ভব নয়। কিন্তু আবার সেই পুরাতন আপত্তি জাগিবে, সম্ভব সে তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। পুরাতন আপত্তির পুরাতন উত্তর। হয় এগুলি প্রতিরূপ নয়, সম্পূর্ণ নূতন রূপ, কিংবা কাব্যের প্রেরণার মূলে কোনো ত্রুটি আছে, যাহাতে সবটা অখণ্ড মূর্তি না পাইয়া ভাঙিয়া গিয়া গ্রহাণুপুঞ্জের অজস্রতা লাভ করিয়াছে।

এই বিচিত্র রূপগুলি যে নূতন রূপ নয়, তাহা নিতান্ত অন্ধেও বলিতে পারিবে। তবে প্রতিরূপ। কেন? এবারে গোড়ায় উল্লিখিত একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিই। রবীন্দ্র-জীবনের প্রথম দিকের তুলনায় শেষের দিকেই কবিতার রূপের দ্বিত্ব-সংখ্যা বেশি। আমার বিশ্বাস, এ দুটি কার্যকারণে শৃঙ্খলিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে গোড়া হইতেই হৃদ্‌বৃত্তি (Emotion) ও চিদ্‌বৃত্তির (Intellect) ভারসাম্য দেখা যায়, এ কথা সত্য। কিন্তু তবুও বিশেষভাবে বলিতে গেলে প্রথম দিকের কবিতা হৃদ্‌বৃত্তিপ্রধান, শেষজীবনের কবিতা চিদ্‌বৃত্তিপ্রধান। এই প্রসঙ্গে তুলনীয় বসুন্ধরা ও পৃথিবী কবিতা দুটি। প্রথমটির উৎস বিশ্ববোধে, দ্বিতীয়টির উৎস বিশ্ববুদ্ধিতে; একটির উৎস হৃদয়, একটির উৎস মস্তিষ্ক। হৃদয়ের যাতায়াতপথ বহু লক্ষ বৎসর হইল চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে, সহজাত সংস্কারের বলে সে অন্ধকারেও চলিতে পারে যেমন অন্ধকারে আমরা পরিচিত গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া থাকি। হৃদয়ের তুলনায় বুদ্ধি নিতান্তই নাবালক; নূতন বাড়িতে সবেমাত্র সে প্রবেশ করিয়াছে, আলো ছাড়া তার চলে না এবং আলোতেও ভুল করিতে বাধে না; আলো পথ দেখায়, কিন্তু কোন্ পথটা ঠিক তাহা দেখাইবে কি উপায়ে?

বুদ্ধি বারংবার ভুল পথ অবলম্বন করে এবং ফিরিয়া আসে, সেই ভুল চলার পদচিহ্ন কবিতার এই প্রতিরূপগুলি; বুদ্ধি এদিক-ওদিক হাতড়াইয়া মরে, সেই হাতের ছাপ এই বিচিত্র রূপগুলিতে। হৃদয় বাঘের মতো সহজাত সংস্কারের বলে যেখানে এক লাফে শিকারের ঘাড়ে গিয়া পড়ে, বুদ্ধিকে সেখানে শিকারীর মতো অনেক তাক্ করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে হয়—একটা যদি লক্ষ্যে বিদ্ধ হয়, চারটা ভ্রষ্টলক্ষ্য হইয়া এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়ে। কবিতার প্রতিরূপগুলি সেই ইতস্তত ছড়াইয়া-পড়া তীর। প্রতিরূপের প্রাচুর্য, আর যাই হোক, প্রতিভার প্রাচুর্য নয়, হয়তো ঠিক তাহার বিপরীত।

পত্রপুট কাব্যের ষোল-সংখ্যক কবিতাটি আফ্রিকা-বিষয়ক। ইহার তিনটি রূপ বর্তমান। একটি রূপ বা চূড়ান্তভাবে গৃহীত রূপ ষোল-সংখ্যক কবিতাটি, অন্য দুটি রূপ গ্রন্থপরিচয়ে প্রদত্ত।[১] চূড়ান্ত রূপটি গদ্য-ছন্দে লিখিত, অন্য দুটি রূপে অমিত্র পদ্য-ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

তিনটি রূপ বা পাঠের মধ্যে ঐশ্বর্যের বিশেষ তারতম্য নাই, পাঠক ইচ্ছা করিলে যে-কোনো একটিকে চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কবির পছন্দ গদ্য-ছন্দে লিখিত পাঠটির প্রতি। এমন হইবার কারণ মনে হয় যে, শেষ জীবনে গদ্য-ছন্দটার প্রতিই তাঁহার টান বেশি হইয়াছিল। আর একটা কারণ, বিষয়ের অভূতপূর্বতা ছন্দের অভূতপূর্বতার অপেক্ষা রাখে। পদ্য-ছন্দের তুলনায় গদ্য-ছন্দ নিঃসন্দেহ অভূতপূর্ব।

পত্রপুটের আঠারো-সংখ্যক কবিতাটি আঠারো মাত্রার ছন্দে লিখিত; গ্রন্থপরিচয়ে প্রদত্ত ইহার পাঠান্তরও নিয়মিত ছন্দব্যূহে

১ গ্রন্থপরিচয়, পত্রপুট, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২০শ খণ্ড

সজ্জিত। পাঠান্তরের নাম 'নির্বাক্'। আঠারো-সংখ্যক্ কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ :

কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিনরাতি,
এইবার থামো তুমি।

বিষয়টি অবচেতন মনের তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের আলোচনার যোগ্য।

শ্যামলী কাব্যে দ্বৈত কবিতাটির পাঠান্তর বর্তমান। মূলটির নীচে রচনার তারিখ ২৩শে মে, ১৯৩৬; পাঠান্তরের নীচে তারিখ ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ সাল। ২৩শে মে ৮ই বা ৯ই জ্যৈষ্ঠ হইয়া থাকে, খুব সম্ভব সে বৎসর একই দিন ছিল। বৃদ্ধ বয়সে একই দিনে একই কবিতার দুটি পাঠান্তর রচনা শিল্পাধ্যবসায়ের একটি দৃষ্টান্ত। দুটির মধ্যে পূর্ণতর রূপটি কেন চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, প্রথম কয়েক ছত্রের তুলনা করিলেই বোঝা যাইবে।

প্রথম দেখেছি তোমাকে,
বিশ্বরূপকারের ইঙ্গিতে,
তখন ছিলে তুমি আভাসে।
যেন দাঁড়িয়ে ছিলে বিধাতার মানসলোকের
সেই সীমানায়
সৃষ্টির আঙিনা যেখানে আরম্ভ।
যেমন অন্ধকারে ভোরের ব্যঞ্জনা
অরণ্যের অশ্রুতপ্রায় মর্মরে
আকাশের অস্পষ্টপ্রায় রোমাঞ্চে—
উষা যখন পায় নি আপন নাম,
যখন জানে নি আপনাকে। (পাঠান্তর)

সেদিন ছিলে তুমি আলো-আঁধারের মাঝখানটিতে,
বিধাতার মানসলোকের
মর্তসীমায় পা বাড়িয়ে
বিশ্বের রূপ-আঙিনার নাছ-দুয়ারে।

যেমন ভোরবেলার একটুখানি ইশারা,
শালবনের পাতার মধ্যে উস্‌খুস্‌,
শেষরাত্রের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া
আলোর আড়-চাহনি ;
উষা যখন আপন-ভোলা
যখন সে পায় নি আপন ডাকনামটি পাখীর ডাকে,
পাহাড়ের চূড়ায়, মেঘের লিখনপত্রে। (মূলপাঠ)

দুটি অংশ পড়িলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে,—একটিতে কবির কল্পনায় "উষা পায় নি আপন নাম, জানে নি আপনাকে"—আর-একটিতে সে সম্পূর্ণ না জাগিয়া উঠিলেও তাহার "গায়ে-কাঁটা-দেওয়া আলোর আড়চাহনি"—প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে।

আর একটু দেখা যাক্—

পৃথিবী তাকে সাজিয়ে তোলে
আপন সবুজ-সোনার কাঁচলি দিয়ে,
পরায় তাকে আপন হাওয়ার চুনরি। (মূলপাঠ)

পৃথিবী তাকে আপন রঙে রাঙিয়ে তোলে,
পরায় তাকে আপন হাওয়ার উত্তরীয়। (পাঠান্তর)

ভোরের অন্ধকারের মধ্যে রঙের আভা, বস্তুর রেখা যেমন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে, পাঠান্তর হইতে মূলপাঠে তেমনিতরো একটা বিবর্তন ঘটিয়াছে। পাঠান্তরে পৃথিবীর 'আপন রঙ'—মূলপাঠে হইয়াছে আপন 'সবুজ সোনার কাঁচলি'—রঙ ও বস্তু একত্র স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে ; আবার পাঠান্তরে 'হাওয়ার উত্তরীয়' মূলপাঠে হইয়াছে 'হাওয়ার চুনরি' ; উত্তরীয়ের চেয়ে 'চুনরি' বিশিষ্টতর ; রাত্রির অন্ধকারের নির্বিশেষে জগৎ ভোরের আলোয় ক্রমে ক্রমে বিশিষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। নির্বিশেষের বিশেষীকরণ ; ইহাই তো শিল্পসৃষ্টির লক্ষ্য।

পূর্বোক্ত কাব্যের 'অকাল ঘুম' কবিতাটিও পাঠান্তরসমন্বিত।[১] দ্বৈত কবিতায় যে বিবর্তনের উল্লেখ করিয়াছি এখানেও তাহার ধারা বেশ সুস্পষ্ট। দুটি অংশের তুলনা করা যাক—

ক্লান্ত দেহের করুণ মাধুরী
যেন সারারাত-জাগা পূর্ণিমার
সকালের চাঁদ। (পাঠান্তর)

ওর ক্লান্তদেহের করুণ মাধুরী মাটিতে মেলা,
যেন পূর্ণিমা-রাতের ঘুমহারানো অলস চাঁদ
সকালবেলায় শূন্য মাঠের শেষ সীমানায়। (মূলপাঠ)

দুই অংশেই মূল উপমা এক ও অভিন্ন কিন্তু তবু পাঠ দুটির মধ্যে প্রভেদ ঘটিয়াছে। পাঠান্তরে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে যোগটা অস্পষ্ট; বাঞ্ছিত সঙ্কেত, ইঙ্গিত ও সূত্রগুলি লাভ করিয়া মূলপাঠ কেমন পূর্ণতর, কাজেই কত সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে।

'কনি' কবিতায় মূল পাঠ ও পাঠান্তরের[১] মধ্যে মূল পাঠটিই শ্রেষ্ঠতর; কাহিনীর পূর্ণতরতাই তাহার একমাত্র কারণ। উভয় পাঠই গদ্য-ছন্দে লিখিত। এখানে গদ্য-ছন্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার মধ্যে যেগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ বা জনপ্রিয় তাহাদের অধিকাংশই হয় কাহিনীমূলক নয় কাহিনী-আভাসিত। কাজেই অনুমান করা অমূলক নয় যে, এই জনপ্রিয়তা কাহিনীর জন্য যেমন, গদ্য-ছন্দের জন্য তেমন নয়। ইহাতে কাহিনীর প্রতি পাঠকের চিরন্তন আকর্ষণেরই যেমন প্রমাণ হয়— গদ্য-ছন্দের উৎকর্ষের তেমন প্রমাণ হয় কি? আবার কোনো কোনো গদ্য-কবিতার প্রসিদ্ধির বা জনপ্রিয়তার কারণ রবীন্দ্রনাথের

গ্রন্থপরিচয়, শ্যামলী, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০শ খণ্ড

অসাধারণ কল্পনা-কুশল বাক্‌ভঙ্গী। দৃষ্টান্তস্থল 'পৃথিবীর' গদ্য-কবিতা। ইহাতেও গদ্য-ছন্দের উৎকর্ষের পরীক্ষা হইল না।

পয়ারের বা অমিত্রাক্ষরের যেমন নিজস্ব একটি রূপ ও শক্তি আছে, কাহিনী বা কল্পনাকুশলতার উপরে যেমন তাহা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়, কাহিনী বা কল্পনা তাহার ঐশ্বর্য বাড়াইতে পারে এই মাত্র, তেমনি গদ্য-ছন্দেরও একটি নিজস্ব ছান্দিক রূপ ও শক্তি থাকা সম্ভব। সাহিত্যে গদ্য-ছন্দ স্থায়ী কিংবা অতিথিমাত্র তাহা ঐ নিজস্বতার উপরেই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করিবে। কাহিনীর এঞ্জিন-সাহায্যে বা কাহিনী ও অলঙ্কারের ডবল -এঞ্জিন সাহায্যে তাহাকে চড়াইপথ অতিক্রম করানো যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে যে তাহার স্বকীয় রূপ ও প্রাণবত্তা আছে তাহা সব সময়ে প্রমাণ হয় না। গদ্য-ছন্দের এই পরীক্ষাটিই এখনো বাকি আছে।

মধুসূদনের হাতে অমিত্রাক্ষর অমিতশক্তিশালী। পরীক্ষা সেখানে নয়। সাধারণ কবির কলমের খোঁচাতেও অমিত্রাক্ষরের প্রাণ যদি টেঁকে, নিজস্ব রূপ যদি নষ্ট না হয়, তবে বুঝিতে হইবে অমিত্রাক্ষর বাংলা সাহিত্যে আর অস্থায়ী আগন্তুকমাত্র নয়, স্থায়ী বাসিন্দার অধিকার লাভ করিয়াছে। বিদেশ হইতে আগত অমিত্রাক্ষর, সনেট, ট্র্যাজেডি প্রভৃতি অনেক শিল্পরূপেরই সে মৌলিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সাধারণ লেখকের হাতে পড়িয়া তাহাদের যতই দুর্দশা হোক্ না কেন, মূল রূপের বিকার ঘটিবার আর আশঙ্কা নাই।

গদ্য-ছন্দের বেলায় সে পরীক্ষা হইয়াছে কি? তাহা স্বকীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত, না রবীন্দ্রনাথের বিভূতির ছায়ায় দণ্ডায়মান? যদি শেষের অনুমানটা সত্য হয়, তবে বলিতে হইবে যে, গদ্য-ছন্দ একটা স্বতন্ত্র শিল্পরূপ নয়, রবীন্দ্রনাথের অনেক style-এর মতো অনবদ্য এবং অননুকরণীয় একটা style মাত্র। এ প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় হয়তো এখনো আসে নাই, আরও কিছু সময় অতিবাহিত না

হইলে, বা সাধারণ লেখকগণের আরও কিছু স্থূল হস্তক্ষেপ সহ্য না করা অবধি হয়তো সে সময় আসিবে না। তাই বিষয়টার উত্তর দিতে বৃথা চেষ্টা করিলাম না—প্রশ্নরূপেই রাখিয়া দিলাম।

'সানাই' কাব্যগ্রন্থের 'কর্ণধার' কবিতাটি যে-সব ক্রমবিকাশ-মুখী বিভিন্ন পাঠের ধারা বাহিয়া চরম বলিয়া গৃহীত পাঠটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—তাহাদের সবগুলিকেই (সত্যই কি সবগুলি—না, আরও পাঠ রহিয়াছে ?) পাওয়া গিয়াছে। পাঠগুলি পর পর সাজাইলে কবির মনের বিবর্তনটি আমরা অনায়াসে ধরিতে পারিব। এই চেষ্টা যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি কৌতূহলজনক। সব পাঠগুলির আদ্যন্ত উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই, সে অবসর এখানে হইবে না, সামান্য সামান্য অংশ উদ্ধার করিলেই আমাদের কাজ চলিবে।[১]

সকালবেলায় পাইলাম—

হে তরুণী, তুমিই আমার
ছুটির কর্ণধার,
অলস হাওয়ায় বাইচো স্বপনতরী
নিয়ে যাবে কর্মনদীর পার ॥১॥

তার পরে বিকালবেলায় পাইতেছি—

কে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধার,
অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি
কর্মনদীর পার।
...
নীল নয়নের মৌনখানি
সেই সে দূরের আকাশবাণী
দিনগুলি মোর ওরি ডাকে
যায় ভেসে যায় বাঁকে বাঁকে
উদ্দেশহীন অকর্মণ্যতার ॥২॥

১ কর্ণধার, পৃঃ ৬৮-৭০ ; পূর্বপাঠ, পৃঃ ৪৭৬-৪৮০, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৪শ।

তার পরের দিন পাইতেছি—

ছুটির কর্ণধার,
দখিন হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি
কর্মনদীর পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী,
মন্থর দিন তারি ডাকে
যায় ভেসে যায় বাঁকে বাঁকে
ভাঁটার স্রোতে উদ্দেশহীন
কর্ম্মহীনতার
তুমি তখন ছুটির কর্ণধার—
শিরায় শিরায় বাজিয়ে তোল
নীরব ঝংকার ॥ ৩ ॥

এই তিনটি পাঠেরই রচনাকাল—২৩।৫।৩৯ এবং পরের দিন বলিতে ২৪।৫।৩৯ সাল।

এবারে কয়েক মাস পরের অর্থাৎ ১৪।১০।৩৯ সালের একটি পাঠে পাইতেছি—

ওগো কর্ণধার,
সৃষ্টি তোমার ভাসান খেলায়
লীলার পারাবার।
...
ছুটির খেলা খেলাও কর্ণধার,
ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার।
লীলার কর্ণধার,
জীবন নিয়ে মৃত্যুভাঁটায়
চলেছ কোন্ পার।

নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী,
গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার,
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্ত্রের ঝংকার ॥৪॥

ইহার কিছুদিন পরে অর্থাৎ ২৮শে জানুআরি, ১৯৪০ সালে লিখিত যে পাঠটি পাইতেছি তাহাই পূর্ণাঙ্গ পাঠ বলিয়া গৃহীত ও মুদ্রিত—

ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার,
দিকে দিকে ঢেউ জাগালো
লীলার পারাবার।

...

ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার।
ওগো আমার লীলার কর্ণধার,
জীবনতরী মৃত্যু-ভাঁটায়
কোথায় কর পার।
নীল আকাশের মৌনখানি
আনে দূরের দৈববাণী
গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার,
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্ত্রের ঝংকার ॥৪॥

সূচনা হইতে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি পাঠ পাইতেছি—সময়ের

হিসাবে মে মাসের তেইশে হইতে জানুআরি মাসের আটাশে, অর্থাৎ কয়েকদিন বেশি ছয় মাস। এই ছয় মাসকালে এই কবিতাটি সম্বন্ধে কবির মনে যে-সব ছায়াতপপাত ঘটিয়াছে, যে-আবর্তন-বিবর্তন ঘটিয়াছে তাহার অনেকগুলিরই চিহ্ন পাওয়া গেল। এ এক সৌভাগ্য—এমন সুযোগ সাধারণত ঘটে না।[১]

কবিতাটির বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, কেমন লীলাচ্ছলে, প্রায় পরিহাসচ্ছলে বলিলেও অন্যায় হবে না, কবিতাটির সূত্রপাত! "হে তরুণী, তুমি আমার ছুটির কর্ণধার।" ইহার ইঙ্গিত কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, এমন মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। গানটি রচনার পটভূমি পাঠ করিলে আমার অনুমান সমর্থিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

"আজ চমৎকার দিনটি হয়েছে। কেবল কুঁড়েমি করতে ইচ্ছে করছে, তাই এই চৌকিতে হেলান দিয়ে বসেই আছি, বসেই আছি। গান গেয়ে যেতে লাগলেন, 'হে তরুণী, তুমি আমার ছুটির কর্ণধার।' —আজ সমস্ত দিনটা যেন ছুটিতে-পাওয়া। কাজের দিন নয় এ, তাই বসে বসে গাইছি—'হে তরুণী তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার, অলস হাওয়ায় দিচ্ছ পাড়ি নিয়ে যাবে কর্মনদীর পার। হে তরুণী—"[২]

আমার বক্তব্য এই যে, অবসরবিনোদনের জন্য লীলাচ্ছলে, কতক-বা পরিহাসচ্ছলে ব্যক্তিবিশেষকে মনের সম্মুখে রাখিয়া অর্ধ-মনস্কভাবে যাহার সূত্রপাত, মনের মধ্যে বেগসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৌলিক তুচ্ছতা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, কবিতাটি নূতনতর অর্থ, গভীরতর বেদনা লাভ করিয়াছে। এমন হওয়া অসম্ভব নয়, বরঞ্চ অনেক সময়ে ইহাই স্বাভাবিক পরিণাম। যেমন পাহাড়ে

১ এই সুযোগ দানের জন্য 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' নামক উপাদেয় গ্রন্থের লেখিকার নিকটে পাঠক মাত্রেই অপরিসীম ঋণে আবদ্ধ। উক্ত গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশ পড়িয়া লইলে পাঠকগণ উপকৃত হইবেন।

২ গ্রন্থপরিচয়, সানাই, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২৪শ খণ্ড।

ঝরনা। ঝরনার সূত্রপাত যেমন তুচ্ছ যেমন আকস্মিক, যেন তাহা পাহাড়ী বালক-বালিকাদের নিতান্তই ব্যক্তিগত খেলনা বিশেষ। কিন্তু প্রবর্ধিতবেগ প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আগের চেহারা কি বদলিয়া যায় না? তখন তাহা গভীরতর, প্রশস্ততর, আর তাহাকে ব্যক্তিগত বা খেলনা মাত্র মনে হয় না।

এবারে বিবর্তনধারা লক্ষ্য করা যাক—

হে তরুণী, তুমিই আমার ছুটির কর্ণধার ॥১॥

পরবর্তী অবস্থায় পাইতেছি—

হে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধার

"তরুণী" আর প্রত্যক্ষত নাই, কিন্তু "অদৃশ্যভাবে" রহিয়াছে। "নীলনয়নের মৌনখানি" অদৃশ্য তরুণীর অস্তিত্ব-জ্ঞাপক।

তৃতীয় অবস্থায় শুধুমাত্র—

ছুটির কর্ণধার

এবারে তরুণী ছুটি পাইয়াছে, ঝরনা গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে, তরুণীর সঙ্গে তার নীল নয়নও অন্তর্হিত, তাহার স্থলে "নীল আকাশের মৌনখানি।" কবিতাটির অঙ্গ হইতে ব্যক্তি-বিশেষের চিহ্ন ঝরিয়া গিয়াছে, বিশেষ এবার নির্বিশেষ হইয়া উঠিবার মুখে।

চতুর্থ অবস্থায় কবিতাটি প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছিয়াছে—

ওগো কর্ণধার,
সৃষ্টি তোমার ভাসান খেলায়
লীলার পারাবার ॥৪॥

এবারে শুধু 'কর্ণধার'। মৌলিক প্রেরণার যে চিহ্নটুকু তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়া এতক্ষণ চলিয়া আসিতেছিল—'ছুটির কর্ণধার'—সেই 'ছুটি' আর এখন নাই। এই 'কর্ণধার' পূর্বোক্ত কর্ণধার নয়—তবু একটুখানি দ্বিধা আছে—সে যে কে কবি জানিলেও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।

পঞ্চম অবস্থায় বিগতদ্বিধা স্পষ্টতা—"ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার"—

ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার,
দিকে দিকে ঢেউ জাগালো
লীলার পারাবার ॥

এ "প্রাণের কর্ণধার" স্বয়ং ভগবান। কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ! ব্যক্তিবিশেষে যাহার সূত্রপাত নির্বিশেষে তাহার উপসংহার, তুচ্ছতায় আরম্ভ—মহাদ্যোতনায় শেষ, বিশেষ হইতে বিগতবিশেষে প্রগতি! ঝরনার মহানদীত্বপ্রাপ্তি এবং অবশেষে সমুদ্রে আত্ম-বিসর্জন। মাত্র বর্তমান ক্ষেত্রে নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রেরণার বিবর্তনের ইহাই সাধারণ নিয়ম। এমন-কি তাঁহার অত্যন্ত সাময়িক কবিতাগুলিও দু'চার ছত্র পরেই আপন উপলক্ষকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সে নিয়ম অতিশয় সক্রিয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যত আলোচনা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই তত্ত্বসংক্রান্ত। ইহার প্রয়োজন ও মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু ঐখানে থামিয়া থাকা উচিত নয়। এবারে তত্ত্বের স্তর হইতে বস্তুর স্তরে, ভাবের হইতে রসের স্তরে নামিয়া আসা আবশ্যক। তত্ত্ববিচারের মূল্য যতই হোক রসবিচারের চেয়ে বেশি নয়—আর শেষ পর্যন্ত তত্ত্ববিচারও রসবিচারের আনুষঙ্গিক ; কারণ সকলেরই উদ্দেশ্য রসোপলব্ধিতে সহায়তা। পাঠান্তর-বিচার রসবিচারেরই অঙ্গ। আমার সাধ্যানুসারে তাহার সূত্রপাত করিলাম। এবারে যোগ্যতর ব্যক্তিদের এ দিকে মনোনিবেশ করা কর্তব্য।

রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি প্রতীক

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও নাটকে সূর্যোদয় ও প্রভাত নবজীবনের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কবিতাতে প্রতীকরূপে প্রভাতের ব্যবহার এত স্পষ্ট ও প্রচুর যে তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন করে না। কিন্তু নাটকেও যে প্রভাত প্রতীকের মাহাত্ম্য পাইয়াছে এবং প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সকলের জানা না থাকিতেও পারে।

নাটকে প্রথম হইতেই প্রভাত প্রতীকী হইয়া ওঠে নাই—কিন্তু কবির জীবনবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের ব্যবহারে বৈশিষ্ট্য ঘটিয়াছে—এবং ক্রমে ক্রমে গভীরতর মহিমা লাভ করিয়াছে। প্রথমে অনেক পরিমাণে কবির অগোচরেই ·যেন সূর্যোদয় কবির নাটকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত অগোচরত্ব থাকে নাই; কবি ভাবিয়া-চিন্তিয়া সজ্ঞানে সূর্যোদয়ের দ্যুতিতে নবীন দ্যোতনা সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

নাটকের সংলাপ ও সঙ্গীতে সূর্যোদয়ের প্রতীক-রূপ প্রচুর আছে, কিন্তু সেগুলির উপরে জোর দিবার প্রয়োজন নাই; নাটকের ঘটনাসংস্থানে ও কালবিন্যাসের পতাকাস্থানে বারংবার প্রভাত আসিয়া পড়িয়াছে—এমনতরো প্রভাতের সংখ্যা এত বেশি, এবং তাহার উপরে কবি এমন ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছেন যে তাহা চোখে পড়িবেই—আর চোখে পড়িলেই মনে হয় ওগুলি কেবল নৈসর্গিক সূর্যোদয় নয়, নাটকের পাত্রপাত্রীর জীবনেরও কোনো মহত্তর আভাস ইহার মধ্যে যেন নিহিত আছে।

প্রভাতের আলো যেমন নূতনতর মহিমালাভ করিয়াছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারও নূতনতর অর্থ পাইয়াছে; এবং নৈসর্গিক আলো-অন্ধকারের ক্রমন্যাস ও লীলা কবির

মনোজগতের অনৈসর্গিক সত্তার প্রতীক হইয়া বারংবার প্রকট হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে দু'টি কথা মনে করিয়া রাখিতে হইবে। প্রথমত, গোড়া হইতেই কবি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না; দ্বিতীয়ত, প্রভাত ও রাত্রি, আলো ও কালো গোড়া হইতেই যে নৈসর্গিক ঘটনারূপে কবির কাব্যে স্থান লাভ করিয়াছে, এমন নয়; বিভিন্ন ঘটনা, মূর্তি ও বস্তুকে আশ্রয় করিয়া প্রথমে দেখা দিয়াছে; কিন্তু ঘটনা, মূর্তি, বস্তু যাহাই হোক না কেন—তাহাদের মধ্যে মনে রাখিবার মতো হইতেছে আলো ও কালো: আলো ও কালোতে নূতন মহিমার আরোপ।

প্রভাতসঙ্গীতের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের প্রভাতটি কবির জীবনের একটি যুগান্তকারী ঘটনা; কবির কল্পনাশক্তির সুপ্ত নির্ঝরিণী যেন ওই দিন জাগিয়া উঠিয়াছিল; ওই প্রভাতকালের অভিজ্ঞতাকে কবি বহুবার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ফলে ওই দিনটি কবির জীবনের ইতিহাসে অতিশয় গুরুত্ব লাভ করিয়াছে; এবং ওই দিন হইতেই নৈসর্গিক প্রভাতের সঙ্গে কবিজীবনের অনৈসর্গিক প্রভাতের যেন একটা অদৃশ্য নাড়ীর যোগ সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রভাত-আলোর প্রতীকী গুরুত্ব আরও আগে হইতে কবির রচনায় সুরু হইয়া গিয়াছে। প্রভাতসঙ্গীতের আগে বাল্মীকি-প্রতিভা রচিত; বাল্মীকি-প্রতিভাতে প্রভাত ও রাত্রির, আলো ও অন্ধকারের এমনভাবে ব্যবহার আছে যাহা কেবল নৈসর্গিক বা গতানুগতিক মাত্র নয়; তবে ইহা কবির অগোচরে ঘটিয়াছে, কিন্তু অগোচরে ঘটিয়াছে বলিয়াই যে কবিত্বের ইতিহাসে তাহার মূল্য কম এমন মনে করিবার কারণ নাই—বরঞ্চ অনেক সময়েই কাব্যব্যাপারে অগোচর প্রকাশের উচ্চতর মূল্য।

বাল্মীকি-প্রতিভার গল্পটি কি? বাল্মীকি কালীর উপাসক ছিল; একদিন সরস্বতী তাহাকে দেখা দিয়া গেলেন—সেই হইতে কালীর

প্রতি তাহার মন বিরূপ হইয়া গেল—সে বনে বনে উষাময়ী প্রতিমার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে অবশ্য রামায়ণের ক্রৌঞ্চবধের কাহিনী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রামায়ণের গল্পাংশ এই নাটকে গৌণ; মুখ্য হইতেছে দুই দেবীর মধ্যে বাল্মীকিকে লইয়া টানাটানি; একজন কালো আর একজনের স্থির-চপলার বর্ণ।

আদিকবি আদি শ্লোক উচ্চারণ করিবার পরেই বলিতেছে—

"একি! হৃদয়ে একি দেখি,

ঘোর অন্ধকার-মাঝে একি জ্যোতি ভায়"

এই যে জ্যোতি ইহা হৃদয়ের, বাহ্য নয়। তার পরে সরস্বতীর আবির্ভাব। অনৈসর্গিক জ্যোতির অনুরূপ এতক্ষণে সরস্বতীর মুখে দেখা গেল।

সরস্বতী অন্তর্ধান করিলে বাল্মীকি বলিতেছে—"সব আশা নিভিল, দশদিশি অন্ধকার।" লক্ষ্মী দেখা দিলেন; বাল্মীকির মনে রহিয়াছে সেই 'স্থির-চপলা,' সে বলিতেছে—"কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা।" সরস্বতী পুনরায় যখন দেখা দিলেন তখন বাল্মীকি বুঝিল—"উষা আনিলে প্রাণের আধারে।" এবং কালী-প্রতিমাকে শেষবারের জন্য ছাড়িয়া যাইবার সময়ে বাল্মীকি বলিতেছে—"কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন।"

কালী এবং সরস্বতী, কালো এবং আলো; রাত্রি এবং প্রভাত: যে আলো-কালোর লীলা কবির পরবর্তী কাব্য ও নাটকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—এইখানে তাহার সুরু, অগোচর ভাবে সুরু, অবান্তর ভাবে সুরু, অপরিণত ভাবে সুরু, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে সুরু।

বাল্মীকি-প্রতিভাকে কবির অপরিণত ও লঘু রচনা বলিয়া মনে করিবার ফলে রসিকসমাজের দৃষ্টি গভীরভাবে ইহাতে পড়ে নাই—কাজেই এ-সমস্তকে কষ্টকল্পনা মনে হইতে পারে। কিন্তু নাটকখানির

কোনো কোনো অংশ অত্যন্ত prophetic। নাটকের শেষে সরস্বতী বাল্মীকিকে উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছেন আদিকবির পক্ষে তাহা যেমন প্রযোজ্য—রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাহা তেমনি প্রযোজ্য। সরস্বতী সেদিন কিশোর রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আসীন হইয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কি ওই কথাগুলি বলিয়া যান নাই? ইহা যদি prophetic না হয়, তবে prophetic কাহাকে বলে জানি না।

বাল্মীকি-প্রতিভাতে কালো ও আলো এখনো রাত্রি ও প্রভাত হইয়া দাঁড়ায় নাই—কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাত্রি ও প্রভাতের প্রধান লক্ষণ তাহাতে রহিয়াছে। এখানে নাটকের আলোচনায় বসিয়াছি। কাজেই অপ্রাসঙ্গিক হইবার ভীতিসত্ত্বেও উল্লেখ করিতে হইতেছে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর। এই কাব্যেও আগের ভাবের অনুবর্তন রহিয়াছে। এই কাব্যের নায়ক—কৃষ্ণ। এখানে এ তর্ক তুলিলে চলিবে না যে, রবীন্দ্রনাথের বিষয়বস্তু নির্বাচনের স্বাধীনতা এখানে ছিল না, একটা নির্দিষ্ট ঐতিহ্যকে তিনি অনুসরণ করিতে-ছিলেন মাত্র। গোড়াতে অবশ্য একটা ঐতিহ্যকে অনুসরণের ভাব কবির মনে ছিল; কিন্তু ছোট কবির হাতে যেখানে tradition, tradition মাত্র রহিয়া যায়, মহাকবির কলম সেখানে tradition-কে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে; শ্যাম আর শ্যাম নাই; সে মৃত্যুর প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে, কিংবা মৃত্যুই শ্যামের প্রতীক হইয়া উঠিযাছে—

"মরণ রে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।"

নির্দিষ্ট ঐতিহ্য কোন্ পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। মহাকবির লেখনী অনির্দেশ্যের অভিমুখে অভিসার করিয়াছে।

এখন আমার বক্তব্য, এই কাব্যে কালো মৃত্যু কালো শ্যামের প্রতীক—এই কাব্যে, এবং কবির অল্প বয়সের অনেক কাব্যেই বটে। কিন্তু কবির জীবনবাদের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কালো

শ্যাম আর মৃত্যুর প্রতীক নয়, শুভ্র মহাদেব মৃত্যুর প্রতীক হইয়া পড়িয়াছেন।

"মরণ রে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।"

আর

"যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কত মতো ছিল আয়োজন,
ছিল কত শত উপকরণ।"

রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের মৃত্যুর প্রতীক আর কৃষ্ণ নয়, শুভ্রকান্তি মহাদেব; প্রতীক পরিবর্তনের মানেই, কবির মনে নিশ্চয় মৃত্যু সম্বন্ধেও ধারণার পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই মহাদেবের Idea হইতেই আরও পরে কবির মনে নটরাজের Idea মূর্তি লাভ করিয়াছে। কবির জীবনবাদের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে পৌরাণিক দেবতাদের Idea-র বিবর্তন ঘটিতেছিল, নূতন ধারণা প্রকাশের জন্য নূতন নূতন মূর্তি সন্ধান করিতেছিলেন—ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইলে কবিমনের অনেক রহস্য ধরা পড়িতে পারে।

তাহা হইলে ভানুসিংহের পদাবলীতেও প্রকারান্তরে সেই কালোকেই দেখিলাম, পরবর্তী কাব্যে যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কবি শুভ্র দেবতাকে আশ্রয় করিয়াছেন। মূলত সেই কালো এবং আলো।

দেবপ্রতিমাশ্রয়ী কালোর লীলা বিসর্জন নাটকেও আছে। বাল্মীকি-প্রতিভার মতো বিসর্জনের অধিদেবতাও কালী। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। বাল্মীকি-প্রতিভাতে কালীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর বিসর্জনে স্বয়ং কালীকে শেষ দৃশ্যে মন্দির পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। এখানে অবশ্য প্রত্যক্ষ আলোর কথা

নাই—কিন্তু আভাসত আছে। বিসর্জন নাটকের সমাপ্তি হইতেছে, শরতের প্রথম প্রত্যূষে; শরতের প্রথম প্রত্যূষটির উপরে জোর দিয়া কবি কি ইহাই বলিতে চান না যে, বর্ষাকালের দুর্যোগের মধ্যে যে-নাটকের সূত্রপাত, যাহার নাটকীয় পরিণাম ঝড়-বাদলের অন্ধকার রাত্রিতে [ধ্রুবকে হত্যার চেষ্টা ও জয়সিংহের আত্মনাশ চতুর্দশী ও অমাবস্যা তিথিতে], তাহার পরিণামে নির্মল আলোক-ধন্য 'শরতের প্রথম প্রত্যূষ।' এই রকম কোনো একটি Idea কবির মনে যে ছিল তাহা বুঝা যায় বিসর্জনের একটি সংস্করণে "তিমির দুয়ার খোলো" গানটি প্রারম্ভে জুড়িয়া দেওয়ায়। ঐ গানটিতেই যেন সমস্ত নাটকের ধুয়াটি ধ্বনিত। তিমির-দুয়ার খুলিয়া কবি দর্শকদের শরতের প্রথম প্রত্যূষে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এখানেও সেই কালো ও আলো; কালোটি দেবপ্রতিমাকে অবলম্বন করিয়া আছে বটে, কিন্তু আলোটি প্রভাতের আলো হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতিমাশ্রয়ী কালোর ক্রমবিকাশ দেখাইবার জন্য বিসর্জন পর্যন্ত আসিয়াছি, এবারে প্রভাতের ক্রমবিকাশ দেখিবার জন্য একটু ফিরিয়া যাইতে হইবে।

প্রকৃতির প্রতিশোধের উপান্ত-দৃশ্যটির কাল প্রভাত। পৃথিবীতে যেমন অরুণোদয় ঘটিয়াছে তেমনি আর একটি মহত্তর অরুণোদয় ঘটিয়াছে সন্ন্যাসীর জীবনে; এতদিনের সমস্যার সিদ্ধান্তে আজ সে পৌঁছিয়াছে; এতদিন সে জীবনকে কাট-ছাঁট করিয়া পাইবার দুরাশায় নিরন্তর শূন্যতার মধ্যে ছিল; আজ জীবনকে সমগ্রভাবে স্বীকার করার ফলে জীবনরসের স্বাদ লাভ করিয়াছে; তাহার মধ্যে এই যে চৈতন্যোদয় হইয়াছে, পার্থিব প্রভাতের দ্বারা কবি তাহাই বুঝাইতে চান। ইহার আগের দৃশ্যটির কাল ঝড়-বৃষ্টির রাত্রি; বিসর্জনের শেষদৃশ্যটির ঠিক অনুরূপ। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর এই প্রভাতের যে অভিজ্ঞতা, প্রভাত-

সঙ্গীতের কবিরও ঠিক অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ ঘটিয়াছিল; প্রভাত-সঙ্গীত ও প্রকৃতির প্রতিশোধের রচনার মধ্যে এক বছরের বেশি সময়ের ব্যবধান নয়। প্রভাত-সঙ্গীতের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেই কবি প্রকৃতির প্রতিশোধে ব্যবহার করিতেছিলেন।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ লিখিবার পরবর্তী যে অভিজ্ঞতা তাহার সঙ্গে সন্ন্যাসীর অভিজ্ঞতার কি ঐক্য!

"রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আরেক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত···। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা পালন করিতেছে, একটা গোরু আর-একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে···।"[১]

এসেছে সখা সখী, বসিয়া চোখাচোখী
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি।
এসেছে ভাইবোন্ পুলকে ভরা মন
ডাকিছে 'ভাই ভাই' আঁখিতে আঁখি তুলি।
সখারা এল ছুটে, নয়নে তারা ফুটে
পরানে কথা উঠে, বচন গেল ভুলি।
সখীরা হাতে হাতে ভ্রমিছে সাথে সাথে,
দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাদুলি।
শিশুরে ল'য়ে কোলে জননী এল চ'লে
বুকেতে চেপে ধ'রে বলিছে "ঘুমো, ঘুমো।"[২]
"উঠিয়াছে লোকজন প্রভাত হেরিয়া,
হাসিমুখে চলিয়াছে আপনার কাজে।
ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া।
ওই যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল,

---

১ জীবনস্মৃতি, প্রভাতসঙ্গীত।

২ প্রভাতসঙ্গীত, প্রভাত-উৎসব।

ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।
কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,
ছেলেরা ধূলায় ব'সে খেলা করিতেছে,
সখারা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা।"[১]

উপরিলিখিত তিনটি অংশে যা-কিছু প্রভেদ তাহা ভাষা ও ছন্দের মাত্র—বক্তব্য একই।

এই প্রভাতটি কেবল নৈসর্গিক ঘটনা মাত্র নয়—ইহাতে সন্ন্যাসীর জীবনের একটি ভাবান্তর সূচিত হইতেছে; সন্ন্যাসী যে নব-জীবন লাভ করিয়াছে, এই নব-প্রভাতটি তাহারই প্রতীক; এবং রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রতীক হিসাবে প্রভাতের ব্যবহার এই প্রথম।

চিত্রাঙ্গদা নাটকের অন্তিম দৃশ্যটির শেষরাত্রি নামকরণ করা হইয়াছে। চিত্রাঙ্গদা স্থির করিয়াছে দেবপ্রসাদে লব্ধ বর্ষভোগ্য রূপ পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনের কাছে আজ সে স্বরূপ প্রকাশ করিবে; তাহাতে অর্জুনের মন যদি বিরূপ হইয়া যায় সে-ও ভালো, কিন্তু এই ছদ্মবেশের অভিনয় আর সে সহ্য করিতে পারে না। ঠিক সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সে অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিয়া চিত্রাঙ্গদাদর্শনকাতর অর্জুনের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিল—"আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।" সূর্যোদয়ে যেমন রাত্রির মায়াচ্ছন্ন জগতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল, তেমনি ছদ্মরূপের অবগুণ্ঠন উন্মোচনেও চিত্রাঙ্গদার স্বরূপ উদ্ভাসিত হইল; বাহিরের প্রভাত এখানে চিত্রাঙ্গদার মোহভিন্ন সত্যাগ্রহের প্রতীক হইয়া পড়িয়াছে; ইহা আর অগোচর শিল্পকলা মাত্র নয়; শিল্পীর মনের মধ্যে যে প্রতীকী কবি কাজ আরম্ভ করিয়াছে তাহারই সচেতন প্রকাশ।

রাজা নাটকের শেষভাগে রাণী সুদর্শনা পিতৃগৃহ হইতে স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। এখন তাঁহার আর রাজ্ঞীত্বের অহঙ্কার

১ প্রকৃতির প্রতিশোধ, ১৪শ দৃশ্য, প্রভাত

নাই, রথ নাই, বাদ্য নাই—ধূলার পথে একাকিনী দীনের মতো চলিয়াছেন। এমন সময়ে সুরঙ্গমা বলিল—

"রাণী-মা, ঐ দেখ, পূর্বদিকে চেয়ে দেখ ভোর হ'য়ে আসছে। আর দেরি নেই মা, তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।"

এমন সময়ে ঠাকুর্দা প্রবেশ করিয়া বলিল—

"ভোর হ'ল দিদি, ভোর হ'ল।"

এই যে প্রভাত ইহাও রাণীর মধ্যে যে নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে তাহারই প্রতীক। যে-রাণী একদা অন্ধকার ঘরের ভারকে দুঃসহ মনে করিতেন, অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য কত অনর্থের না সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্ধকারের রাজাকে আলোকে দেখিবার জন্য কি মর্মান্তিক ভুল না করিয়াছেন, দুঃখের সুদীর্ঘ তপস্যায় ধৌত হইয়া আজ তাঁহার অন্ধকারের অবসান ঘটিয়াছে। ঠাকুর্দা যখন আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে—"কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই।" তখন সুদর্শনা বলিলেন—"বল কি! সমারোহ নেই? ঐ যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।"

এমন কথা সুদর্শনার মুখে নূতন। যে-সুদর্শনা ছদ্মবেশী সুবর্ণকে রাজা বলিয়া মনে করিয়াছিল সে এমন কথা বলিতে পারিত না। দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়া গেলে হৃদয়ে যে আলোক আবির্ভূত হয় সুদর্শনার হৃদয়ে আজ সেই আলোক; আর সেই আলোকই আজ প্রতিফলিত নৈসর্গিক প্রভাতের মধ্যে।

রাজা নাটকের শেষ দৃশ্যটি অন্ধকার ঘরে। কিন্তু প্রারম্ভের অন্ধকার ঘরের মতো এখানকার অন্ধকার আর রাণীর পক্ষে ভয়ঙ্কর নয়; তিনি দুঃখের দ্বারা অন্ধকারের রহস্য ভেদ করিয়াছেন। এ কথা রাজা বুঝিয়াছেন—তাই তিনি রাণীকে বলিলেন—"আজ এই

অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম, এখানকার লীলা শেষ হল। এস, এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে এস,—আলোয়।"

অচলায়তনের শেষ দৃশ্যে প্রভাতের কোনো উল্লেখ নাই। মাঝখানকার একটা দৃশ্যে প্রাচীর-ভাঙা আলোর আনন্দের উল্লেখ আছে বটে

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।

গানটিতে।

অচলায়তনের রূপান্তর 'গুরু' নাটকে এই ত্রুটি যেন সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই নাটকের গুরু আলোকের গুরু, তিনি নূতন জীবনের আলো সঙ্গে করিয়া প্রাচীর ভাঙিয়া অচলায়তনে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। অচলায়তনে আলোক-উৎসবের যে-দৃশ্যটি মাঝখানে ছিল গুরু-তে তাহাকে শেষে স্থাপন করা হইয়াছে, এবং এই আলোক যে নবজীবনের প্রতীক তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য অচলায়তনের "আলো, আমার আলো, ওগো আলো ভুবনভরা" অপেক্ষা গভীরতর অর্থদ্যোতক একটি সঙ্গীত ব্যবহৃত হইয়াছে—

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে—
...

ফাল্গুনীর গুহাদ্বারের শেষ দৃশ্য। যুবকগণ বিষণ্ণভাবে গুহাদ্বারে উপবিষ্ট; চন্দ্রহাস বুড়াকে ধরিবার জন্য গুহার অন্ধকারের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে আর বাউলটা আসন্ন অলক্ষণের মতো নিস্তব্ধ।

এমন সময়ে বাউল উঠিয়া দাঁড়াইল। যুবকগণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল—

"ওকে দেখলেই বুঝতে পারি কে আসছে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ ক'রে।"

"ঐ দেখ জোড় হাত ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছে।"

"পূবের দিকে মুখ ক'রে কা'কে প্রণাম করছে।"

"ওখানে তো কিচ্ছুই নেই—একটু আলোর রেখাও না।"

"আমার কি মনে হচ্ছে জানো? যেন ওর মধ্যে সকাল হয়েছে।"

"যেন ওর ভুরুর মাঝখানে অরুণের আলো খেয়ানৌকাটির মতো এসে ঠেকেছে।"

এমন সময়ে চন্দ্রহাস গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিল, যুবকদল জিজ্ঞাসা করিল সে বুড়াকে ধরিতে সমর্থ হইয়াছে কি না। চন্দ্রহাস জানাইল সে বুড়ার রহস্যভেদ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু বুড়া কই? এখনি সে আসিয়া পৌঁছিবে।

বহু-প্রতীক্ষিত, বহু-অনুসন্ধিত বুড়া যখন বাহির হইয়া আসিল তখন যুবকেরা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল সে তাহাদেরই জীবন সর্দার। এতক্ষণে বার্ধক্যের রহস্যভেদ হইল; প্রকৃতিতে যেমন শীতান্তে বসন্ত উজ্জ্বলতর হইয়া ফিরিয়া আসে, মানুষের জীবনেও তেমনি বার্ধক্যের শেষে যৌবন—কবি যাহাকে বলেন প্রৌঢ়ের যৌবন, নিরাসক্ত যৌবন—গভীরতর অর্থসূচক হইয়া পুনরায় দেখা দেয়। যেমনি এই রহস্যভেদ হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সূর্য উঠিয়া পড়িল।

চন্দ্রহাস সর্দারকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—"এ তো বড়ো আশ্চর্য। তুমি বারেবারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম।"

"ভাই চন্দ্রহাস, তোমারই হার হ'ল। বুড়োকে ধরতে পারলে না।"

চন্দ্রহাস—"আর দেরি না, এবার উৎসব সুরু হোক। সূর্য উঠেছে।"

চন্দ্রহাস যুবকদলের প্রিয়; সে প্রেম। যুবকদলের সর্দারের নাম জীবন সর্দার; তাহাকে বলা যাইতে পারে 'প্রিন্সিপল অব লাইফ'; আর কেহ পারিল না, চন্দ্রহাস গিয়া জীবন সর্দারকে

ধরিয়া আনিল ; একমাত্র প্রেমের দ্বারাই জীবনের রহস্য, বার্ধক্যের মধ্য হইতে যৌবনকে উদ্‌ঘাটিত করিবার রহস্য ভেদ করা সম্ভব।

ফাল্গুনী স্পষ্টত প্রতীকী নাটক ; একটানা প্রতীকের মধ্যে এই সূর্যোদয়টি আবার একটি প্রতীক।

এমন সময়ে চৌপদী-চালিত দাদা আসিয়া পড়িল। এমন যে দাদা তাহার চৌপদীতেও এই জীবনরহস্যভেদী প্রভাতের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—

সূর্য এল পূর্বদ্বারে তূর্য বাজে তার।
রাত্রি বলে, ব্যর্থ নহে এ মৃত্যু আমার।
এত বলি পদপ্রান্তে করে নমস্কার,
ভিক্ষাঝুলি স্বর্ণে ভরি গেল অন্ধকার॥

নটীর পূজার সূচনার কাল অতি-প্রত্যূষ—তখনো রাজপুরীর নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। ভিক্ষু উপালি রাজবাড়ির নটীর কাছে ভগবান্ বুদ্ধের নামে ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। নটী ভাবিল সে কী ভিক্ষা দিবে ? তাহার কি সে যোগ্যতা আছে ? কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধ যে নটীর কাছেই ভিক্ষা চান। উপালি নটীকে বলিল—"তোমার সেই দিন এসেছে, আমি তোমাকে জানিয়ে গেলুম তুমি ভাগ্যবতী।"

এমন সময় রাজকন্যারা ভিক্ষাদানের জন্য উপালিকে আহ্বান করিল, উপালি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। নন্দা বলিল—"আজকের দিন ব্যর্থ হ'ল।"

রাজকুমারীদের অন্য দিনের মতো আর-একটা দিন ব্যর্থ হইল, কিন্তু নটীর আজকার দিন চরমভাবে সার্থক। সূচনায় এই প্রভাত নটীজীবনের নব-প্রভাতকে সূচিত করিতেছে।

তপতীর প্রারম্ভ মীনকেতুর পূজায়োজনের সন্ধ্যায়—সমাপ্তি ধ্রুবতীর্থে মার্তণ্ড-মন্দিরে সূর্যোদয়কালে। 'রাজা ও রানী'র পরিসমাপ্তি ছিল পূর্ণিমার রাত্রে, কবির পরবর্তী জীবনের রূপান্তরিত

নাটক তপতী রাজা ও রানীর লৌকিক রীতি ত্যাগ করিয়া প্রতীকী রীতি অবলম্বন করিয়াছে।

রাজ্ঞী সুমিত্রার আত্মবিসর্জন কেবল যে একটি প্রভাতকালে তাহা নয়, স্বয়ং মার্তণ্ডেরই মন্দির-প্রাঙ্গণে চিতাশয্যায় রানী আত্ম-বিলোপ করিয়াছেন। সুমিত্রা বুঝিয়াছেন তাঁহার প্রতি যে-আসক্তির ফলে বিক্রম রাজধর্ম লোকধর্ম হইতে স্খলিত, আত্মনাশ ব্যতীত সে আসক্তি লোপ হইবার উপায় নাই। বিক্রমের আসক্তির মূল সুমিত্রার রূপ, মার্তণ্ডমন্দিরের চিতাগ্নিতে সেই রূপকে সুমিত্রা নিঃশেষে অপরূপের হাতে সমর্পণ করিয়া বিক্রমকে মোহপাশ হইতে ছিন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। এখানে আর প্রভাতমাত্র নয়; অন্যান্য নাটকে প্রভাত যে-স্থান অধিকার করিয়াছে, এখানে স্বয়ং প্রভাতপতি সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাকে রবীন্দ্রনাটকের প্রতীকী-প্রভাতের চরম দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুমিত্রা এই আশা বহন করিয়া গেল যে, এই প্রভাতটি বিক্রমের মনের আসক্তির নৈশমুগ্ধতার মরীচিকাপাশ ছিন্ন করিয়া দিয়া নব-জীবনের সূচনা করিয়া দিবে।

শিশুতীর্থ নামে নাটকোপম রচনাটিতেও একাধারে নবপ্রভাতের ও নবজন্মের কাহিনী।

"আদিকাল থেকে মানব-ইতিহাসের যাত্রা নবজন্মের তীর্থে। বুদ্ধ একদিন শিশুরূপে দেখা দিয়েছিলেন, এনেছিলেন নবজন্ম। মানুষ তাকিয়ে আছে শিশুর দিকে।"

"স্বর্গকে উদ্ধার করবে নূতন প্রাণ। নবজাত কুমার দেখা দেবেন অভয় বহন করে।"

শিশুতীর্থ রবীন্দ্রনাথের কুমারসম্ভব কাব্য।

ইতিহাসের উত্থানপতনের মধ্য দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী-আশা-পরিচালিত মানব যখন মাতার দ্বারে গিয়া পৌঁছিল, তখন অজানা সিন্ধুতীরের কবি গান করিল—

"তিমির-দুয়ার খোলো, এসো এসো নীরব চরণে,
জননী আমার দাঁড়াও এই নবীন অরুণ-কিরণে।"

তখন "দ্বার খুললো। মা ব'সে তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু —অন্ধকারের পরপার থেকে প্রকাশমান শুকতারার মতো।

"কবি গেয়ে উঠলো, জয় হোক মানুষের, জয় হোক নবজাতকের, জয় হোক চির-জীবিতের।

"যাত্রীরা প্রণাম করলে, দেশ-দেশান্তরের কণ্ঠে ধ্বনিত হোলো সেই জয়গান, যুগ-যুগান্তরে তা ব্যাপ্ত হোলো।"

"জয় হোক্, জয় হোক্ নব অরুণোদয়।"

পূর্ববর্তী নাটকের দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে বর্তমান দৃষ্টান্তটির প্রভেদ এই যে, আগেরগুলিতে ব্যক্তিগত জীবনের নবজন্মের সূচনা, আর ইহাতে মানুষেব সমষ্টিগত জীবনের নব-অভ্যুদয়ের প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক খণ্ডভাবে আলোচনা করিলে ভুল করিবার আশঙ্কা। কাব্য হোক, নাটক হোক, সমগ্রভাবে আলোচনা করিতে হইবে; আবার কাব্য নাটক গল্প একসঙ্গে বিধৃত করিয়া আলোচনা করিতে পারিলে সমধিক ফলপ্রসূ হইবে। যে-সমালোচক যত বেশি সমগ্রতাকে আয়ত্ত করিয়া আলোচনা করিবেন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের রহস্য তাঁহার কাছে তত বেশি ধরা পড়িবে।

তার পরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে স্থান ও কালের সংস্থানের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চিত্রাঙ্গদার সূচনা রাত্রে কেন, সমাপ্তি সূর্যোদয়ে কেন? সোনার তরী কাব্যের প্রথম কবিতার কাল প্রভাত কেন, সমাপ্তির কাল সন্ধ্যা কেন? বিশেষভাবে কাব্য ও নাটকের সময়সংস্থানের মধ্যে কবিপ্রতিভার অনেক রহস্য নিহিত আছে।

নাটকের মধ্যে প্রতীকী-প্রভাতের যে দৃষ্টান্তগুলি দিলাম তাহা ছাড়াও উদাহরণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে; কবিতায় এই জাতীয় দৃষ্টান্ত এত বেশি ও স্পষ্টার্থ যে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না।

কিন্তু কাব্য ও নাটক ছাড়াও আর-এক স্থানে এই প্রতীকের মূল আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। স্বয়ং কবির নামটির মধ্যে। নামটি অবশ্য কবির ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে নাই, কিন্তু পরিণত বয়সে কবি যখন ধীরে ধীরে নিজের জীবনবাদকে হৃদয়ঙ্গম করিতে ছিলেন, তখন নিজের নামের মধ্যে তাহার একটা প্রতীক যেন খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন; হয়তো ইহাকেও জীবনদেবতার একটা লীলা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সূর্যের লীলাতেই রাত্রি ও প্রভাত, আলো ও অন্ধকারের ক্রমন্যাস; সূর্যোদয়ের আলোতে জীবনের স্থিরতম প্রতীকের দর্শন। সেই সূর্য যে তাঁহার মিতা, এই ভাবটি তাঁহার কবিতায়, চিঠিপত্রে অজস্র স্থানে টুক্‌রা আকারে ছড়ানো আছে; সেগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে শিক্ষাপ্রদ একটি রচনা হইতে পারে। শেষজীবনের অনেক কবিতাতে 'রবি' এই শব্দটিকে দ্ব্যর্থভাবে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন,—এক অর্থে সূর্য, এক অর্থে স্বয়ং কবি। এই প্রবন্ধের এক স্থানে কবির মনে পৌরাণিক দেবমূর্তির ক্রমবিকাশের কথা বলিয়াছি; নূতন ভাবকে প্রকাশের জন্য কি করিয়া নূতন নূতন পৌরাণিক মূর্তিকে আশ্রয় করিতেছিলেন যাহার শেষ ধাপ বলিয়াছিলাম নটরাজের idea; তাহারও পরে আর-একটি ধাপ যেন আছে, নটরাজ-idea-র সঙ্গেই যাহা সমান্তরাল ভাবে চলিয়াছে, তাহাকে বলা যাইতে পারে সবিতৃ-দেব।

"নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত-মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।"[১]

১ ছেলেবেলা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৯৫

রবীন্দ্রকাব্যের কয়েকটি অনাদৃত কবিতা

রবীন্দ্রনাথের রসোত্তীর্ণ প্রথম শ্রেণীর কবিতার সংখ্যা এত অধিক যে, সেটাই একটা বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছে। এই ভিড়ের মধ্যে অনেক প্রথম শ্রেণীর কবিতা চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তীর্থযাত্রীদের পরস্পরের চাপে যেমন নিজেদেরই অনেকে মারা পড়ে। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে তুটি মনোরম দ্বীপ আছে—এক চয়নিকা, অপরটি সঞ্চয়িতা; কিন্তু এগুলিও এমন যথেষ্ট উদার নয় যাহাতে প্রথম শ্রেণীর যাবতীয় কবিতাগুলিকে স্থান দিতে পারে। একে তো সংসারে যোগ্যতমের উদ্বর্তন সব সময়ে হয় না, তার পরে আবার স্থানাভাব। এ ক্ষেত্রে যোগ্যতমের তুলনায় স্থান অল্প, এমন-কি সঞ্চয়িতার মতো সাড়ে আটশো পৃষ্ঠার বিশ্বম্বহ গ্রন্থও যথেষ্ট নয়। কিন্তু এমন কথাই বা কি করিয়া বলি যে, যাহারা স্থান পাইয়াছে তাহারা সকলেই প্রথম শ্রেণীর টিকিটধারী। দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটধারীও অনেক আছে, আবার কোনো কোনো কবিতাকে বিনা টিকিটের যাত্রী বলিয়াই মনে হয়। তবে স্বয়ং কবি স্থান দিয়াছেন, কাজেই বলিবার কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু এ বিষয়ে কবির চোখ যে অভ্রান্ত নয় তাহা কবিগুরু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

এই আলোচনায় আমার বিবাদ চয়নিকার সঙ্গে নয়, সঞ্চয়িতার সঙ্গে তো নয়ই। ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটি কবিতাকে আমার প্রথম শ্রেণীতে রসোত্তীর্ণ বলিয়া মনে হয়, সেগুলি চয়নিকা ও সঞ্চয়িতা তু'খানি সঙ্কলনগ্রন্থ হইতেই বাদ পড়িয়া গিয়াছে—ইহাই আমার ক্ষোভ। সেগুলি একেবারে অপরিচিত নয় তবে আরও সুপরিচিত হইলে খুশী হইতাম; তাহাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, যেহেতু এ ভালো-লাগা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, অপর কাহারো ভালো না লাগিলে আমার কিছু আপত্তি করিবার নাই। আর এই ব্যক্তিগত পছন্দের মূলে সব

সময়ে যে যথেষ্ট কারণ বা রসসমর্থন আছে এমন নয়; অনেক সময় হয়তো সংস্কার বা অভ্যাসটাই প্রবল, এমন-কি অনেক সময়ে সংস্কারের অজুহাতও নাই, সমস্তটাই অকারণ। তবে আশা করিতেছি যে অনেক পাঠকেরই অবস্থা আমার মতো এবং আলোচ্য কবিতাগুলির কোনো-কোনোটি সম্বন্ধে হয়তো তাঁহারা আমার অনুরূপ মত পোষণ করেন।

বর্তমান আলোচনার পরিধি মানসী হইতে বলাকা পর্যন্ত, বিষয় এই-সব কাব্যের কয়েকটি উপেক্ষিত কবিতা।

রবীন্দ্রকাব্য পড়িবার সময়ে কখনো কখনো এই-সব উপেক্ষিত কবিতা চিহ্নিত করিয়া রাখিতাম—এখন সেগুলির একটা হিসাব করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে মানসী কাব্যেই উপেক্ষিতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালির অধিকাংশ কবিতাই সুপরিচিত। কোনো-কোনোটার খ্যাতি শিল্পকৃতিত্বকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ সোনার তরী কবিতাটি গ্রহণ করিতে পারি। এই কবিতাটি লইয়া যত ব্যাখ্যা, প্রতিব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা হইয়াছে এমন বোধ করি রবীন্দ্রনাথের আর কোনো কবিতা লইয়া হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সময় হইতে সুরু হইয়াছে—এখনো নিবৃত্তি ঘটে নাই; এখন মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা চলিতেছে! চয়নিকার একটি সংস্করণ প্রণয়ন কালে রবীন্দ্রকবিতার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে 'গণভোট' গ্রহণ করা হইয়াছিল, আর তাহার ফলে সোনার তরী কবিতাটি সবচেয়ে বেশি-সংখ্যক ভোট পাইয়াছিল। কবিতাটির খ্যাতি তাহার শিল্প-কৃতিত্বকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমার মনে হয়, কবিতাটির খ্যাতির মূলে আছে সুললিত ছন্দ, সহজবোধ পল্লীবঙ্গের সুন্দর ছবি, আর কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্যতা। দুর্বোধ্যতা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি এই বোধ পাঠকের মনে এক প্রকার আত্মগরিমা জাগাইয়া দেয়—তাই অনেক সময়ে দেখা যায় যে, রসবোধে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠকেরা

দুর্বোধ্য কবিতার জয়গান করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও হয়তো তাহাই ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু এই থিওরির পক্ষে সবচেয়ে দুরূহ বাধা—কবিতাটি স্বয়ং কবিরও প্রিয়। কিন্তু কবির প্রিয় হইলেই যে কোনো কবিতা যথার্থ রসোত্তীর্ণ বা প্রথম শ্রেণীর হইবে এমন কথা নাই—স্বয়ং কবিই তাহা অন্য প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "কবিতা যে লেখে কবিতাগুলির অন্তরের ইতিহাস তার কাছে সুস্পষ্ট। বাহিরের প্রকাশে কবিতাগুলি উজ্জ্বল হয়েছে কি না হয়তো সেটা তার পক্ষে নিশ্চিত বোঝা কোনো কোনো স্থলে সহজ হয় না।" আমার বিশ্বাস সোনার তরী কবিতাটির কবিকৃত বিচার সম্বন্ধে এমনি বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। কবিতাটির রচনার "অন্তরের ইতিহাস" অর্থাৎ পদ্মাবাসের ঘনীভূত স্মৃতি কবিকে এমনি তন্ময় করিয়া রাখিয়াছে যে, "বাহিরের প্রকাশ" উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে কি না সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন হইতে পারেন নাই। যাই হোক, সোনার তরী কবিতাটি আমার আলোচ্য নয়, তবু যে আলোচনা করিলাম তাহার কারণ, এইরূপ অনেক অবাঞ্ছিত যাত্রী প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিবার ফলেই যথার্থ অধিকারীদের স্থানাভাব ঘটিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

২

মানসী কাব্যের 'উপহার' কবিতাটি কবির আশ্চর্য সৃষ্টি।

> এ চিরজীবন তাই
> আর কিছু কাজ নাই
> রচি শুধু অসীমের সীমা ;
> আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে
> তাহে ভালোবাসা দিয়ে
> গ'ড়ে তুলি মানসীপ্রতিমা।

অসীমের সীমা রচনা রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম। কথাটি গভীর, কেন না কবির জীবনতত্ত্বের সহিত জড়িত। কিন্তু কত অনায়াসে,

কত অবলীলাক্রমেই না তিনি কথাটি বলিয়াছেন। কলাকৌশলে আপনাকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করিয়া 'সত্যেরে লও সহজে' নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কড়ি ও কোমলের 'প্রাণ' কবিতাটিতে কবির জীবনতত্ত্বের এক দিক যেমন প্রকাশ পাইয়াছে,—ইহাতে তেমনি আর-এক দিক। আবার চয়নিকার কোনো কোনো সংস্করণে "ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে" কবিতাটি কবির সমগ্র কাব্যসাধনার সূত্ররূপে মুখ্য কবিতা হিসাবে ব্যবহৃত হইত। "উপহার" কবিতাটির উদ্ধৃত ছত্র কয়টিও অনুরূপ প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 'রচি শুধু অসীমের সীমা'—কবি সারা জীবন তো এই কাজই করিয়া গিয়াছেন।

মানসী কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে মানসী মানসেই আছে। কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হইবে। কোনো কোনো কবি মানবী প্রেমপাত্রীকে সাধনার দ্বারা, আরাধনার দ্বারা, বিশেষ প্রতিভার দ্বারা মানসীতে পরিণত করেন—উদাহরণ, রবার্ট ব্রাউনিং ও তাঁহার পত্নী; চণ্ডীদাস ও রামী। ইঁহারা স্বভাবত সসীমকে অসীমের ব্যঞ্জনা দানের কঠিন চেষ্টা করিয়াছেন। আবার কোনো কোনো কবি আছেন যাঁহারা মানসীকে মানবী প্রেমপাত্রীর মধ্যে আভাসিত করিয়া দেখেন—উদাহরণ, শেলি ও রবীন্দ্রনাথ। স্বভাবতই যাহা অসীম তাহাকে মানবিত করিয়া তুলিবার কঠিনতর চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন; 'রচি শুধু অসীমের সীমা।' সেইজন্যই শেলি ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় কেমন যেন ঘনিষ্ঠ মানব-সংস্পর্শের অভাব; আসক্তির তীব্রতার বদলে উদাসতা, প্রেমের চরিতার্থতার উল্লাসের বদলে নৈরাশ্য, হৃদয়স্পন্দন অনুভূতির বদলে বিষাদ ও করুণা—ইঁহাদের প্রেমের কবিতার ইহাই বিশেষ ধর্ম। এ সমস্তই তত্ত্বরূপে ঐ কয়টি ছত্রে ধরা পড়িয়াছে। তবে প্রভেদ এই যে, শুধু মানসী কাব্য নয়, সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধেই ছত্র কয়টি প্রযোজ্য।

ব্যাখ্যা করিয়া কবিতার তত্ত্ব বোঝানো যায় কিন্তু রসের তো ব্যাখ্যা চলে না। সূর্যাস্তের মেঘে যে আকাশকুসুম ফোটে বৈজ্ঞানিকের সাধ্য কি তাহার পরিচয় দেয়! আলোচ্য কবিতাগুলির তত্ত্বাংশ আলোচনা করিব, তাহাতে তাহাদের গুরুত্ব হয়তো বোঝা যাইবে, কিন্তু ইহাদের রসরহস্য বুঝিবার জন্য পাঠককে কষ্ট স্বীকার করিয়া কবিতাগুলি পড়িয়া লইতে হইবে।

মানসীর আর কয়েকটি উপেক্ষিত কবিতা—একাল ও সেকাল, আকাঙ্ক্ষা, মরণস্বপ্ন, কুহুধ্বনি ও সন্ধ্যায়।

তন্মধ্যে একাল ও সেকাল অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচিত এবং চয়নিকায় সন্নিবিষ্ট। কবিতাটি অধিকতর পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

হইতে

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা
সারা দিন, সারা বেলা,
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটীরে।

পর্যন্ত একটি আদর্শ বর্ষাকে একটি আদর্শ বিরহিণীর চিত্তবৃন্দাবনে স্থাপন করিয়া ন্যূনতম অথচ নিশ্চিততম রেখায় অঙ্কনের সার্থক প্রয়াস। কিন্তু কবিতাটি দোষশূন্য নয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে রসাভাস ঘটিয়াছে। বৃন্দাবনের বর্ষা ও রাধিকার চিত্রমধ্যে প্রক্ষিপ্তরূপে অলকা ও যক্ষবধূ আসিয়া পড়িয়াছে—ক্ষুদ্রকায় কবিতাটিতে বৈষ্ণব কবির রাধিকা ও কালিদাসের যক্ষিণীর স্থানাভাব। ঐ দুটি শ্লোক বাদ দিলে আপন ক্ষেত্রে ত্রুটিশূন্য হইয়া দাঁড়াইবে।*

* রবীন্দ্রসাহিত্যের কপি-রাইট পর্ব অতিক্রান্ত হইলে এরূপ বাদ-সাদ-দেওয়া সঙ্কলন-গ্রন্থ নিশ্চয় বাহির হইবে।

মানসী কাব্যে যে কয়েকটি কবিতায় লিরিক বেদনা অত্যন্ত সংহত ঘনীভূত রূপে প্রকাশ পাইয়াছে সেগুলি কাব্যাংশে রসোত্তীর্ণ ও শ্রেষ্ঠ—আকাঙ্ক্ষা, মরণস্বপ্ন ও কুহুধ্বনি তাহাদের অন্তর্গত। এগুলি কবির গাজিপুরে বাস কালে, কয়েকদিনের মধ্যে বৈশাখ মাসে রচিত। প্রবাসবাসের স্মৃতি ও প্রবাসের বেদনা কবিতাগুলির রস-রহস্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

আর্দ্র তীব্র পূর্ববায়ু বহিতেছে বেগে,
ঢেকেছে উদয়পথ ঘননীল মেঘে।
দূরে গঙ্গা, নৌকা নাই, বালু উড়ে যায়।
ব'সে ব'সে ভাবিতেছি—আজি কে কোথায়।

রবীন্দ্রকাব্যে যে নিসর্গচিত্র পাওয়া যায়, সাধারণত তাহা হয় মধ্যবঙ্গীয় নয় রাঢ়বঙ্গীয়। এ কবিতাগুলির নিসর্গচিত্র গাজিপুর অঞ্চলের, সেইজন্যই এগুলিতে রসের অভিনবত্ব আছে।

মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে,
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।
বচনে পড়িত নীল জলদের ছায়,
ধ্বনিতে ধ্বনিতে আর্দ্র উতরোল বায়।

কবি তাহাকে কাছে পাইলে জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা বলিতেন, তাঁহার প্রাণের অসীমে আত্মার যে মহারাজ্য বিরাজমান তাহাই দেখাইতেন।

কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে গেছ চ'লে,
কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা ব'লে।
কল্পনার সত্যরাজ্য দেখাই নি তারে,
বসাই নি এ নির্জন আত্মার আঁধারে।

ইহাই তাঁহার আক্ষেপ—আর, পুনরায় সুযোগ পাইলে কল্পনার সত্যরাজ্য ও আত্মার বিস্তার দেখাইবেন ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা।

মরণস্বপ্নে অঙ্কিত প্রবাসচিত্র আরও বিশদ—

কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ। প্রথম সন্ধ্যায়
ম্লান চাঁদ দেখা দিল গগনের কোণে।
ক্ষুদ্র নৌকা থর থরে চলিয়াছে পালভরে
কালস্রোতে যথা ভেসে যায়
অলস ভাবনাখানি আধোজাগা মনে।

একপারে ভাঙা তীর ফেলিয়াছে ছায়া;
অন্য পারে ঢালু তট শুভ্র বালুকায়
মিশে যায় চন্দ্রালোকে, ভেদ নাহি পড়ে চোখে—
বৈশাখের গঙ্গা কৃশকায়া
তীরতলে ধীরগতি অলস লীলায়।

এমন সময়ে

স্বদেশ পুরব হতে বায়ু ব'হে আসে
দূর স্বজনের যেন বিরহের শ্বাস।
জাগ্রত আঁখির আগে কখনো বা চাঁদ জাগে
কখনো বা প্রিয়মুখ ভাসে;
আধেক উলস প্রাণে আধেক উদাস।

এ হেন নিসর্গদৃশ্যে বসিয়া কবি মরণস্বপ্ন দেখিয়াছেন; জীবনে যাহা অলব্ধ রহিয়া গেল, মৃত্যুস্বপ্নে তাহাই উপলব্ধ সত্য হইল।

অন্ধকারহীন হয়ে গেল অন্ধকার।
'আমি' বলে কেহ নাই, তবু যেন আছে।
অচৈতন্যতলে অন্ধ চৈতন্য হইল বন্ধ,
রহিল প্রতীক্ষা করি' কার!
মৃত হয়ে প্রাণ যেন চিরকাল বাঁচে।

'কুহুধ্বনি' কবিতার নিসর্গচিত্র অধিকতর তথ্যপুঞ্জযোগে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

ছায়া মেলি সারি সারি
স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসু গাছ পাণ্ডুকিশলয়,
নিম্ববৃক্ষ ঘনশাখা
গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা,
আম্রবন আম্রফলময়।

...

বসি আঙিনার কোণে
গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি।
বাঁধা কূপ, তরুতল,
বালিকা তুলিছে জল,
খর তাপে ম্লান মুখখানি।
দূরে নদী, মাঝে চর,
বসিয়া মাচার 'পর
শস্যক্ষেত আগলিছে চাষী,
রাখালশিশুরা জুটে
নাচে গায়, খেলে ছুটে;
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।
কত কাজ কত খেলা,
কত মানবের মেলা,
সুখ দুঃখ ভাবনা অশেষ,
তারি মাঝে কুহুস্বর
একতান সকাতর
কোথা হ'তে লভিছে প্রবেশ।

কবি বলিতে চান যে, চলমান, নিত্য অপসৃয়মাণ নশ্বর জগতে একমাত্র সত্য "সঙ্গীতের সরস্বতী"র এই সম্মোহন বীণাধ্বনি।

কেহ ব'সে গৃহ-মাঝে,
কেহ বা চলেছে কাজে,
কেহ শোনে কেহ নাহি শোনে,
তবুও সে কী মায়ায়
ওই ধ্বনি থেকে যায়
বিশ্বব্যাপী মানবের মনে।

সংসার অনিত্য, ঐ কুহুধ্বনি নিত্য; সংসার খণ্ড-সৌন্দর্যে পূর্ণ, ঐ কুহুধ্বনি অখণ্ড সুন্দর; মানবজীবনের অতীত ও বর্তমান কুহুধ্বনির ঐ সূক্ষ্ম স্বর্ণময় সূত্রে গাঁথা পড়িয়া সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চলিয়াছে—ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমানের উহাই একমাত্র অবলম্বন, কবি ইহাই যেন বলিতে চান। কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল কবিতার মতোই ইহার মর্মবস্তু, যদিচ কাব্যাংশে এ দুয়ে তুলনা চলে না।

আর একটি রসোত্তীর্ণ উপেক্ষিত কবিতা—সন্ধ্যায়।

ওগো, তুমি অমনি সন্ধ্যার মতো হও।
সুদূর পশ্চিমাচলে
কনক-আকাশতলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও।
অমনি সুন্দর শান্ত
অমনি করুণ কান্ত
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওই মতো ধীরে ধীরে
আমার জীবনতীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী।

সন্ধ্যার করুণ সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রেমপাত্রীর সত্তা মিশিয়া গিয়া এক অপূর্ব স্মৃতিমধুর বেদনার সৃষ্টি করিয়াছে। এটিকে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠকবিতা পর্যায়ভুক্ত মনে না করিতে পারিলেও, আগের কয়েকটি কবিতাকে নিঃসন্দেহে সেই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া মনে হয়।

খেয়া কাব্যের কোকিল কবিতাটি অনাদৃত; এই সরল সুন্দর কবিতাটি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই, ইহার অতীত-মধুর সৌন্দর্য সম্বন্ধে বোধ করি অল্প পাঠকই সন্ধান রাখেন।

আজ বিকালে কোকিল ডাকে
শুনে মনে লাগে
বাংলা দেশে ছিলেম যেন
তিন শো বছর আগে।
সেদিনের সে স্নিগ্ধ গভীর
গ্রামপথের মায়া
আমার চোখে ফেলেছে আজ
অশ্রুজলের ছায়া।

অতঃপর সেদিনকার পল্লীবঙ্গের মুগ্ধ সৌন্দর্যের মনোরম চিত্র অঙ্কন করিয়া কবি বলিতেছেন—

তিন শো বছর কোথায় গেল,
তবু বুঝি নাকো
আজো কেন ওরে কোকিল,
তেমনি সুরেই ডাকো
ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে
ফেটেছে সেই ছাদ,
রূপকথা আজ কাহার মুখে
শুনবে সাঁঝের চাঁদ?

এমন সময়ে শহরের ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া কবি বুঝিতে পারিলেন—

সময় নাই রে হায়,
ঘর্ঘরিয়া চলেছি আজ
কিসের ব্যর্থতায়।

চমকিত কবি তিন শো বছর আগেকার স্মৃতির সোনায় বাঁধানো চিত্রপটের ধ্যান হইতে সহসা বর্তমান যুগে ফিরিয়া আসিলেন, যেমন চমকিয়া উঠিয়া কবি কীট্‌স্‌ নাইটিঙ্গেলের অমর সঙ্গীতের আসর হইতে আধিব্যাধিপীড়িত মানবসংসারে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—"the very word is like a bell to toll me back from thee to my sole self!"

কবিতাটির সরল সহজ শিল্প দেখিয়া মনে হয় একটি স্থানভ্রষ্ট কবিতা, ইহার স্বাভাবিক স্থান ক্ষণিকা কাব্যে। যে কাব্যেই ইহা সন্নিবিষ্ট হোক না কেন, রবীন্দ্রকাব্যের পুরোভাগে ইহার যথার্থ স্থান।

উৎসর্গ কাব্যের শুক্লসন্ধ্যা (২৩-সংখ্যক) ও 'ওরে আমার কর্মহারা' (৩৫-সংখ্যক) কবিতা দুটি রসিকের কাছে যথোচিত সমাদর পায় নাই, অথচ শিল্পমহিমায় কবিতা দুটি তুলনাহীন।

শুক্লসন্ধ্যা কবিতার প্রথম দুটি শ্লোক কিঞ্চিৎ দ্বিধাজড়িত, যদিচ দ্বিতীয় শ্লোকে দ্বিধার জড়তা অনেকটা অপসারিত। কিন্তু তৃতীয় শ্লোক হইতে শেষ পর্যন্ত কবিতাটি কবির কল্পনাস্রোতে অকুণ্ঠিত বেগে ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে দময়ন্তীর যে-রাজহংসের উল্লেখ কবিতাটিতে আছে তাহারই লীলামাধুর্যচ্ছন্দে।

হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মতো
কোন্‌ স্বর্গ হ'তে
চাঁদখানি লয়ে হেসে
শুক্লসন্ধ্যা এলো ভেসে
আঁধারের স্রোতে।

সেই শুক্লসন্ধ্যাই দময়ন্তীর নিকট নলকর্তৃক প্রেরিত রাজহংস।

রাজহংস এসেছিল কোন্ যুগান্তরে
শুনেছি পুরাণে।
দময়ন্তী আলবালে
স্বর্ণঘটে জল ঢালে
নিকুঞ্জবিতানে—

কবিই যে দময়ন্তী,—দয়িতের প্রেমের ঋণ স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই রাজহংসের মতো শুক্লসন্ধ্যাটি কবির কাছে আসিয়াছে—

জ্যোৎস্নাসন্ধ্যা তারি মতো আকাশ বাহিয়া
এলো মোর বুকে।
কোন্ দূর প্রবাসের
লিপিখানি আছে এর
ভাষাহীন মুখে।
সে যে কোন্ উৎসুকের
মিলন-কৌতুকে
এলো মোর বুকে।

শুক্লসন্ধ্যা সম্পর্কিত এরূপ বর্ণনায় ব্যঞ্জনায় সার্থক কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যেও বিরল।

৩৫-সংখ্যক কবিতায় সহসা যুগান্তরের সেতু খুলিয়া যাওয়ায় এমন সমস্ত আভাস ও স্মৃতির ইসারা পাওয়া যাইতেছে "এই জীবনে নাইকো তাহার হেতু।"

সেথায় মায়াদ্বীপের মাঝে
নিমন্ত্রণের বীণা বাজে,
ফেনিয়ে উঠে নীল সাগরের ঢেউ,

মর্মরিত-তমাল-ছায়ে
ভিজে চিকুর শুকায় বায়ে,
তাদের চেনে, চেনে না বা কেউ।

ছবিগুলি এমন সূক্ষ্মরেখায় অঙ্কিত যেন কোনো বাস্তব তুলিতে আঁকা হয় নাই, যেন কোন্ অনাদিকাল হইতে ঐ পটে অঙ্কিত হইয়াই ছিল, আজ দক্ষিণ বাতাসে বিস্মৃতির কুয়াসা একটু সরিয়া যাইতেই 'জননান্তরসৌহৃদানি'র মতো উপলব্ধি হইতেছে। সেই চিরপুরাতনকে নূতন পরিবেশে পাইবার ইচ্ছা জাগিতেছে—

ধারাযন্ত্রে সিনান করি'
যত্নে তুমি এসো পরি'
চাঁপাবরন লঘুবসনখানি।
ভালে আঁকো ফুলের রেখা
চন্দনেরি পত্রলেখা,
কোলের 'পরে সেতার লহো টানি।

সুন্দরী কবিতা সুন্দরী নারীর মতো, তাহার পিছু ছুটিলে সব সময়ে তাহার মন পাওয়া যায় না; বিশেষ, হাতে ব্যাখ্যার কলম থাকিলে তো কোনো আশাই থাকে না। ব্যাখ্যা করিয়া যাহার সৌন্দর্য বোঝানো সম্ভব নয়, উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতি রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম।

গীতিমাল্য কাব্যের অন্তর্গত ছয়টি কবিতা (৪, ৫, ৯, ১০, ১১, ১২-সংখ্যক) কাব্যাংশে রসোত্তম হওয়া সত্ত্বেও কেন-যে কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই তাহা ভাবিয়া পাই না। এগুলির অস্তিত্ব অপরের চোখে না পড়িতে পারে কিন্তু স্বয়ং কবিও যেন

ইহাদের অস্তিত্ব ও সার্থকতা সম্বন্ধে সচেতন নন, স্বনির্বাচিত সঞ্চয়িতাতে একটিকেও স্থান দেন নাই। তাঁহার মনের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সাধারণ পাঠকের অনবধানের হেতু কি? আমার মনে হয় গীতিমাল্যকে সকলে গানের বই বলিয়া মনে করে, আর গানের বইয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা যে সঞ্চিত হইবে তাহা কেহ খেয়াল করে নাই বা সন্দেহ করে নাই। ফলে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা সমাজভ্রষ্ট হওয়াতে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

গীতিমাল্যের প্রথম দুটি গান গীতাঞ্জলি পর্বের রচনা। তার পরের পঁচিশটি গান ও কবিতা ১৩১৮ সালের চৈত্র ও ১৩১৯ সালের বৈশাখ মাস মধ্যে রচিত। তার পরের ২৮-সংখ্যক হইতে ৪১-সংখ্যক পর্যন্ত বিলাতযাত্রার পথে, বিলাতে এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে রচিত। অবশিষ্টগুলির রচনা দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে। আমাদের আলোচ্য কবিতাগুলি ১৩১৮ সালের চৈত্র ও ১৩১৯ সালের বৈশাখ মাসে রচিত।

১৩১৮ সালের চৈত্র মাসে কবির বিলাতযাত্রার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে বিশ্রামলাভার্থে শিলাইদহে চলিয়া আসিতে হয়। সেখানে রোগমোক্ষের কালে কবিতাগুলি রচিত। এই বিবরণটুকু স্মরণ না রাখিলে কবিতাগুলির মাধুর্য ও তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারা যাইবে না। কবির ভাষাতেই সে বিবরণ শোনা যাক্।—

"গেল বারে যখন জাহাজে চড়বার দিনে মাথা-ঘুরে পড়লুম, বিদায় নেবার বিষম তাড়ায় যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল, তখন শিলাইদহে বিশ্রাম করতে গেলুম। কিন্তু মস্তিষ্ক ষোল-আনা সবল না থাকলে একেবারে বিশ্রাম করবার মতো জোর পাওয়া যায় না, তাই অগত্যা মনটাকে শান্ত রাখবার জন্যে একটা অনাবশ্যক কাজ হাতে নেওয়া

গেল।[১] তখন চৈত্র মাসে আমের বোলের গন্ধে আকাশে আর কোথাও ফাঁক ছিল না এবং পাখীর ডাকাডাকিতে দিনের বেলাকার সকল ক'টা প্রহর একেবারে মাতিয়ে রেখেছিল। ছোট ছেলে যখন তাজা থাকে তখন মার কথা ভুলেই থাকে, যখন কাহিল হয়ে পড়ে তখনি মায়ের কোলটি জুড়ে বসতে চায়, আমার সেই দশা হল। আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে আমার সমস্ত ছুটি দিয়ে চৈত্রমাসটিকে যেন জুড়ে বসলুম, তার আলো তার হাওয়া তার গন্ধ তার গান একটুও আমার কাছে বাদ পড়ল না।"

এক দিকে কবির অসুস্থ শরীর, অপর দিকে কবির পুরাতন ও প্রিয় পরিবেশে প্রকৃতির পূর্ণ শুশ্রূষা, এই দু'য়ে মিলিয়া কবিতাগুলির সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। শরীর সুস্থ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সবল থাকিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎটাই মানুষের মন অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়সমূহ যখন দুর্বল অথচ মনটি সক্রিয় তখন ইন্দ্রিয়াতীত সত্যোপলব্ধি সহজ হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। কবিতা কয়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সীমান্তবর্তী সত্য ও সৌন্দর্যকে সার্থকভাবে প্রকাশ করিয়াছে। এই শ্রেণীর কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল।[২] সাধারণত রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যকে অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত সত্যকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সরাসরি ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের উপলব্ধিপ্রচেষ্টা তাঁহার কবিধর্ম নয়। কিন্তু কখনো কখনো ঘটনাচক্রে এমন ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত রোগশয্যায় ও আরোগ্য কাব্য, অপর দৃষ্টান্ত আলোচ্য কবিতাগুলি। কিন্তু দু'য়ে প্রভেদ যে, পরবর্তী কালের কাব্য

১ "একটা অনাবশ্যক কাজ" বলিতে গীতাঞ্জলির গানগুলির ইংরেজী তর্জমা। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০।

২ পরবর্তী কালে রচিত রোগশয্যায় ও আরোগ্য কাব্যের অভিজ্ঞতা এই উপলক্ষে স্মরণীয়। দারুণ রোগের আঘাতে ইন্দ্রিয়গত চৈতন্য সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হওয়াতে কবির পক্ষে ইন্দ্রিয়াতীত সত্যোপলব্ধি সহজ হইয়া পড়িয়াছিল।

ছুইখানিতে সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়াতীত জগতের প্রসঙ্গ; আর গীতি-মাল্যের কবিতা কয়টিতে ইন্দ্রিয়জগৎ ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সীমান্ত-প্রদেশের প্রসঙ্গ। এই ভূমিকাটুকু করিয়া এবারে কবিতাগুলির আলোচনায় নামা যাক।

সব ক'টি কবিতাই যে সমান রসোত্তম এমন নয়, আমার বিবেচনায় ৪, ১০ ও ১১ -সংখ্যক কবিতা তিনটি অধিকতর সার্থক, এবং যে-কোনো মাপকাঠিতেই বিচার করা যাক-না-কেন এ তিনটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা পর্যায়ভুক্ত হইবার অধিকারী। কিন্তু কবিতা ছয়টির মধ্যে রসসার্থকতার তর-তম থাকিলেও সবগুলি একই অভিজ্ঞতার বাহন—আর সে অভিজ্ঞতা কী আগেই বলিয়াছি: ইন্দ্রিয়জগৎপ্রান্তে অথচ ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ আরম্ভ হইবার আগে যে সূক্ষ্মশরীরী, অনির্দেশ্য, অনির্দিষ্ট অলক্ষ্যপ্রায় জগৎ আছে তাহারই প্রসঙ্গ বর্ণন। এ জগৎ সকলের অভিজ্ঞতার বস্তু নয়, তাই ইহার বিবরণও সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হইতে পারে না, এমন-কি কবির পক্ষেও তাহা সদালভ্য ও অনায়াসবোধ্য নয়। বোধ করি মানব-ভাষায় সে জগতের অভিজ্ঞতাবর্ণন দুঃসাধ্য—অথচ কখনো কখনো ইন্দ্রিয়ের যবনিকা অপসারিত হইয়া গেলে সে দেশ কাহারো কাহারো চোখে পড়ে—তখন উপমা, ইঙ্গিত, আভাস ও নানারূপ সূক্ষ্মব্যঞ্জনার দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে হয়। তৎসত্ত্বেও কেহ যদি বলিয়া বসে 'বুঝিলাম না'—কবির নিরুত্তর থাকা ছাড়া উপায় নাই। কবির যেখানে এমন অসহায় অবস্থা, সমালোচকের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অথচ যখন দেখি যে, সাধারণ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত এই জগতের সত্যকে রবীন্দ্রনাথ কত সুন্দর রূপে, উজ্জ্বল রূপে, স্বভাবত-বিদেহীকে কান্তিময় দেহীরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তখন তাঁহার অত্যাশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্য স্মরণ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। দুই অ-সমভাবের জগতের উপরে শিল্পের এই দোলায়মান সেতু রচনা সত্যই শিল্পচাতুর্যের চরম।

কে গো তুমি বিদেশী।
সাপ-খেলানো বাঁশি তোমার
বাজালো সুর কি দেশী।

গোপন গুহার মাঝখানে যে
তোমার বাঁশি উঠছে বেজে
ধৈর্য নারি রাখিতে।

তাহার সাপ-খেলানো বাঁশির সুর ঊর্ধ্ব-অধঃ আকাশ-পাতাল সর্বত্র বিস্তারিত হইয়া গিয়া অবশেষে হৃদয়-গুহায় প্রবেশ করিয়াছে। তখন

কত কালের আঁধার ছেড়ে
বাহির হ'য়ে এল যে রে
হৃদয়গুহার নাগিনী,
নত মাথায় লুটিয়ে আছে,
ডাকো তারে পায়ের কাছে
বাজিয়ে তোমার রাগিণী।
তোমার এই আনন্দ-নাচে
আছে গো ঠাঁই তারো আছে,
লও গো তারে ভুলায়ে;
কালোতে তার পড়বে আলো,
তারো শোভা লাগবে ভালো,
নাচবে ফণা দুলায়ে।
মিলবে সে আজ ঢেউয়ের সনে,
মিলবে দখিন সমীরণে
মিলবে আলোয় আকাশে।
তোমার বাঁশির বশ মেনেছে,

বিশ্বনাচের রস জেনেছে,
রবে না আর ঢাকা সে।

হৃদয়-গুহায় যে কালো নাগিনীগুলা বিষাক্ত, বীভৎস, সর্বনাশ-সাধনতৎপর, বাঁশির বশ মানিলে তাহারাও যে সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে, বিশ্বনাচের রস জানিয়া তাহারাও যে আনন্দময় বিশ্বনৃত্যে যোগ দিতে পারে, তাহারাও যে প্রকৃতির সৌন্দর্যের অঙ্গীভূত হইতে পারে, নিতান্ত অবাঞ্ছিতেরও যে একটা স্পৃহণীয় স্থান বিশ্বতন্ত্রে সম্ভব, সে কথা এমন সুন্দরভাবে আর কোথায় প্রকাশ পাইয়াছে? মনের যে-সব প্রবৃত্তি সাপের মতো ভয়ঙ্কর, "তোমার বাঁশির বশ" মানিলে তাহারাও সুন্দর ও আনন্দময় হইয়া উঠিয়া বিশ্বতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করিতে পারে—ইহাই কবির অভিজ্ঞতা।

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
যাত্রা তোমার সে কোন্ দেশে,
এ পথ গেছে কোন্‌খানে?"
"কে জানে ভাই, কে জানে।
চন্দ্র সূর্য গ্রহতারার
আলোক দিয়ে প্রাচীর-ঘেরা
আছে সে এক নিকুঞ্জবন নিভৃতে,
চরাচরের হিয়ার কাছে
তারি গোপন দুয়ার আছে
সেইখানে ভাই, করবো গমন নিশীথে।"

সেখানটিকেই আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সীমান্তপ্রদেশ বলিয়াছি।

"সেথা মেঘের কোণে কোণে
কেবল দেখি ক্ষণে ক্ষণে
একটি নাচে আনন্দময় বিজুরি।"

সে জগৎ সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জগৎ হইলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চন্দ্রসূর্যের আলোতেই ভাস্বর হইতে পারিত, আবার ইন্দ্রিয়জগৎ হইলে "অলোক আলোকে" প্রভাময় হইতে পারিত; কিন্তু যেহেতু সে জগৎ স্বভাবতই অনির্দেশ্য ও অনির্দিষ্ট, চঞ্চলতাই তাহার ধর্ম, তাই সেখানকার আলোকও চপল, চঞ্চল; সেখানে "একটি নাচে আনন্দময় বিজুরি।"

এই কবিতা কয়টিও "আনন্দময় বিজুরি"-র মতো "ক্ষণিক প্রভা হানে"; যখনি অর্থ পাইলাম মনে করিয়াছি, অমনি "নিবিড়তর তিমির চোখে আনে"—দেখিতে পাই যে কিছুই বুঝি নাই; অর্থের এই লুকোচুরিতেই, রসের এই রহস্যেই কবিতাগুলির বিশেষ মাধুর্য। এ রূপের জগৎও নয় অরূপের জগৎও নয়, এ এমন এক জগৎ যেখানে রূপের সঙ্গে অরূপের নিরন্তর লুকোচুরি খেলাতে দুয়ের লীলাটি বড় মধুর হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে।

স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি
মনের মধ্যে অনেক দূরে।
ঘোরাফেরা যায় যে ঘুরে।
গভীরধারা জলের ধারে,
আঁধার-করা বনের পারে,
সন্ধ্যামেঘে সোনার চূড়া
উঠেছে ঐ বিজনপুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে॥

পশ্চিমে ঐ সৌধছাদে
স্বপ্ন লাগে ভগ্ন চাঁদে,
একলা কে যে বাজায় বাঁশি

বেদনভরা বেহাগ সুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে ॥

এ-ও সেই দুই জগতের সীমান্তপ্রদেশ, মনের মধ্যেই বটে তবে অনেক দূরে, কেননা মনের conscious অংশ মনের পুরোভাগে আর sub-conscious অংশ "মনের মাঝে অনেক দূরে।" এই কারণেই সমস্ত কবিতাটির ধুয়া ঐ ছত্রটির, "মনের মাঝে অনেক দূরে।"

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলে নি কেউ আমাকে।
শুধু কেবল ফু'লের বাসে
মনে হ'ত খবর আসে
উঠতো হিয়া চমকে।

এ রাজ্যও সেই পূর্বকথিত দেশ। সবাই এখানে অনিশ্চিত ও অনির্দেশ্য, সবাই জানা-না-জানার প্রান্তে কাঁপিতেছে—

সেদিন আমার লাগে মনে
আছ যেন কাছের কোণে
একটুখানি আড়ালে,
জানি যেন সকল জানি,
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে ॥

কিন্তু পুরো ধরিবার উপায় নাই, কেননা এখানে কিছুই স্থির নয়, খাস জগৎটাই অস্থির, এখানে "একটি নাচে আনন্দময় বিজুরি"—এখানকার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহ আনন্দময়, কিন্তু আবার বিদ্যুতের মতোই চঞ্চল। ইহা যোগীজনলভ্য নিত্যজ্যোতিও নয়,

আবার ভোগীর নিত্য-অন্ধকারও নয়; ইহা বিশেষভাবে কবির জগৎ, নিত্যের অনিত্য অনুভূতির জগৎ, কারণ কবির স্থান ভোগী ও যোগীর মাঝখানে, কবি অনিত্যের ভেলায় নিত্যের যাত্রী, সেইজন্য দুই অভিজ্ঞতাই তাঁহার আয়ত্ত। এ কয়টি কবিতায় সেই অভিজ্ঞতারই একটি সুষ্ঠু সার্থক শিল্পসুন্দর প্রকাশ।

৬

বলাকা কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই অল্পবিস্তর পরিচিত, কেবল ২৫-সংখ্যক কবিতাটি যত পরিচিত ও সমাদৃত হওয়া আবশ্যক তত হয় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। চয়নিকা ও সঞ্চয়িতা ইহাকে শ্রেষ্ঠ কবিতার সম্মান দেয় নাই, পাঠকের মুখেও ইহার খ্যাতি শুনিতে পাই না। ইহার একমাত্র কারণ মনে হয় এই যে, কবিতাটি ক্ষুদ্র। কিন্তু কবিতার পরিসরের স্বল্পতা দোষ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। বস্তুত এমন নিশ্ছিদ্র, সর্বপ্রকার দোষত্রুটিহীন অথচ শিল্পগুণে অনবদ্য কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যে অধিক নাই। ইহার সুঠাম একশ্লোক গঠন সনেট না হইয়াও সনেটের ধর্মসমন্বিত। কিন্তু সাধারণত পাঠক কবিতার অন্যান্য গুণের সঙ্গে তাহার পরিসরের স্ফীতি চায়—এখানে তাহার অভাবই কবিতাটিকে উপেক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে।

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
ল'য়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে,
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে;
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে;
অনিমেষে

নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তরে ;
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

ইহা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের বসন্ত। ব্যক্তিগত জীবনের যৌবনাবসানের সঙ্গে এ বসন্তের যৌবনও অবসিত ; বিগতবিহ্বলতা ব্যক্তিগত জীবনের মতো এ বসন্তও অবিহ্বল। রবীন্দ্রনাথ প্রৌঢ়ের যৌবনের কথা বলিয়াছেন—এ বসন্ত প্রৌঢ়ের বসন্ত। ইহা কণ্ব-আশ্রমের শকুন্তলা নয়, মারীচ-আশ্রমের দুঃখব্রতচারিণী শকুন্তলা ; সে আর হাবভাব-লীলালাস্যময়ী নয় ; তাই বলিয়া কম সুন্দর নয় ; বাহিরের সৌন্দর্য কতক অপসারিত বলিয়াই অন্তরের সৌন্দর্য আত্মার দুই কূল ছাপাইয়া যেন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অযুত বৎসর আগে যে-বসন্ত একদিন মানবসমাজে উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল, অযুত বৎসর পরে তাহা আজও তেমনি উন্মাদনাময় আছে, কারণ অযুত বৎসর পরে মানবসমাজ আজও নবীন। এ বসন্ত নির্বিশেষ মানবসমাজের নির্বিশেষ বসন্ত।

কিন্তু বর্তমান কবিতাটিতে ব্যক্তিবিশেষের বসন্তের কথা বলা হইয়াছে, ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তনের সঙ্গে এই বসন্তেরও স্বরূপ পরিবর্তিত। প্রৌঢ়ের যে-যৌবন "মরণের সিংহদ্বার" পারে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, এ বসন্ত তাহারই পূর্বাভাস বহন করিতেছে ; কবির ভরসা আছে একদিন ইহারই হাত ধরিয়া তিনি "মরণের সিংহদ্বার" অতিক্রম করিয়া সেই প্রতীক্ষমান যৌবনের আসরে গিয়া উপস্থিত হইবেন এবং তাহার কণ্ঠ হইতে মন্দারের মালা লইয়া নিজ কণ্ঠে পরিতে পারিবেন। কিন্তু এখনো তাহার বিলম্ব আছে —আজ তিনি এবং তাঁহার বসন্ত দু'জনেই নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন—

চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

এমন করুণাসুন্দর কবিতাটির উপেক্ষায় দুঃখ না হইয়া যায় না।

পুঁথি বাড়িয়া যাইবার ভয়ে এ আলোচনার এখানেই শেষ করিতে হইল। এখন ইহার সূত্রে পাঠক-সমাজের দৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যের উপেক্ষিতাগণের দিকে পড়িলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। পাঠক-সমাজও রবীন্দ্রকাব্যে নূতন সৌন্দর্যের সন্ধান পাইবেন।

এক সময় রবীন্দ্রনাথের কাব্য দুরূহ বলিয়া পরিগণিত হইত। ও-বস্তু বোঝা যায় না বলিয়া লোকে সংক্ষেপে দায়িত্ব শেষ করিত। তখনকার দিনে, আজ থেকে ৫০।৬০ বছর আগেকার কথা বলিতেছি, রবীন্দ্রকাব্যের বৃহৎ পাঠক-গোষ্ঠী ছিল না। দুরূহ কাব্য পড়িয়া 'না বোঝার আনন্দ' পাইবে এমন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি সংসারে বিরল। মুষ্টিমেয় অনুরাগী পাঠক রবীন্দ্রনাথের চিরকাল ছিল। রবীন্দ্রকাব্যপাঠের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক generation-এ রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত চক্ষুষ্মান অনুরাগী পাঠক পাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ধ্যাসঙ্গীতের প্রশংসায় যদি এই ধারার সূত্রপাত ধরা যায় তবে পর পর অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, প্রিয়নাথ সেন, লোকেন পালিত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, প্রমথ চৌধুরী এবং সত্যেন্দ্র দত্ত, চারু বাঁড়ুজ্জে, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি ভারতী পত্রিকা-গোষ্ঠীর নাম করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রেরও আগে আছেন ত্রিপুরার গুণগ্রাহী মহারাজা রাধাকিশোর দেব মাণিক্য বাহাদুর। ভারতী-গোষ্ঠী বোধ করি প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে রবীন্দ্রকাব্য প্রচারের ও বোধগম্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। ইঁহাদেরই চেষ্টায় রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম সংকলন চয়নিকা প্রকাশিত হইল। যাঁহাদের নাম করিলাম সকলেই অল্পবিস্তর প্রতিভাবান ব্যক্তি আর ইঁহাদের সাকুল্য জীবনকাল হিসাব করিলে দেখা যাইবে রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই তাঁহার কাব্যের অনুরাগী পাঠকের জন্ম হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও সংখ্যায় ইঁহারা মুষ্টিমেয়, বৃহৎ পাঠকসম্প্রদায় রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিল, বড়জোর তাহাদের মনোভাবকে একপ্রকার কৌতূহল বলা যাইতে পারে। ভারতী-গোষ্ঠী কেবল নিজেরা

বুঝিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেন না, রবীন্দ্রকাব্য বুঝাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ' নামে পুস্তিকা বোধ করি প্রথম ধারাবাহিক আলোচনা রবীন্দ্রকাব্যের। উহা ১৯১১ সালের কথা। তার পরে বছর-তুয়ের মধ্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁহার কাব্য সাধারণের মনোযোগের ক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইল। কিন্তু তাই বলিয়া স্বীকার করা যায় না যে তখন রবীন্দ্রকাব্যের 'তুরূহতা' সরল হইয়া গিয়াছে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে রবীন্দ্রকাব্যপাঠ ফ্যাশানে পরিণত হইল। ফ্যাশানের খাতিরে মানুষে অনেক কিছু করিতে পারে—এমন-কি তুরূহ কাব্যকেও কণ্ঠে বহন করিতে বাধা হয় না। কিন্তু তার পরেও চল্লিশ বছরের বেশি সময় গিয়াছে। ইতিমধ্যে নানা কারণে রবীন্দ্রকাব্য সত্য সত্যই সুবোধ্য হইয়া আসিয়াছে সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে।

প্রত্যেক মহাকবি একটি নূতন আলঙ্কারিক সংস্কার সৃষ্টি করেন। প্রথমে এই নূতনত্বই তাঁহার কাব্যের রসবোধের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। কালক্রমে 'নূতন' পুরাতন হইয়া পড়িয়া পাঠকের মানসিক সঙ্গতির সঙ্গে খাপ খাইয়া যায়। তার পরে অনুকারকগণ কলমের সাহায্যে নূতন কাব্যের ভাষ্য তৈয়ারি করিতে থাকেন। তাঁহাদের অনুকৃতির মূল্য অকিঞ্চিৎকর হইলেও নূতন কাব্যের ধাঁচের সঙ্গে পাঠকের পরিচয়-সাধনের কাজটা তাঁহারা করিয়া থাকেন। ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। তার পরে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে প্রবেশ পরিচয়-সাধনের দিকে আর একটা প্রকাণ্ড ধাপ। বাল্যকাল হইতে নূতন কাব্যের ভাষা ছন্দ, মেজাজ প্রভৃতিতে আপনার অগোচরে অভ্যস্ত হইয়া ওঠে পরবর্তী প্রজন্মের পাঠক সম্প্রদায়। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী যখন নূতন কাব্যকে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন, তখন ষাট হাজার সগর-সন্তানের মতো অধ্যাপক ও অর্থপুস্তক প্রণেতাগণ সদলবলে কাব্যের উপরে আসিয়া পড়িয়া তুলাধুনা করিয়া তাহা দেশময় ছড়াইয়া দেয়,

শুধু ছাত্রদের নয় নিরীহ পথিকের নাকে চোখে মুখে তুলার অদৃশ্য আঁশ ঢুকিয়া পড়ে। আর সবশেষে দেখা দেন টীকা, ও ভাষ্য-রচয়িতাগণ। ইঁহারা নিজেদের অর্থপুস্তক রচয়িতার চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর মনে করেন। সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া ইঁহারা সমালোচনা-সাহিত্য সৃষ্টি করেন। এই-সব প্রক্রিয়ার ফলে কালক্রমে দুরূহ নূতন কাব্য সরল হইয়া আসে। এখন রবীন্দ্রকাব্য-আলোচনার ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে তাঁহার কাব্যের ভাগ্যেও এই-সমস্ত প্রক্রিয়া ফলিয়াছে। সকলেই যে সু-বিচার করিয়াছেন রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি এমন বলি না কিন্তু এই-সব ভালমন্দ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক যৌথ চেষ্টার ফলে দুই প্রজন্ম কাল মধ্যে রবীন্দ্রকাব্য বাঙালী পাঠকের ধাতস্থ হইয়া গিয়াছে। আজ আর কোনো বুদ্ধিমান বাঙালী পাঠক রবীন্দ্রকাব্য দুরূহ বলিয়া স্বীকার করেন না, বরঞ্চ এখন উল্টা অভিযোগ উঠিতে সুরু করিয়াছে রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে। রবীন্দ্রকাব্য যথেষ্ট দুরূহ নয়, বুদ্ধি খেলাইবার যথেষ্ট প্রশস্ত স্থান নাই রবীন্দ্রকাব্যে, রবীন্দ্রকাব্যের অভিজ্ঞতার পরিধি বড় সঙ্কীর্ণ, Intensity নামক গুণ রবীন্দ্রকাব্যে বিরল ইত্যাকার নানারকম অভিযোগ একদল পাঠক করিয়া থাকেন আজকাল। দুরূহতা, অভিজ্ঞতাবৈচিত্র্য ও Intensity-র সন্ধানে তাঁহারা এখন কাব্যের বড় বাজারে যাতায়াত সুরু করিয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ খুব বেশি হাঁটাহাটি তাঁহাদের করিতে হইবে না। জোড়াসাঁকো ও বড়বাজার কাছাকাছি। কাব্যবিশারদ, সমাজপতি ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রচলিত রবীন্দ্রকাব্য-আলোচনাচক্র পূর্ণ আবর্তিত হইয়া আবার সেই পুরাতন জায়গায় ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রভেদের মধ্যে এই যে সেকালে রবীন্দ্রকাব্যে 'দুরূহতা' নিন্দনীয় ছিল, একালে নিন্দনীয় 'সরলতা'; আর প্রভেদের মধ্যে সেকালে মুষ্টিমেয় অনুরাগী পাঠক রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিয়াছিল, বৃহৎ পাঠকসমাজ ছিল উদাসীন। একালে বৃহৎ পাঠক-সমাজ রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিয়াছে, মুষ্টিমেয় "চক্ষুষ্মান" পাঠক

রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে উদাসীনতার ভান করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। চক্রাবর্তন আর কাহাকে বলে!

রবীন্দ্রকাব্য পাঠে ও রবীন্দ্রকাব্য সমালোচনায় যুগে যুগে এই যে অতিচার ঘটিয়াছে তার এক স্থূল কারণ থাকা সম্ভব। রবীন্দ্র-কাব্য কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই মূল বিচার্য বিষয়। রসিক পাঠক যে-কোনো কাব্যের যে-কোনো একটি কবিতা পড়িয়া আনন্দ পাইতে পারেন, তাঁহার দায়িত্ব কেবল তাঁহার নিজের কাছে। কিন্তু সমালোচকের দায় এত লঘু নয়। তাঁহাকে আগে মন তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে যে, যে-কাব্যখানা পড়িতে যাইতেছি সেটা কি কেবল কতকগুলি খণ্ড খণ্ড কবিতার সমষ্টি, না ততোধিক কিছু। তাঁহাকে স্থির করিতে হইবে রবীন্দ্রকাব্য খণ্ড কবিতামাত্র, না অখণ্ড কাব্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বেলায় এ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। খণ্ড কবিতা লিখিবার রেওয়াজ তখন ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্ণব পদাবলী খণ্ড কবিতার সমষ্টি হইলেও বস্তুত তাহা নয়—সমস্তই পালাবদ্ধ, বিশেষ আলঙ্কারিক রীতিতে বিন্যস্ত এবং রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিবরণের কঠিন ফ্রেমে সংবদ্ধ। অর্বাচীন বাংলা সাহিত্যে এই সমস্যা দেখা দিল। আর তখনই শুরু হইল রস-বিভ্রাটের। প্রাচীন ও অর্বাচীন দুটা রীতিই দেখিতে পাওয়া যায় বিহারীলালের কাব্যে। প্রাচীন কাব্যরীতির অনুরোধে সারদামঙ্গল, সাধের আসন ও বঙ্গসুন্দরী সর্গ-সংবদ্ধ না হইলে, সরাসরি খণ্ড কবিতার সমষ্টি বলিয়া গৃহীত হইলে—এগুলিতে প্রবেশ সহজসাধ্য হইত। অন্ততঃ সারদামঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবের ঝোঁকটা খণ্ড কবিতা রচনার দিকে—কিন্তু প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতিকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই—সর্গবদ্ধ স্বীকার করিতে

হইয়াছে। ফলে আর যাই হোক রসবোধের পথ সুগম হয় নাই। মধুসূদনের বেলায় এ প্রশ্ন ওঠে না। তিনি সর্বদা প্রচ্ছন্ন বা প্রকট কাহিনীর সূত্র অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সব কাব্যই অখণ্ড কাব্য, এমন-কি ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম চতুর্দশপদী কবিতাবলী। এখানে কবির জীবনটাই প্রচ্ছন্ন সূত্র। সেই সূত্র হাতে নিলে পথ না খুঁজিয়া পাইবার কারণ নাই।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়টা জটিল হইয়া উঠিয়াছে আর তার ফলে পাঠকের রসগ্রহণ ক্ষমতায় যুগে যুগে অনাবশ্যক বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু গোড়াতে এমন ছিল না। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত খণ্ডে সংগৃহীত প্রধান তিনখানি কাব্য কবি-কাহিনী, বনফুল ও ভগ্নহৃদয় বিহারীলালী রীতিতে সর্গাকারে গ্রথিত। ইহাদের অখণ্ডত্বের দাবি সারদামঙ্গল ও সাধের আসনের চেয়ে অধিক নয়। সারদামঙ্গল বা সাধের আসনের মতো এগুলিকেও খণ্ড-ভাবে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়, তাহাতেই রসবোধ অপেক্ষাকৃত আয়াসহীন হয়। কিন্তু যে কারণেই হোক বিহারীলালের দৃষ্টান্ত তন্মধ্যে প্রধান, তিনি সর্গবন্ধ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই পর্যন্তই। ইহার পরে তিনি আর কখনো সর্গাকারে-নিবদ্ধ কাব্য বা কাহিনী-আকারে-নিবদ্ধ কাব্য (নাট্যাকারে নয়) রচনা করেন নাই। সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে সুরু করিয়া তাঁহার যাবতীয় কাব্য আপাতদৃষ্টিতে খণ্ড-কাব্যের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানেই সমস্যার সৃষ্টি।

দীর্ঘকাল রবীন্দ্রকাব্যচর্চার ফলে রবীন্দ্রকাব্য পাঠ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা এখানে নিবেদন করিতেছি। যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও সূত্রাকারে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম, সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে সুরু করিয়া প্রত্যেক রবীন্দ্রকাব্যকে অখণ্ড এক-একখানি কাব্যরূপে গ্রহণ করা উচিত।

দ্বিতীয়, নিকটবর্তী সময়ে লিখিত একাধিক কাব্যকে একটি কাব্যগুচ্ছরূপে গ্রহণ করা উচিত।

তৃতীয়, অধিকাংশ কাব্যের প্রথম ও শেষ কবিতাটি লক্ষণীয়। ইহারা যেন উক্ত কাব্যের ভূমিকা ও উপসংহার।

অনেক নিয়মের মতো এই-সব নিয়মেও কখনো কখনো ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

মানসী কাব্য আকারে বেশ বড়। নানা জাতের কবিতা আছে বইখানিতে। মানসী প্রথম নিয়মের ব্যতিক্রম। ইহাকে একখানা অখণ্ড কাব্য মনে না করিয়া একাধিক কাব্যের সমষ্টি মনে করা যাইতে পারে। কবির গাজিপুর বাসকালে লিখিত কবিতাগুলিই প্রকৃতপক্ষে মানসী কাব্য। যখনই তিনি মানসী কাব্যের আলোচনা করিয়াছেন এই কবিতাগুলিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। খুব সম্ভব পূরবী কাব্যখানিও একাধিক কাব্যের সমষ্টি। মানসী ও পূরবী বাদে আর কোনো কাব্যে বোধ করি প্রথম নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে যে, অনেক সময়ে একই সময়ে লিখিত একাধিক কাব্যকে একটি গুচ্ছরূপে গ্রহণ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী এইরকম একটি গুচ্ছ। আবার কল্পনা, নৈবেদ্য, কথা এবং গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি—এইরকম আর দুইটি গুচ্ছ।

মাঝখানে সামান্য কিছু সময়ের বাধা থাকিলে তাঁহার গদ্যকাব্য-চতুষ্টয় এক কাব্যগুচ্ছের অন্তর্গত।

আবার একক ও নিঃসঙ্গ কাব্যের সংখ্যাও যথেষ্ট।

ক্ষণিকা একক নিঃসঙ্গ কাব্য। ইহা যেন ছিন্নপত্রের সহোদরা, দু'য়ে চেহারায় ও স্বভাবে বড় বেশি মিল।

খেয়া আর একখানি একক ও নিঃসঙ্গ কাব্য। আগের কাব্য ও পরের কাব্য কাহারো সঙ্গে ইহার যোগ নাই; ইহা ঘাটেরও নয়, ঘরেরও নয়, নিতান্ত মাঝখানের।

মোটের উপরে বলা যাইতে পারে যে গুচ্ছবদ্ধই হোক আর একক কাব্যই হোক সমস্ত কাব্যই অখণ্ড কাব্য। কাব্য যেখানে গুচ্ছবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে সেখানে পরস্পরের সান্নিধ্যে আর সহযোগিতায় অখণ্ডত্ব আরও জমাট হইয়া উঠিয়াছে।

এবারে তৃতীয় নিয়মটি। প্রায় প্রত্যেক কাব্যে প্রথম ও শেষ কবিতাটি যথাক্রমে ভূমিকা ও উপসংহার বলিয়াছি। ইহার অর্থ কি? সাধারণতঃ পুস্তকে ভূমিকা ও উপসংহারে যে অর্থ এ ক্ষেত্রেও প্রায় তাই। তবে ব্যতিক্রমের মধ্যে এই যে ভূমিকারূপ কবিতাটি প্রায় সর্বত্রই উপস্থিত, উপসংহাররূপ কবিতাটি সর্বত্র তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না।

কাব্য	প্রথম কবিতা	শেষ কবিতা
সোনার তরী	সোনার তরী	নিরুদ্দেশ-যাত্রা
চিত্রা	চিত্রা	সিন্ধুপারে
ক্ষণিকা	উদ্বোধন	সমাপ্তি
খেয়া	শেষ খেয়া	খেয়া
শিশু[১]	জগৎ পারাবারের	নদী
বলাকা	ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা	পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি

আগে বলিয়াছি বিশেষ লক্ষণযুক্ত প্রথম কবিতাটি যেমন প্রায় সর্বত্র উপস্থিত, শেষের কবিতাটি সম্বন্ধে তেমন বলা চলে না। ইহার কারণ আর কিছুই নয় অনেক সময়ে পূর্ববর্তী কাব্যের ভাবের জের পরবর্তী কাব্যে চলিয়া আসিয়াছে, প্রথম

১ রচনাবলী সংস্করণে নদী কবিতাটি শিশুকাব্য হইতে বর্জিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম সংস্করণে ও পরবর্তী সংস্করণসমূহে নদী কবিতাটি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিশুকাব্যে নদীর পরেও অনেক কবিতা আছে, কিন্তু সেগুলি বহুকাল পূর্বে লিখিত, নিতান্তই পত্রপূরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত হইয়াছে। মূল শিশুকাব্য কবির আলমোড়া বাসকালে লিখিত।

কয়টি কবিতা পূর্ববর্তী কাব্যের ভাবেই অনুপ্রাণিত। কিংবা দু'খানি কাব্য কাছাকাছি সময়ে লিখিত হইলে একটির শেষের দিকের ও পরবর্তী কাব্যের প্রথম দিকের কাব্যের মধ্যে ভাবের ও রূপের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। কল্পনা ও নৈবেদ্য এমন দুটি দৃষ্টান্ত।

কল্পনার শেষের চারটি কবিতা[২] আর নৈবেদ্যকাব্যের প্রথম একুশটি কবিতা একই ভাবের, একই রূপের সৃষ্টি। ওরা একই শ্রেণীর যাত্রী হইয়াও বিচার-বিভ্রাটে বিভিন্ন কামরায় উঠিয়া বসিয়াছে।

পলাতকা কাব্যের শেষ গান নামে উপান্ত কবিতাটি পূরবী কাব্যের প্রারম্ভে বিন্যস্ত হইয়া বিশেষ অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কড়ি ও কোমলের প্রথম কবিতা প্রাণ ও শেষ কবিতা শেষ কথা বিশেষ লক্ষণযুক্ত। কিন্তু মানসী কাব্যে উপহার নামে প্রথম কবিতাটি কেবল বিশেষ লক্ষণযুক্ত। শেষের কবিতা সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না।

যে-সব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের ও তাহার কারণের উল্লেখ করিয়াছি সেগুলি বাদ দিলে রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম কবিতা ও শেষ কবিতার গুরুত্ব অস্বীকার করা কঠিন। আর এই গুরুত্ব একবার স্বীকার করিয়া লইলে সমগ্র কাব্যখানি বুঝিবার পথ আপনি সুগম হইয়া আসে।

এবারে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই বর্তমান রচনার উপসংহার করিতে পারি। এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের এক কাব্যের অন্তর্গত কবিতাগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এক কাব্যের সঙ্গে পরবর্তী কাব্যের বা এক কাব্যগুচ্ছের সঙ্গে পরবর্তী কাব্যগুচ্ছের সম্বন্ধটা কি? ঘড়ির দোলক যেমন তালে তালে দুই প্রান্তে আঘাত করিয়া দোদুল্যমান

---

[২] অনবচ্ছিন্ন, আশি, জন্মদিনের গান, পূর্ণকাম ও পরিণাম।

থাকে রবীন্দ্রনাথের [illegible]ও ক্রিয়া অনেকটা সেই রকম সীমা ও অসীমের কোটির মধ্যে তাঁহার কবিমানস দোদুল্যমান। এখন কোনো কাব্যে যদি তাঁহার মন সীমার কোটিতে আঘাত করে তবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে পরবর্তী কাব্যে বা কাব্যগুচ্ছে কবিমানস আঘাত করিবে অসীমের কোটিতে। কড়ি ও কোমলে যে-মানস স্পর্শ করিয়াছে সীমার কোটি, সোনার তরী কাব্যগুচ্ছে তাহাই আঘাত করিতেছে অসীমের কোটিতে, মাঝখানে মানসীতে কবিমানসের সীমা হইতে অসীমের কোটিতে সংক্রমণের অভিজ্ঞতা। কবিমানসের দোলকবৎ বিশেষ গতিকেও একটা নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এতক্ষণ যে নিয়মগুলির কথা (ব্যতিক্রম অবশ্য সর্বত্র আছে) বলা হইল, সেই নিয়মগুলিকে রবীন্দ্রকাব্য-পাঠের সঙ্কেত রূপে গ্রহণ করা যায় কি না ? এই-সব নিয়ম যে একেবারে ধ্রুব ও অবিচল তাহা বলি না, অনুধাবন করিলে হয়তো আরও ব্যতিক্রম আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে হয় এই নিয়মগুলি রবীন্দ্রকাব্য-বোধের পথ সুগম করিয়া তুলিতে সক্ষম। কৌতূহলী পাঠক নিয়মগুলি আরোপ ও প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন আশায় সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম।

গদ্যরচনা-বিষয়ক

জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা

আমাদের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে এমন এক সময়ে জন্মিয়াছিলেন যখন বাঙালী-সমাজের ভিত্তিতে ফাটল এমন প্রশস্ত হয় নাই যে, এক খণ্ড হইতে অন্য খণ্ডে চলাচল নিতান্ত দুস্তর। ফাটল তখনই ধরিয়াছিল, কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম রেখা তখনও সমগ্রতার পক্ষে বাধাস্বরূপ হয় নাই, এমন-কি, সে সূক্ষ্মতা অধিকাংশ লোকেরই চোখে পড়ে নাই। স্থূলভাবে বিচার করিয়া আমরা বলিতে পারি, ব্যবহারিকভাবে তখন সমগ্র বাঙালী-সমাজ অখণ্ড, অতএব এক ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূলে, সুতরাং তাঁহার কাব্যের মূলে এই অখণ্ড বাঙালী-জীবন। একদিন অকস্মাৎ স্বপ্ন ভাঙিয়া যে নির্ঝরিণী বিশ্বের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িল, তাহাকে যেন সমগ্র বাঙালী-জীবন বরফগলা জলের দ্বারা পুষ্ট করিয়াছে। অবশ্য পরবর্তী কালে রবীন্দ্রকাব্যের ভিত্তি প্রশস্ততর হইতে হইতে ক্রমে অধিকতর ভূমি গ্রাস করিতে করিতে বিশ্বকে পাদপীঠ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নির্ঝরের সঙ্গে দেশবিদেশের ধারা মিশিতে মিশিতে তাহা বিশ্বের রসজাহ্নবী হইয়া পড়িয়াছে।

"যে মূর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলা দেশের মাটি দিয়ে তৈরি। একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল—সেটাকেই বলি ছেলেবেলা, সেটাতে মিশোল বেশি নেই।"[১]

কোনো কবির কাজ-বিচারের পক্ষে তাহার প্রাথমিক ভিত্তিটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রাথমিক ভিত্তি তাঁহার সামাজিক ভিত্তি, তাঁহার জাতির ভিত্তি, যে মাটিতে ভর করিয়া কবি প্রথমে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, সেই মাটির দৃঢ়তা ও উদারতার উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। সৌভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথ জাতির এমন এক সন্ধিক্ষণে

১ ছেলেবেলা, চতুর্দশ অধ্যায়।

জন্মিয়াছিলেন, যখন বাঙালী-সমাজ আজিকার মতো ফাটিয়া এমন চৌচির হইয়া গিয়া সংকীর্ণ হইয়া পড়ে নাই। আর মাটির দৃঢ়তা! বাংলাদেশের পলিমাটি অবশ্য নরম—কিন্তু তাহার তলে রহিয়াছে ভারতবর্ষের বজ্রবৎ কঠিন গ্রানিট-স্তর। বাঙালীর জীবন অবশ্য চিরকালই ভাবালুতায় দোলায়মান, কিন্তু তাহার পিছনে রহিয়াছে ভারতবর্ষের বহুযুগপুঞ্জিত তপশ্চর্যার কঠোরতা।

রবীন্দ্রনাথ যদি আর পঞ্চাশ বছর পরে জন্মগ্রহণ করিতেন, কিংবা ত্রিশ বছর পরেও! প্রতিভার প্রাচুর্য সত্ত্বেও এমন মহত্ত্ব লাভ করিতেন কি না সন্দেহ। এই অত্যল্প কালের মধ্যে প্রাথমিক ভিত্তির উদারতা যে অনেক সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে জন্মিলে তিনি মহৎ জাতীয় কবি মাত্র হইতে পারিতেন—কিন্তু মহত্তর সর্বজাতীয় কবি হইতেন কি না সংশয়।

শেক্সপীয়রও ইংলণ্ডের ঠিক এমনি এক সময়ে জন্মিয়াছিলেন—যখন সমাজ-ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়াছে বটে, কিন্তু তখনও দুর্লঙ্ঘ্য বাধারূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই। ফলে তিনি নিজের পাদপীঠরূপে সমগ্র ইংরেজ-সমাজের জীবনকে লাভ করিয়াছিলেন। আর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া মিল্টনের সমকালে জন্মিলে মিল্টনের মতোই তিনি আংশিক জীবনের মহাকবি হইতেন। মিল্টন পিউরিটান দৃষ্টির মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন, শেক্সপীয়র খুব সম্ভব ক্যাভেলিয়র দৃষ্টির মহাকাব্য লিখিতেন, কিংবা তাহার চেয়েও যে আশঙ্কা অধিকতর ছিল—প্রথম চার্লসের দলে যোগদান করার অপরাধে পিউরিটানদের হাতে কবির প্রাণদণ্ডের বিধান হইত, আর মিল্টন তাহা সাগ্রহে সোল্লাসে সমর্থ করিতেন।

সর্বজাতীয়তার ভিত্তি জাতীয় জীবন; নিখিল মানুষের আশ্রয় দেশের মানুষ; বনস্পতির চারাটিকেও প্রথমে একখানি বাঁশের কঞ্চি অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে হয়। এ কথা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ভুলিয়া যাই—বিধাতাপুরুষ ও মানবপ্রকৃতি এই অতি প্রাথমিক

সত্যটা একমুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হয় না। সেইজন্যই বলিতেছিলাম রবীন্দ্রনাথ যে সেই যুগে জন্মিয়া মহাকবি হইবার পাদপীঠ লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের সৌভাগ্য। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, যতদিন না আবার শতদীর্ণ বাঙালী-সমাজ জোড়া লাগিতেছে ততদিন বাঙালী-জাতির মধ্যে আর মহাকবি হইবার সম্ভাবনা নাই। শক্তিমান লেখকের শক্তির অনেকটাই এই ফাটল-পথে রসাতলে চলিয়া যাইবে; যে রসে সে পুষ্ট হইতে পারিত তাহা তাহার কোনো কাজে লাগিবে না।

এখনকার দিনে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, শহরে গ্রামে, কৃষি ও ইণ্ডাস্ট্রিতে সমাজ বহুখণ্ড হইয়া গিয়াছে; একের সঙ্গে অন্যের যে যোগ নাই, মাত্র তাহা নয়—একটি অন্যের পরিপন্থী। এখানে কেহ কেহ জাতিভেদের প্রশ্ন তুলিতে পারেন, বলিতে পারেন, সে ভেদ কি ভেদ নয়? জাতিভেদের ভেদ দাবার ছকের নানা রঙের ভেদের মতো—সবটা মিলিয়া তবেই তাহার সমগ্র চেহারা; ঐ ভেদটুকু আছে বলিয়াই পক্ষ প্রতিপক্ষ সাজিয়া খেলা চলে—সব একাকার হইলে কোনো কাজ চলে না। আসল কথা, বহুকাল হইল আমাদের সমাজ জাতিভেদটাকে তাহার ভালোমন্দসুদ্ধ স্বীকার করিয়া লইয়া কাজ চালাইবার মতো একটা ব্যবহারিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিল; আদর্শের বিচারে হয়তো খাটো ছিল—কিন্তু কোনোরকম করিয়া কাজ চলিয়া যাইত—একেবারে অচল অবস্থার উদ্ভব হয় নাই। এই অচল অবস্থার উদ্ভব হইল অন্যপ্রকার ভেদে—ভারতীয় জীবনের উপর য়ুরোপীয় জীবনের সংঘাতে। ভারতীয় মন্ত্রের উপরে যখন য়ুরোপীয় যন্ত্র আসিয়া পড়িল, এদেশীয় সমাজচৈতন্যের উপরে যখন য়ুরোপীয় ব্যক্তিচৈতন্য আসিয়া পড়িল, তখন দেখিতে দেখিতে এ দেশের শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, শহরে গ্রামে, ব্যবসায়ে বাণিজ্যে ফাটল চৌচির হইয়া দেখা দিল। য়ুরোপ যে অরাজকতার সমুদ্রে আজ চারশো বছর আগে পাড়ি ধরিয়াছিল, কালের দৈর্ঘ্যের

জন্য তাহার জীবনে যে পরিবর্তন মন্থরগতিতে আসিয়াছে, আমরা অত্যল্প সময়ে সেই অরাজকতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলাম। ফলে বিরাট একটা অরাজকতার সমুদ্রে আমরা হাবুডুবু খাইতেছি, ডুবিব কি উঠিব জানি না—ইহার মধ্যে আত্মস্থ হইয়া মহাকাব্য-রচনার, চরম শিল্পসৃষ্টির সুযোগ কোথায়? রবীন্দ্রনাথ অন্তত কৈশোরে ও যৌবনে এই সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হন নাই। তিনি কিছুক্ষণের জন্য তীরে দাঁড়াইয়া, সমাহিত হইবার, সমগ্রটাকে দেখিবার, মহাকাব্যের আত্মস্থতা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এখনকার বাঙালীর মতো সবটা মনোযোগ কেবল নিজের জন্যই তাঁহাকে ব্যয় করিতে হয় নাই—আর তাহা করিতে হয় নাই বলিয়াই তিনি একসঙ্গে আত্মদর্শন ও বিশ্বদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমাজের এই দুই চেহারাই দেখিয়াছেন।

"তখনকার কথা যতই ভাবি আমার একটি কথা কেবলি মনে হয়, তখনকার দিনে মজলিস বলিয়া একটা পদার্থ ছিল এখন সেটা নাই। পূর্বেকার দিনে যে একটি নিবিড় সামাজিকতা ছিল আমরা যেন বাল্যকালে তাহারই শেষ অস্তচ্ছটা দেখিয়াছি। পরস্পরের মেলা-মেশাটা তখন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল সুতরাং মজলিস তখনকার কালের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী। যাঁহারা মজলিসি মানুষ ছিলেন, তখন তাঁহাদের বিশেষ আদর ছিল। এখন লোকেরা কাজের জন্য আসে, দেখাসাক্ষাৎ করিতে আসে, কিন্তু মজলিস করিতে আসে না। লোকের সময় নাই এবং সে ঘনিষ্ঠতা নাই। তখন বাড়িতে কত আনাগোনা দেখিতাম—হাসি ও গল্পে বারান্দা এবং বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া থাকিত। চারিদিকে সেই নানা লোককে জমাইয়া তোলা, হাসিগল্প জমাইয়া তোলা, এ একটা শক্তি—সেই শক্তিটাই কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। মানুষ আছে, তবু সেই-সব বারান্দা সেই-সব বৈঠকখানা যেন জনশূন্য। তখনকার সময়ের সমস্ত

আসবাব আয়োজন ক্রিয়াকর্ম সমস্তই দশজনের জন্য ছিল—এইজন্য তাহার মধ্যে যে জাঁকজমক ছিল তাহা উদ্ধত নহে। এখনকার বড়ো মানুষের গৃহসজ্জা আগেকার চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাহা নির্মম, তাহা নির্বিচারে উদারভাবে আহ্বান করিতে জানে না—খোলা গা, ময়লা চাদর এবং হাসিমুখ সেখানে বিনা হুকুমে প্রবেশ করিয়া আসন জুড়িয়া বসিতে পারে না।...

আমাদের মুশকিল এই দেখিতেছি, নিজেদের সামাজিক পদ্ধতি ভাঙিয়াছে, সাহেবি সামাজিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় নাই—মাঝে হইতে প্রত্যেক ঘর নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে। আজকাল কাজের জন্য দেশহিতের জন্য দশজনকে লইয়া আমরা সভা করিয়া থাকি—কিন্তু কিছুর জন্য নহে, শুদ্ধমাত্র দশজনের জন্যই দশজনকে লইয়া জমাইয়া বসা—মানুষকে ভালো লাগে বলিয়াই মানুষকে একত্র করিবার নানা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করা—এ এখনকার দিনে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এত বড়ো সামাজিক কৃপণতার মতো কুশ্রী জিনিস কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য তখনকার দিনে যাঁহারা প্রাণখোলা হাসির ধ্বনিতে প্রত্যহ সংসারের ভার হালকা করিয়া রাখিয়াছিলেন—আজকের দিনে তাঁহাদিগকে আর-কোনো দেশের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।"[১]

সেই-সব লোকের সামাজিক হাসি ক্রমবিস্তীর্ণ ফাটলের কীর্তিনাশা পার হইয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর প্রতিধ্বনিতে আসিয়া পৌঁছিতেছে—আর কয়দিন পরে এই প্রতিধ্বনিও আর শুনিতে পাওয়া যাইবে না।

সামাজিক মনের বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আচার-ব্যবহার আসবাবপত্র ঘরবাড়ির আকৃতি পর্যন্ত বদলাইয়া গিয়াছে। বৈঠকখানা হইয়াছে ড্রয়িংরুম, ফরাস হইয়াছে চৌকি-টেবিল। ফরাসে দশজনের জায়গায় ঠাসাঠাসি করিয়া পনেরো জন বসা যায়—কিন্তু চেয়ারের

১ জীবনস্মৃতি, "বাড়ির আবহাওয়া"

অনমনীয় সংকীর্ণতায় একের স্থানে দুই জনকে ধরে না। এক-একখানি চেয়ার যেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এক-একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল। আর বাড়িগুলির চেহারাতেই বা কত বদল হইয়াছে। চিৎপুর বাগবাজার অঞ্চলের বিরাট প্রাসাদোপম বাড়িগুলিতে কত তলা, কত কক্ষ, বারান্দার সে কি অকারণ উদারতা, আঙিনায় কি জনতাগ্রাসী প্রশস্তি, আর বিশাল বলিষ্ঠ স্তম্ভগুলির কি স্ফীতি! এ-সব বাড়ি কি শুধু মালিকের জন্য তৈয়ারি হইয়াছিল! এ-সব বাড়িতে যে আস্ত একটা পাড়ার লোক ধরিতে পারিত! আত্মীয়-স্বজন আপন-পর দূর-নিকট রবাহূত-অনাহূত সকলেরই আশ্রয় ছিল এই-সব বাড়িতে! এ যেন এক-একটা সামাজিক দুর্গ—কেবল বাসস্থানমাত্র নয়। ইহাদের সঙ্গে কত প্রভেদ কলিকাতার নূতন পত্তনের বাড়ি-গুলির। ছাঁটাকাটা, বাহুল্যহীন, পায়রাখুপি। এত বেশি সংযত যে, ভালোবাসিতে পারা যায় না ; এত বেশি ভদ্র যে, অভদ্র বলিয়া সন্দেহ জন্মায়! এই-সব বাড়ির ফিলজফি কি? "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী।" এখানে রবাহূত-অনাহূত তো দূরের কথা, আপন স্ত্রীপুত্রকন্যাটি ছাড়া আর কাহারো স্থান নাই। এ যেন এক-একটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিখা—কোনোমতে শুইয়া বসিয়া দুঃসময়ের রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিয়া দিবার জন্য। এক বাড়ির দশটি ফ্ল্যাটে যে দশটি পরিবার থাকে তাহারা কেহ কাহাকেও চেনে না, জানে না ; চিনিবার জানিবার প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করে না। পাশের মানুষ সম্বন্ধে এতখানি যাহার নির্মম ঔদাসীন্য তাহারই কিনা আপিস হইতে আসিয়া পোশাক ছাড়িবার সবুর সয় না, রেডিও-সেটে চাবি ঘুরাইয়া দিয়া সে বুয়েনোস্ এয়ারিসের নূতনতম সংবাদ সংগ্রহ করিতে বসিয়া যায়। তাহার সব চেষ্টাই যে বৃথা চেষ্টা, তাহার কারণ পায়ের তলায় তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই ; সামাজিক ভিত্তি বলো, জাতির ভিত্তি বলো—কিছুই নাই। আর তাহারই অবচেতন অভাব-মোচনের জন্য সে রেডিওর চাবি দিয়া একটার পরে একটা

খুলিয়া যাইতে থাকে। শূন্যাশ্রয়ী ত্রিশঙ্কু ত্রিভুবনের পরিহাসের পাত্র, বড়জোর করুণার, তাহাকে দিয়া কোনো কাজ চলে না।

জীবনস্মৃতির যুগের সঙ্গে বর্তমানের প্রভেদটা বুঝাইবার জন্য আর-একটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। রবাহুত-অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল।...

মানিকতলায় পোড়ো বাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চনীচ নির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।"[১]

এমনটি কি আজকালকার দিনে হইতে পারে? ভোটের জন্য আমরা দরিদ্রের দ্বারস্থ হই বটে, সে আর-এক কথা। পরোপকারের জন্য দুর্গতের কাছে যাওয়া, তাহার মধ্যেও আত্মশ্রেষ্ঠতার চৈতন্য গুপ্ত থাকে। কিন্তু কেবল আমোদের জন্য, বিহারের জন্য এমন নির্বিচার সম্মিলন আধুনিক কালে কখনোই দেখা যায় না। গ্রামাঞ্চলে এখনো থাকিতে পারে, কিন্তু কলিকাতায় অসম্ভব। দ্বারকানাথের পৌত্রের চেয়ে ধন ও বংশ-মর্যাদায় যাঁহারা অনেক নীচে তাঁহারাও এমন নির্বিচার মিশ্রবিহারে নিশ্চয় রাজি হইবেন না। এই শিকারী দলটির কি অদ্ভুত বৈচিত্র্য! দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, রাজনারায়ণ বসুর মতো সাধু ও পণ্ডিত, ব্রজবাবুর মতো রাশভারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া অজ্ঞাত-পরিচয় ছুতোর-কামার! এ যেন চসারের ক্যান্টারবেরি তীর্থযাত্রীর দল! জীবনস্মৃতির যুগে আজিকার মতো সমাজচৈতন্যের সূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া যায় নাই। সেইজন্য দ্বারকানাথের পৌত্রকে ধরিয়া টান

---

১ জীবনস্মৃতি, "স্বাদেশিকতা"

দিলে পাড়ার ছুতোর-কামার পর্যন্ত টান পড়িত। এখনো আমাদের হয়তো ছুতোর-কামারের সঙ্গে মিলিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা আছে—কিন্তু যতই টান দাও, টান বেশিদূর পর্যন্ত পৌঁছায় না; অনেক টানাটানির ফলে কেবল একটি-একটি গুটি খসিয়া হাতে আসে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের শুষ্ক রুক্ষ রুদ্রাক্ষের গুটি; সমগ্র সমাজ-মাল্যের আর দেখা পাই না—সূত্র যে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

তখনকার দিনে শহরে গ্রামে প্রভেদ প্রকট হয় নাই; শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধনের এক আসরেই স্থান ছিল। এই অতি-প্রাথমিক সত্য দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র পাতায় পাতায় ইহার প্রচুর উল্লেখ আছে।

২

জীবনস্মৃতি বাংলা সাহিত্যে বোধকরি সবচেয়ে সুখপাঠ্য গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে লিখিত এই বইখানি রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্য-মণির মতো দুলিতেছে। ইহার পূর্বের ও পরের রবীন্দ্রনাথের স্টাইল সম্বন্ধে লোকের মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু জীবনস্মৃতির স্টাইল সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র সকলে একমত। এই বইখানিতে কবি সকলের মন হরণ করিয়া লইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র সঙ্গে গ্যয়টের জীবনচরিত 'কল্পনা ও সত্যে'র অনেক মিল আছে। গ্যয়টেও তাঁহার জীবনচরিতের দ্বারা জার্মান পাঠকের মন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার 'ফাউস্ট' ও লিরিক কবিতাগুলি ছাড়িয়া দিলে জার্মান সাহিত্যে এমন সর্বজন-আদৃত পুস্তক আর নাই।

গ্যয়টে এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই জীবনকথা জীবনের সিংহদ্বারের কাছে আসিয়া অকালে থামিয়া গিয়াছে। জীবনের উদ্যোগপর্বটার বিশ্লেষণ করিয়া, যে-সব প্রভাব-উপাদানে তাঁহাদের জীবন গঠিত

তাঁহারা তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু যেখান হইতে তাঁহাদের কবি-জীবন বৃহত্তর সংসারে প্রবেশ করিল সেখানে আসিয়া তাঁহারা নীরব। জীবনের উত্তরপর্বগুলি তাঁহারা লেখেন নাই কেন? তাহার কারণ, সে কাহিনী তাঁহাদের কাব্যে নাটকে গানে গল্পে লিখিত হইয়া চলিয়াছে। তাঁহাদের রচিত সাহিত্যেই তাঁহাদের জীবন। বাস্তবিক গ্যয়টে ও রবীন্দ্রনাথের মতো এমন আত্মজীবনাশ্রয়ী সাহিত্যিক আর আছেন কি না সন্দেহ।

সম্প্রতি 'জীবনস্মৃতি'র সঙ্গে 'ছেলেবেলা' যুক্ত হইয়াছে। দুই-ই জীবনী বটে, তবে দুইখানি দুই জাতের রচনা। এ সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

"এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবন-স্মৃতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা—সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হল কাহিনী, এ হল কাকলি; সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা যাচ্ছে গাছে।"[১]

এই প্রভেদ অন্য রকমেও বোঝানো যাইতে পারে। 'জীবন-স্মৃতি' চিত্রশালা আর 'ছেলেবেলা' রূপকথার জগৎ। 'জীবন-স্মৃতি'তে কবি জীবনকে দূর হইতে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—যেন ছবি দেখার মতো। চিত্র আর চিত্রকরে দূরত্ব যতই থাক্, তবু যোগ না থাকিয়া উপায় নাই। 'জীবনস্মৃতি'র জীবন-আলেখ্য ও কবির মধ্যে সেই রকমের প্রভেদ।

'ছেলেবেলা' রূপকথার জগৎ; সে যেন আর কাহারো সৃষ্টি, তাহার উপরে কবির কোনো কর্তৃত্ব যেন নাই। আর দশ জনের মতো তিনিও একজন দর্শকমাত্র। এমন হইবার কারণ, কবির বাল্যকাল ও এই গ্রন্থরচনার মধ্যে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান। শুধু তাই নয়, কবির ছেলেবেলার সেই যুগ, সেই আবহাওয়া, সেই-সব নরনারী কবে বাস্তবলোক হইতে অপসারিত হইয়া কবির

১ ছেলেবেলা, ভূমিকা

মনোলোকে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। বাস্তব রূপ ছাড়িয়া আজ তাহারা যে-রূপ গ্রহণ করিয়াছে, সে রূপকথার রূপ।

দূরত্বের যথেষ্ট অভাবের জন্য জীবনস্মৃতির চিত্রশালায় কবি যে পরিপ্রেক্ষিতটি লাভ করেন নাই, ছেলেবেলাতে সেই রূপকথার পরিপ্রেক্ষিতটি লাভ করিয়াছেন। আর এই রূপকথার জগৎ হইতে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ বিবিক্ত মনে করিয়াছেন বলিয়াই পূর্বতন গ্রন্থে সংকোচবশত যে-সব কথা বলিতে পারেন নাই, এবারে তাহা বলিয়াছেন। জীবনস্মৃতিতে যাহা ছিল নিজের কথা, বড়জোর শিল্পীর কথা—এবারে তাহা হইয়াছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর-এক ব্যক্তির কথা। ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন, "ভাবলুম ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা যাক।" এ যে কেবল ছেলেমানুষ তাহা নয়, অন্য জগতের মানুষ; সে-জগৎ পূর্বেই বলিয়াছি, রূপকথার জগৎ। আরো একটি লক্ষ্য করিবার মতো বিষয়—ছেলেবেলার স্টাইল লিখিত-সাহিত্যের স্টাইল নয়, তাহা রূপকথার স্টাইল—অর্থাৎ তাহাতে কলমের স্পন্দন তেমন ধরা পড়ে না, যেমন ধরা পড়ে রূপকথা বলিবার দীর্ঘবিতানিত লতানমনীয় কণ্ঠস্বর।

৩

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে যে-সব প্রভাব পড়িয়াছে, জীবনস্মৃতি গ্রন্থে সেই-সব সূত্রের মূল বর্ণিত আছে। কবি যেন অন্তত একবারের জন্য নিজ জীবনের ইন্দ্রধনু বিশ্লেষণ করিয়া উপাদানগুলি পাঠককে দেখাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থের সুখপাঠ্যতা ছাড়িয়া দিলেও এইজন্যও ইহা রবীন্দ্রানুরাগীর পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে সবচেয়ে বড় প্রভাব বিশ্বপ্রকৃতির। প্রকৃতি তাঁহার কাছে সবচেয়ে জীবন্ত, সবচেয়ে সত্য সত্তা। ইহা এমন অবিসংবাদিত সত্য যে, প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই—আশা করি, এ বিষয়ে পাঠক আমার সঙ্গে অভিন্নমত। সিদ্ধান্ত

লইয়া যখন তর্কের অবসর নাই, তখন দেখাইলেই চলিবে যে, কোন্ অভিজ্ঞতার সোপান-পরম্পরা আরোহণ করিয়া কবি বিশ্বপ্রকৃতির অন্দরমহলে পৌঁছিয়াছেন।

শ্যাম নামে এক ভৃত্য বালক-রবীন্দ্রনাথকে সংকীর্ণ এক গণ্ডি টানিয়া তন্মধ্যে বসাইয়া রাখিত। বালক-কবি সেই গণ্ডিকে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিতে না পারিয়া সেই সংকীর্ণ স্থানে বসিয়া বৃহত্তর বাহিরটাকে অনুমানের দ্বারা অতিরঞ্জিত করিয়া সৃষ্টি করিয়া উপভোগ করিতেন। এই শ্যামের গণ্ডির স্মৃতিই যেন সারাজীবন ধরিয়া তিনি মস্তিষ্কে বহন করিয়া চলিয়াছেন। স্বল্প অভিজ্ঞতার বাহিরের যে জীবন—কি মানুষের, কি প্রকৃতির, রবীন্দ্রনাথ তাহা কল্পনায় সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন; তাহার কতক বাস্তবের সঙ্গে মেলে, কতক আবার মেলে না। যে-অংশে মেলে, পাঠক বেশ বুঝিতে পারে; যে-অংশে মেলে না, পাঠক বুঝিতে না পারিয়া বলে—রবীন্দ্রনাথে বস্তুতন্ত্র নাই।

শ্যামের গণ্ডির ফলে মানুষের সংসারকে যেমন তেমনি প্রকৃতিকে তিনি আড়াল-আবডাল হইতে দেখিয়াছেন। কলিকাতা শহরের প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে একটি অসহায় বালকের পক্ষে প্রকৃতির নিরাবরণ মূর্তি দেখিবার সুযোগ কোথায়? কিন্তু পুরাপুরি দেখিতে পান নাই বলিয়া কোনো ক্ষতি হইয়াছে মনে হয় না। অর্ধেক না-দেখার আগ্রহ তাঁহার চিত্তকে সতত সজাগ করিয়া রাখিয়াছে। গুণ্ঠন সুন্দর মুখচ্ছবিকে রহস্যময় করিয়া সুন্দরতর করিয়া তোলে। পাড়াগাঁয়ে জন্মিলেই যে প্রকৃতির আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথে অধিকতর হইত এমন মনে করিবার কারণ নাই, বরঞ্চ তাঁহার কবি-প্রকৃতি অনুধাবন করিয়া আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, বালক-কালে পল্লীগ্রামের অবাধ প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চরণ করিবার সুযোগ পাইলে প্রকৃতির আকর্ষণ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রভাব হইয়া দাঁড়াইত না; হয়তো মানুষই প্রধানতম প্রভাব হইয়া উঠিয়া প্রকৃতি গৌণ হইয়া পড়িত। পল্লী প্রকৃতি-

প্রধান, শহর মানবপ্রধান, কিন্তু কোন্‌টি যে কাহার উপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা পূর্বাহ্ণে বলা যায় না; অনেকটা নির্ভর করে মনের গড়নের উপর, এক-একজন এক-একরকম প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে—রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা স্বভাবতই প্রকৃতিকে গ্রহণ করিবার পক্ষে সহজ ছিল। শহরের অর্ধাবগুণ্ঠিত প্রকৃতি সেই প্রবণতার সাহায্য লইয়াছে মাত্র।

প্রকৃতির অন্দরমহলে পৌঁছিবার যে তিনটি ধাপের চিহ্ন জীবন-স্মৃতিতে দেখা যায় সেগুলি এই—জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রকৃতির দূরাপহত অর্ধগুণ্ঠিত মূর্তি দর্শন; গঙ্গাতীরে পেনেটির বাগানে প্রকৃতির কোলের কাছে উপবেশন; ও হিমালয়ে গিয়া প্রকৃতির মধ্যে আত্মবিসর্জন।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

"বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন-কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ-শব্দ-গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই।"[১]

পেনেটির বাগানবাড়ির অভিজ্ঞতা—যখন প্রকৃতির সহিত কবির পরিচয় আর একটু ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে—

১ জীবনস্মৃতি, "ঘর ও বাহির"

"এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্ব-জন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।...প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে।... কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল।...আমরা বাহিরে আসিয়াছি, কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না।"[১]

হিমালয়ে গিয়া কবির স্বাধীনতা ও সেই সঙ্গে তাঁহার জগৎ অনেকটা বাড়িয়া গেল। ডুপুরবেলা পড়িতে বসিলেই তাঁহার ঘুম পাইত—আর ছুটি পাইলেই

"ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত। তাহার পরে দেবতাত্মা নগাধিরাজের পালা।...আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন[২] ছিল। সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ।..বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম।"[৩]

এবারকার হিমালয়-যাত্রার প্রভাব তাঁহার কবিকাহিনী ও বনফুল কাব্যে রহিয়াছে। তাহার গুরুত্ব এতই বেশি যে, ঐ সময়ে কবির হিমালয়দর্শন না ঘটিলে ও-দুইখানি কাব্য নিশ্চয় ঐ আকার পাইত না।

১ জীবনস্মৃতি, "বাহিরে যাত্রা"
২ পাইন বন
৩ জীবনস্মৃতি, "হিমালয়-যাত্রা"

পরবর্তী কালে অর্থাৎ শিলাইদহ-পর্বে কবির কৈশোরের প্রকৃতির আকর্ষণের সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয় যুক্ত হইয়াছে এবং আরো পরবর্তী কালে অর্থাৎ শান্তিনিকেতন-পর্বে এ-দুইয়ের সঙ্গে নূতন একপ্রকার আধ্যাত্মিকতা সংযুক্ত হইয়া, কবির অভিজ্ঞতা ক্রমে পূর্ণতার মুখে চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের উপরে মহর্ষির প্রভাব অল্প নয়। তবে ইহাকে প্রভাব বলিতে দ্বিধা হয় এইজন্য যে, ইহা প্রভাব না হইয়া, পিতা হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইতেও পারে।

মহর্ষির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন কবি ছিল—তাহার প্রধান পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার প্রকৃতিপ্রীতিতে। মহর্ষির পুত্রগণের মধ্যে যতদূর জানি, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রই পিতার এই গুণ সবচেয়ে বেশি পাইয়াছিলেন।

মহর্ষি গম্ভীর প্রকৃতির লোক হইলেও প্রচুর হাস্যরসবোধ তাঁহার ছিল; তাঁহার সব পুত্রেরাই পিতার এই গুণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এই গুণ সর্বাধিক বর্তিয়াছে।

তার পর, মহর্ষি সাধক হইলেও বিষয়কর্মকে কখনো অবহেলা করেন নাই, তিনি নিপুণ বিষয়ী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চরিত্রেও এই স্বাভাবিক বিষয়দক্ষতা দেখা গিয়াছে। কবি হইলেই যে সংসারবিমুখ অবিষয়ী হইতে হইবে, রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন তাহার সুদীর্ঘ প্রতিবাদ।

কিন্তু এগুলিকে প্রভাব বলা যায় না। এবারে যাহা বলিব, খুব সম্ভবত তাহা প্রভাবের অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে মহর্ষি বছরের অধিকাংশ সময়ই বিদেশে কাটাইতেন—মাঝে মাঝে কখনও কদাচিৎ বাড়ি আসিতেন। পিতার এই অনুপস্থিতি বালকের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল—বহু পরবর্তী কালে রচিত

'শিশু' কাব্যে তাহার পরিচয় আছে। 'শিশু' কাব্যের প্রধান চরিত্র শিশু-পুত্র ও তাহার মাতা। পিতা বিদেশে রহিয়াছেন, মাঝে মাঝে তাঁহার চিঠিপত্র আসে, এই পর্যন্ত। 'শিশু' কাব্যের শিশু কবির মাতৃহীন পুত্র ; এই মাতৃহীন পুত্রের অভিজ্ঞতার সঙ্গে হয়তো নিজের অগোচরেই, নিজের পিতৃহীন (অনুপস্থিত অর্থে) শৈশবের স্মৃতি মিশিয়া গিয়া এই কাব্যের রসসৃষ্টির সাহায্য করিয়াছে।

এখানে রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁহার জননীর প্রভাবের কথা বলা যাইতে পারে। বাল্যকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। সেই মাতৃ-বিয়োগের দুঃখ নূতন করিয়া এবং সত্য করিয়া—কারণ অল্পবয়সের দুঃখ অনেক সময় অল্পবয়সে মানুষ তেমনি করিয়া বুঝিতে পারে না —কবি যেন পাইলেন নিজের পুত্রের মাতৃবিয়োগে। এই একখানি কাব্যে একই সঙ্গে পুত্রের ও নিজের মাতৃবিয়োগদুঃখ মিশ্রিত। ইহাকে যাঁহারা অসম্ভব মনে করেন, তাঁহারা মানুষের মনের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ নহেন। কোন্ সূত্রের সঙ্গে যে কোন্ সূত্র মিশিয়া যাইতেছে, কখন কোন্ সমুদ্রের জোয়ার যে ইহার মোহনায় ঢুকিয়া পড়ে, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিবে। যে দুঃখ অবচেতন অবস্থায় ত্রিশ বছর কবির মনে ছিল, পুত্রের মাতৃশোকের উপলক্ষে তাহা অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া দুইপুরুষের অশ্রুর গঙ্গা-যমুনার যুক্তবেণীর তীরে অমর কাব্য রচনা করিয়া তুলিল।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার উপরে সবচেয়ে বেশি। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, নিজের লেখাপড়ার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া বাস করিতেন ; সত্যেন্দ্র-নাথও বয়সে যথেষ্ট বড়, তা ছাড়া চাকুরি উপলক্ষে দূরে দূরে থাকিতেন। হেমেন্দ্রনাথ বড় রাশভারী লোক ছিলেন, বিশেষ তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রভৃতির অব্যবহিত কর্তৃপক্ষ। কাজেই ইঁহাদের কাহারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অবকাশ কবির ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার চেয়ে বয়সে যথেষ্ট বড় হইলেও, তিনি, অনুজকে

বন্ধুরূপে কাছে টানিয়া লইলেন। হেমেন্দ্রনাথ ইংরেজী শিক্ষাকে গৌণ স্থান দিয়া রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাকে বাংলা ভাষার পথে চালিত করিয়া তাঁহার মহদুপকার করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের কৃতিত্ব অনেক বেশি। তিনি সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে নিজের সঙ্গে টানিয়া লইয়া অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।

"জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসংকোচে সমস্ত ভালো-মন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।"[১]

"আগেই বলেছি সেকালে বড়ো-ছোটোর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল না। কিন্তু এই-সকল পুরোনো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আমি ছিলুম তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোটো। বয়সের এত দূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম এই আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য এই যে, তাঁর সঙ্গে আলাপে জ্যাঠামি বলে কখনো আমার মুখ চাপা দেন নি। তাই কোনো কথা ভাবতে আমার সাহসে অকুলোন হয় নি। ...এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।"[২]

জ্যোতিরিন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যে সঙ্গীতে শিকারে অভিনয়ে সঙ্গী করিয়া লইয়া একদিনে তাঁহার বয়স বারো বছর বাড়াইয়া নিজের সহচর করিয়া লইলেন।

কবির কাব্য ও জীবনের উপর তাঁহার নতুন-বৌঠাকরুনের কিছু প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। এই মাতৃহীন বালককে স্নেহের

১ জীবনস্মৃতি, "গীতচর্চা"
২ ছেলেবেলা, দশম অধ্যায়

সাহচর্য দ্বারা তিনি আপন করিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতেই রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম মৃত্যুশোক পাইয়াছিলেন—"আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল সে স্থায়ী পরিচয়।"

কিন্তু ইনি ছাড়া আরো একটি মহিলা কিশোর-কবির জীবনে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বিলাতযাত্রার পূর্বে ইংরেজি শিখিবার উদ্দেশ্যে "কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম।" এই বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে, মেয়েটিও রবীন্দ্রনাথকে কবি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। তার পরে

"কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম জুগিয়ে, সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে, শুনলেন সেটা ভোরবেলাকার ভৈরবী সুরে, বললেন, কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণ-দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।"[১]

কবি যখন নামটি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন নাই, তখন আমাদের পক্ষে তাহা প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইবে, কিন্তু এই নামটি তাঁহার কাব্যে একবার মাত্র নয়, বারংবার ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়াছে, কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে। নামের গুরুত্ব কি এতই? বোধ করি বাস্তবরূপের চেয়ে নাম-রূপই অধিকতর সত্য।

সে যাই হোক, এই মেয়েটি যে কবিকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তাঁহার "দিনরাত্রির দাম" বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, 'ছেলেবেলা'তেই তাহার উল্লেখ আছে।

"আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন

১ ছেলেবেলা, ত্রয়োদশ অধ্যায়

থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিন-রাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।"[১]

এ তো গেল মানুষের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কোনো কোনো বাড়ির প্রভাবও রহিয়া গিয়াছে। এককালে যে বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়ির ছবি সেদিনকার সুখদুঃখের বিচিত্র স্মৃতি বহন করিয়া তাঁহার কাব্যের মধ্যে গানের ধ্রুবপদের মতো ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিয়াছে; ইহাদের মধ্যে প্রধান, মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি। ইহা ছাড়া শাহিবাগের জজের বাড়ি, পেনেটির বাগানবাড়ি, শিলাই-দহের কুঠিবাড়ির স্মৃতি তাঁহার কাব্যে বহুত্র রহিয়াছে। মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির কথা জীবনস্মৃতির "গঙ্গাতীর" পর্যায়ে এবং 'ছেলেবেলা'র ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত বিবৃত আছে। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখিতেছেন—

"ঘরগুলি সমতল নহে, কোনো ঘর উচ্চ তলে, কোনো ঘরে দুই চারি ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি ঘর যে সমরেখায় তাহাও নহে।"[২]

এই বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, উত্তরায়ণের প্রথম বাড়িটি যেন মোরান সাহেবের বাড়ির ছাঁচেই গঠিত। পরবর্তী কালে কবি অনেক সময়ে বোটে করিয়া বেড়াইবার সময়ে মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি যে-অঞ্চলে ছিল, সেখানে গিয়া নৌকা ভিড়াইয়া থাকিতেন। সে বাড়ি কবে ডাণ্ডির কারখানা গ্রাস করিয়াছে, মুগ্ধ চিত্ত তবু তাহারই আশেপাশে ঘুরিয়া সান্ত্বনা পাইবার আশা পোষণ করিত।

---

১ ছেলেবেলা, ত্রয়োদশ অধ্যায়

২ জীবনস্মৃতি, "গঙ্গাতীর"

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, বিহারীলালের মতো কবিতা লিখিবেন। বিহারীলালকে একদা তিনি অনুকরণ করিতেন; কিন্তু অতি অল্প বয়সেই বিহারীলালের প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীত হইতে তাঁহার কাব্য প্রকাশ্য মনে করেন; তৎপূর্বের কাব্য এতদিন অপ্রচলিত ছিল। সন্ধ্যাসংগীতের পূর্বেই তিনি বিহারীলালের প্রভাব উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রভাব দেখিতে হইলে বনফুল, কবি-কাহিনী ও শৈশবসংগীত পড়িতে হইবে। শৈশবসংগীত হইতে একটিমাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত করিব।

তরল জলদে বিমল চাঁদিমা
সুধার ঝরনা দিতেছে ঢালি।
মলয় ঢলিয়া কুসুমের কোলে
নীরবে লইছে সুরভিডালি।

ইহার অনুরূপ বিহারীলালের বিশিষ্ট ছন্দ—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম।... এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম।"[১]

রবীন্দ্রকাব্যে বিহারীলালের প্রভাব সম্বন্ধে যে-পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তাহার যথোচিত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বিহারীলালের প্রভাব যে রবীন্দ্রকাব্যকে যথার্থ পথের নিশানা দিয়াছে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। বরঞ্চ বিহারী-

জীবনস্মৃতি, "সন্ধ্যাসংগীত"

লালের প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার পরেই রবীন্দ্রকাব্যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়াছে। তবে বিহারীলালের সপক্ষে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, যে-সময়ে মাইকেলের প্রভাবে বাংলা কাব্য প্রধানত বহির্মুখী ছিল তখন বিহারীলাল রবীন্দ্রকাব্যকে হয়তো কিয়ৎ-পরিমাণে অন্তর্মুখীনতার ইশারা দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এমন মনে করি না যে, বিহারীলালের কাব্যের ইঙ্গিত ব্যতিরেকে রবীন্দ্রকাব্য অন্তর্মুখী হইতে পারিত না—অন্তর্মুখীনতাই তাহার স্বাভাবিক খাত। কিন্তু কি হইতে পারিত তাহার বৃথা আলোচনা না করিয়া যাহা হইয়াছে তাহাকে অনিবার্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াই ভালো।

হেমচন্দ্রের প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কবিতায় পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়—কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যে এই-সব প্রভাব অন্তর্হিত হয়।

আজি পূরণিমা নিশি,
তারকা-কাননে বসি
অলস-নয়নে শশী
মৃদু হাসি হাসিছে।
পাগল পরানে ওর
লেগেছে ভাবের ঘোর,
যামিনীর পানে চেয়ে
কি যেন কি ভাবিছে।[১]

শৈশবসংগীতের অধিকাংশ কবিতা রবীন্দ্রনাথের তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের রচনা। এই কাব্যের "হরহৃদে কালিকা" কবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট।

কে তুই লো হর-হৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে
ভিখারীর সর্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে?...

১ শৈশবসংগীত

তখনো র'বি কি তুই এই বুকে দাঁড়ায়ে,

ভাবনাবাসনাহীন এই বুক মাড়ায়ে?

ক্রিয়াপদের মিল ব্যবহার হেমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। এই কবিতায় অধিকাংশ মিল ক্রিয়াপদিক।

হেমচন্দ্রের প্রভাবযুক্ত আরও কয়েকটি বাল্যরচনা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

ঐ দেখ ছুটিয়াছে আর এক দল,
লোকারণ্য পথ-মাঝে সুখ্যাতি কিনিতে;
রণক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্তি-মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে।[১]

হিমাদ্রিশিখরে শিলাসনোপরি,
গান ব্যাস ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বতশিখর কানন
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।[২]

এই জাতীয় প্রভাবযুক্ত অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু স্বদেশ-প্রীতি। স্বদেশপ্রীতি বিশেষ করিয়া যে হেমচন্দ্রের কাব্যেরই বিষয়-বস্তু এমন নয়—তখনকার কালের অধিকাংশ কবিরই ইহা অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল। কাজেই ভাবসাম্যের দ্বারা প্রভাব-বিচারের চেয়ে ছন্দঃস্পন্দের সাম্যের দ্বারা বিচার করাই যুক্তি-যুক্ত। যে-সব কবিতা উদ্ধার করিলাম তাহাদের ছন্দঃস্পন্দ স্পষ্টত হেমচন্দ্রীয়। শৈশব-সংগীতের পরেই রবীন্দ্রকাব্যে হেমচন্দ্রের প্রভাব তিরোহিত হয়।

তৎকালীন কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়

---

১ "অভিলাষ"। কবিতাটি মুদ্রণকালে কবির বয়স তেরো বৎসর সাত মাস; দ্রষ্টব্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়।

২ "হিন্দুমেলার উপহার"। কবির বয়স তেরো বৎসর নয় মাস; দ্রষ্টব্য, তদেব।

এই যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাঁহার প্রভাব একপ্রকার নাই বলিলেই হয়।[১]

ইহার কারণ কি? মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও কাব্যধর্ম এমনই বিপরীত যে, রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেও অবচেতনভাবে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হন নাই। কবিধর্মের কিছু সাম্য থাকিলে তবেই আকর্ষণ সম্ভব, আর আকর্ষণের ফলেই প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের দ্বারা প্রভাবিত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না বটে, কিন্তু অস্পষ্টভাবে তাঁহার কাব্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে আক্রমণ করিয়াই তিনি সমালোচক-জীবন আরম্ভ করেন; পরিণত বয়সেও মাইকেল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের মনে এই দ্বন্দ্বের কারণ উভয়ের কবিধর্মের ঐকান্তিক বৈষম্য। মাইকেল সন্ধ্যাসংগীত পড়িলে বিচলিত হইতেন—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসায় বোধ করি সম্মতি দিতেন না।

অবশ্য মাইকেল-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই ইহাকে মাইকেলের প্রভাব বলিতে পারা যায়। কিন্তু মাইকেলী অমিত্রাক্ষরে আর রাবীন্দ্রিক অমিত্রাক্ষরে প্রভেদ আছে। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর এপিকোচিত, কোনো কোনো স্থলে নাটকোচিত; আর রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর কখনো কখনো নাটকোচিত হইলেও অধিকাংশ স্থলে লিরিক-ধর্মাক্রান্ত; সে চলিতে গিয়া নাচিয়া ওঠে, বলিতে গিয়া গাহিয়া ওঠে; তাঁহার অমিত্রাক্ষরের অভিসারিকা পায়ের নূপুর খুলিতে ভুলিয়া যায়

---

১ বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ ১৩৫০ সংখ্যায় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন রচিত, "রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা" নামে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ইহাতে লেখক রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনায় হেমচন্দ্র-মধুসূদনের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কবির বাল্যরচনার একটি মাত্র অংশে মাইকেলের প্রভাব তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তদ্দারা বর্তমান লেখকের উক্তি অপ্রমাণ না হইয়া বরঞ্চ অধিকতর প্রমাণিত হয়।

বলিয়াই অন্ধকারেও সে শ্রুতিগম্য হইয়া উঠে।

এই পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যে যে-সব প্রভাবের কথা বলা হইল তাহা নিতান্ত বাহ্য, অর্থাৎ রবীন্দ্রকাব্যের বহির্লোকে মাত্র তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই তিরোহিত হইয়াছে। এবারে যে তিন কবির কথা বলিতেছি, তাঁহাদের প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্লোক পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে—বৈষ্ণব কবি, শেলি ও কালিদাস। পূর্ববর্তী কবিদের ন্যায় ইঁহাদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কৈশোরপর্বে মাত্র পর্যবসিত নয়—ভিন্ন আকারে, সূক্ষ্মতর ভাবে ইঁহাদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সহচর হইয়া পরিণত বয়স পর্যন্ত চলিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী কাব্যে। এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতা কবির ষোল হইতে বিশ বছর বয়সের মধ্যে রচিত। বিহারী-লালের মতো বৈষ্ণব কবিরাও রবীন্দ্রনাথের মুখ বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতের দিকে ফিরাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথের উপরে ইহাই বৈষ্ণব কবিদের সবচেয়ে বড় প্রভাব।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত। বৈষ্ণব কাব্যের পিছনে একাধারে শিল্প ও সাধনা রহিয়াছে। ভানুসিংহে তাঁহাদের শিল্পটাই শুধু আছে, সাধনা নাই। ইহার সগোত্র বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে পাওয়া যাইবে না—ইহার একমাত্র সগোত্র ও অগ্রজ মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা কাব্য। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের কাব্যে শিল্প ও সাধনা একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে, ভানুসিংহের পদাবলীতে তাহা খুঁজিতে যাওয়া বৃথা।

কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে পড়িয়াছেন, কুমারসম্ভবের কিয়দংশ অনুবাদও করিয়াছেন। তবে কালিদাসের প্রভাব তাঁহার কাব্যে মানসীর সময় হইতে কার্যকরী হইয়া উঠিয়াছে; এই সময় হইতেই কালিদাসের কাব্য ও দর্শন

রবীন্দ্রনাথের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বিদেশী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপরে শেলির প্রভাব গভীরতম। অনেকের ধারণা সন্ধ্যাসংগীত হইতে শেলির প্রভাবের যুগ—বাস্তবিক তাহা নয়। কবিকাহিনী ও বনফুল-এও শেলির প্রভাব অবিরল। শেলির সমাজ-অসহিষ্ণুতা, তাঁহার শ্রেণীবর্ণশাসনহীন সমাজ-পরিকল্পনা, তাঁহার মানবহীন বিশুদ্ধ প্রকৃতির প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণ, আর প্রকৃতির হাতেই যে মানবজীবনের সর্বদুঃখের সর্বৌষধ আছে এই ধারণা—এ সমস্তই পূর্বোক্ত দুই কাব্যে আছে। শেলির ভাব ও অলংকারের আতিশয্যজাত অসংযম, ছবির পরে ছবি আঁকিয়া রেখান্যাস অস্পষ্ট করিয়া ফেলা, রঙের পরে রঙ ঢালিয়া ঝাপসা করিয়া দেওয়া—শেলির এই-সব শিল্পরীতির অনেকগুলিই কবিকাহিনী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুত বৈষ্ণব কবিদের চেয়েও কালিদাস ও শেলির প্রভাব তাঁহার কাব্যে ও সাহিত্যে অধিকতর গভীর ও দীর্ঘতরস্থায়ী। ইহার সঙ্গে আছে উপনিষদের তত্ত্ব।

এই তিনটিই রবীন্দ্রনাথের জীবনের স্থায়ী ও সজীব প্রভাব, ইহাদের কার্যকারিতা দেহান্তরে রূপান্তরে তাঁহার জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার পক্ষে বড় আনন্দের নয়। স্কুলের লেখাপড়ায় কোনোদিন তিনি মন দিতে পারেন নাই। স্কুল পরিবর্তন করিয়া যখন কোনো সুফল হইল না, তখন কর্তৃপক্ষ নিরুপায় হইয়া তাঁহার আশা ছাড়িয়া দিলেন; রবীন্দ্রনাথও যেন নিষ্কৃতি পাইলেন।

স্কুলের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণ কি? আগেই বলিয়াছি, শৈশব হইতেই প্রকৃতির প্রতি একটা অন্ধ আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের ছিল। বাড়িতে বসিয়া আড়ালে-আবডালে প্রকৃতির যে রূপ তিনি দেখিতে

পাইতেন, স্কুলে গিয়া তাহাও যেন তাঁহার কাছে লুপ্ত হইয়া গেল। প্রকৃতির-স্পর্শহীন স্কুল-অট্টালিকার নীরস শুষ্ক জঠরের মধ্যে কিছুতেই তিনি আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। এই প্রকৃতির স্পর্শের অভাবও কতক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে যদি তাহার বদলে মানুষের প্রীতি পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশের স্কুলগুলিতে তাহারও অভাব। সেখানে মানুষ দুইটি মাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত; ছাত্র ও শিক্ষক। কিন্তু এ বিভাগ তো একান্ত কৃত্রিম। সংসারে কেহ ছাত্র ও শিক্ষক-রূপে জন্মগ্রহণ করে না; সংসারের বিভাগ পুত্র কন্যা, পিতা মাতা, ভাই বন্ধু রূপে। কিন্তু স্কুলে তাহা কোথায়? পিতা মাতা, পুত্র কন্যার স্পর্শ হৃদয়ে হৃদয়ে; ছাত্র শিক্ষকের স্পর্শ মাথায় মাথায়; এই মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকির মধ্যে বুদ্ধির স্পর্ধা আছে, অন্তরের টান নাই। কাজেই এখানে তিনি প্রকৃতির স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইলেন, তৎপরিবর্তে মানুষের অন্তরের স্বাদও পাইলেন না। ফলে স্কুল-জীবন তাঁহার কাছে দুঃসহ হইয়া উঠিল।

প্রত্যেক কল্পনাপ্রবণ বালকেরই হয়তো স্কুল-জীবনে প্রথমে এমন অভিজ্ঞতা ঘটে, কিন্তু অভ্যাসের আবর্তনে ও কর্তৃজনের তাড়নায় শীঘ্রই তাহারা এই অবস্থায় অভ্যস্থ হইয়া যায়; শেষে অস্বাভাবিকটাই তাহাদের কাছে স্বাভাবিক হইয়া ওঠে; আবার তাহারা শিক্ষকশ্রেণীতে পরিবর্তিত হইয়া কোমলমতি বালকদিগকে অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করিয়া লইতে শিক্ষা দেয়। এ এক বিষম বিষচক্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না, কর্তৃপক্ষও তেমন গরজ দেখাইলেন না, ফলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক হইয়াই রহিল।

পরিণত বয়সে এই দুঃখের অভিজ্ঞতা তিনি ভুলিতে পারেন নাই বলিয়া দেশের বালকদের রক্ষা করিবার জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন তাহা প্রচলিত প্রথার রীতিমত স্কুল নয়। শান্তিনিকেতন

বিদ্যালয় প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত; এখানকার চরম বিভাগ ছাত্র ও শিক্ষক নয়; ইহা একটি সুবৃহৎ আশ্রম-পরিবার। নিজ নিজ পরিবার হইতে ছিন্ন হইয়া আসিয়া বালকেরা এই বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত হইয়া কতক পরিমাণে পারিবারিক স্নেহস্পর্শ পায়। এই বিদ্যালয়ে প্রকৃতি ও মানুষে হাত মিলাইয়া বালকদিগকে গড়িয়া তোলে। কিন্তু কেবল প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের জগৎ নয়—প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবান এই তিন সত্তা মিলিয়া তাঁহার জগতের সম্পূর্ণতা। শান্তিনিকেতনে সাম্প্রদায়িকতানির্মুক্ত ভগবানের বিশুদ্ধ রূপের শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা আছে। যখন দেশের প্রচলিত স্কুলগুলি হইতে প্রকৃতি ও ভগবান নির্বাসিত, মানুষেরও মাত্র খণ্ডিত অস্বাভাবিক সম্বন্ধ, সেই সময়ে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে এই তিন সত্তাকে সম্মিলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা দেশের শিক্ষা-প্রথায় যে কতবড় যুগান্তর, অস্বাভাবিক অবস্থায় আমরা অত্যন্ত অভ্যস্ত না হইয়া গেলে তাহা বুঝিতে পারিতাম। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের মধ্যে পূর্ণতার প্রতি যে আগ্রহ আছে, সেই পূর্ণতারই বাস্তব প্রকাশ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জীবন

স্কুলের পড়ায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ উপকার হয় নাই বটে, কিন্তু সে ক্ষতি পূরণ হইয়া গিয়াছিল বাড়ির পড়ায় ও বাড়ির আবহাওয়ায়। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া কুস্তি শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি নয়টা পর্যন্ত তাঁহার আর বিরাম ছিল না। কখনো বাংলার মাস্টার, কখনো সংস্কৃতের, কখনো-বা ইংরেজির; তাহা ছাড়া বিজ্ঞান ছিল, ব্যাকরণ ছিল, শারীরতত্ত্ব ছিল; সংগীত তো ছিলই। সব বিষয় তাঁহার সমান ভালো লাগিত এমন নয়; যে বিষয়ে রস পাইতেন তাহাতে অগ্রসর হইয়া যাইতেন; যে বয়সে তিনি কুমারসম্ভব পড়িয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ বালকের ঋজুপাঠ পড়িবার সময়।

কিন্তু বাড়ির পড়ার চেয়ে বাড়ির আবহাওয়ায় তাঁহার বেশি উপকার হইয়াছিল। তৎকালে ঠাকুরবাড়ি বাংলা দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সর্বাগ্রণী ছিল। দেশের যত গুণী জ্ঞানী সকলের যাতায়াত ছিল সেখানে; সংগীত, অভিনয়, কাব্যচর্চা নানাদিক দিয়া নাড়া খাইয়া বালকের মন প্রত্যূষেই জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং তার পরে আর কোনোদিন ঘুমাইয়া পড়ে নাই।

"ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত। ...আমার খুড়তুতো ভাই গণেন্দ্রদাদা তখন রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া নবনাটক লিখাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন। সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তায় আদর্শ জাগিয়া উঠিয়াছিল।"[১]

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে বহুমুখিতা আছে, পূর্ণজীবনের প্রতি যে একটা আকর্ষণ আছে, বালককালের এই অভিজ্ঞতাই তাহার মূলে, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

"বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোট ডেক্‌স লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন।...তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মতো প্রসাদ আমরাও পাইতাম।...সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না, কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম—তাহার আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।"[১]

জীবনস্মৃতি, "বাড়ির আবহাওয়া"

বাড়ির আবহাওয়ায় নানা দিক হইতে নানা রকমের তরঙ্গ তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িয়া তাঁহার কবি-মনকে নানা দিক হইতে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছিল। বাড়ির এক-এক জনের এক-এক দিকে বিশেষ আগ্রহ ছিল। কাহারও কাব্যে, কাহারও সংগীতে, কাহারও চিত্রে, কাহারও তত্ত্বে, কাহারও ধর্মে এবং স্বাদেশিকতায়—এ-সমস্তই যেন একাধারে এই বাড়ির একটি বালকের মধ্যে আসিয়া বর্তিয়াছে। বাড়ির এই বহুমুখী নিয়তজাগ্রত পূর্ণতা-প্রয়াস আবহাওয়াই রবীন্দ্রনাথের জীবনতন্ত্র গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৭

রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, অনেক লেখক চরিত্রসৃষ্টি করিবার সময়ে বাস্তব মানুষের একটা রূপ সামনে রাখেন, তাহার উপরে রঙ ফলাইয়া কারিগরি করিয়া তাঁহার নূতন চরিত্র গড়িয়া তোলেন—কিন্তু তাঁহার চরিত্রসৃষ্টির সময়ে সম্মুখে তেমন কোনো বাস্তব মানুষ থাকিত না। ইহা অংশত সত্য হইলেও সর্বতোভাবে সত্য বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রচনার মধ্যে অনেক চরিত্র দেখা যায়, যাহাদের বাস্তবরূপ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে আছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার বাল্যকালে—দেখা অনেক মানুষ পরিবর্তিত হইয়া তাঁহার কাব্যে নূতন জন্ম লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ঠাকুরদাদা বলিয়া সর্বজনপ্রিয়, ছোটো বড়ো সকলের সমানভাবে সাথী, সংগীতমুখর ও সুরসিক একটি চরি[illegible] আছে। এই ঠাকুরদাদা, অবস্থাভেদে দাদাঠাকুর, দাদা প্রভৃতি নানা নাম ধারণ করিয়াছে। এই পর্যায়ের আরম্ভ বোধ করি বৌঠাকুরানীর হাট-এর বসন্ত রায়ে। এই চরিত্রটি কবির জীবনের পরিণতির সঙ্গে অভিব্যক্ত হইতে হইতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত চলিয়াছে। এই চরিত্রের বাস্তব মূল জীবনস্মৃতির শ্রীব[illegible] সিংহ। এই বৃদ্ধ ভক্ত তাঁহাদের পরিবারের বন্ধু ছিলেন। মহর্ষির

সঙ্গেও যেমন অনায়াসে তিনি মিশিতে পারিতেন, তেমনি অনায়াসে মিশিবার তাঁহার শক্তি ছিল মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত; বাড়ির ছেলেবুড়ো সকলের তিনি সমানবয়সী ছিলেন। তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিল সেতার, মুখে তাঁহার সর্বদা সংগীত। এই সংগীতরসিক, অজাতশত্রু, সকলের সমবয়সী বন্ধুই, কবির সৃষ্ট ঠাকুরদাদা-চরিত্রের বাস্তব মূল বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথকে তাঁহার বৈকুণ্ঠের খাতার বৈকুণ্ঠ বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। বৈকুণ্ঠের পাণ্ডিত্য, রচনার বাতিক, তাঁহার দুরূহ রচনা শুনিবার লোকের অভাব, আবার রচনা শুনিবার নাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা পয়সা আদায়, তাঁহার সংসারে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি সমস্তই দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনে ঘটিয়াছিল।

চিরকুমার সভার চন্দ্রমাধব-চরিত্রের বাস্তব উপাদান সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন—

"চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে অনেক মিশল আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর], কতক রাজনারায়ণবাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্মলাও তথৈবচ—এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে বটে। কিন্তু কোনো রিয়াল্ মানুষ প্রত্যহ আমাদের কাছে যে-রকম প্রতীয়মান সে-রকমভাবে কাব্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়।...চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছসারল্যের ছায়া আছে এবং নির্মলায় সরলার কল্পনা-উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে —কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিস আছে যা তাঁদের কারোই নয়।"[১]

চিরকুমার সভার অক্ষয়-চরিত্রও দুই চরিত্রের মিশলে সৃষ্ট। জীবনস্মৃতির অক্ষয় চৌধুরী ও কিশোরী চাটুজ্যের সঙ্গে কবির কল্পনা মিশিয়া অক্ষয়কে রচনা করিয়াছে। অক্ষয় চৌধুরীর

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০, "পত্রাবলী"

কবিত্বশক্তি, কাব্যানুরাগ, বাক্‌পটুতার সঙ্গে কিশোরী চাটুজ্যের সংগীত-তৎপরতার মিশ্রণে চিরকুমার সভার অক্ষয়ের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে তাঁহাদের বাড়িতে একটি বালকভৃত্য ছিল,

"তার নাম শ্যাম, বাড়ি যশোরে—খাঁটি পাড়াগেঁয়ে, ভাষা তার কলকাতীয়া নয়।...তার রং ছিল শ্যামবর্ণ, বড়ো বড়ো চোখ, তেল-চুকচুকে লম্বা চুল, মজবুত দোহারা শরীর। তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না, মন ছিল সাদা। ছেলেদের 'পরে তার ছিল দরদ।"[১]

ঠিক এই রকম একটি ভৃত্যের বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে।

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে, তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপছিপে বালক।

খুব সম্ভব বাস্তব-শ্যাম কালক্রমে গল্পের রাইচরণে পরিণত হইয়াছে।

৮

ছেলেবেলা গ্রন্থে বালক রবীন্দ্রনাথের কাজকর্মের যে পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায় তাহাতে এই বালককে একেবারে নিজেদের ঘরের বলিয়া মনে হয়। পরিণত রবীন্দ্রনাথকে ঘরের বলিয়া কে কল্পনা করিতে পারে! ইস্কুলের পণ্ডিতমহাশয়ের ইঙ্গিতে এই বালক একদিন নিজেদের বাড়ি হইতে কেয়া-খয়ের 'অপহরণ' করিয়াছিল। আবার ইস্কুল হইতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চিংড়িমাছের চচ্চড়ি দিয়া লঙ্কামাখা পান্তাভাত খাইত। সরু করিয়া সুপারি কাটায় তাহার নাকি দক্ষতা ছিল। আর শিলাইদহে সেই ফুলের

১ ছেলেবেলা, ষষ্ঠ অধ্যায়

রস দিয়া কবিতা লিখিবার চেষ্টা। এ যে নিতান্ত ছেলেমানুষি। ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ই যে 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে।

কিন্তু এ কেমন ছেলেমানুষ! কিশোর কবির মনে ও কাব্যে পরিণত মহাকবির কাব্যের সব ভাব যেন ছায়াশরীরী আকারে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

য়ুরোপীয় সমালোচকগণ তাঁহাদের দেশের লেখকদিগকে মনের গঠন অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন, জাতীয় ও য়ুরোপীয়; একদল লেখকের রচনায় জাতীয় উপাদান অধিক, অপর দলের রচনায় য়ুরোপীয় উপাদান। এই দুই শ্রেণীকে অল্প পরিবর্তিত করিয়া বলা যাইতে পারে—জাতীয় ও সর্বমানবীয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে সর্বমানবীয় উপাদান অধিকতর। মানুষকে জাতি-দেশ-সম্প্রদায়-নির্মুক্ত বিশুদ্ধ মানবমাত্ররূপে দেখিবার সহজাত শক্তি লইয়াই যেন তিনি জন্মিয়াছিলেন। ইহা বৈদেশিক সংস্কৃতি বা বিদেশভ্রমণের ফলে সঞ্জাত নহে—কারণ বিদেশ গমনের পূর্বেই তাঁহার কৈশোরের রচনাতে প্রভূত পরিমাণে ইহা লক্ষ্য করা যায়।

প্রসঙ্গত, এখানে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁহার এ বিষয়ে প্রভেদ তুলনীয়। মাইকেল মধুসূদন কিশোর বয়স হইতে বৈদেশিক সংস্কৃতির মধ্যে ডুবিয়াছিলেন; তাঁহার বিলাত গমনের অস্বাভাবিক (সেকালের পক্ষে স্বাভাবিক) আগ্রহের ফলে বিদেশগমনের পূর্বেই বিদেশই যেন তাঁহার দেশ হইয়া গিয়াছিল; ধর্মে সংস্কৃতিতে ভাষায় তাঁহাকে বিদেশীই বলিলে যেন চলে। কিন্তু লেখক হিসাবে তাঁহার ধাত ছিল জাতীয় লেখকের; তিনি তাৎস্থানিক ও তাৎকালিকের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই বলিয়া মানুষের বিশুদ্ধ রূপ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই; তাঁহার রাম, রাবণ, লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ—সকলেই উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালী।

কৈশোরে বৈদেশিক সংস্কৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় মাইকেলের মতো গভীর ছিল না, কিন্তু সহজাত শক্তির বলেই তিনি অনায়াসে যেন তাৎকালিক ও তাৎস্থানিকের ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিশুদ্ধ মানুষকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কৈশোরে বিলাতে গিয়া সেখানকার মানুষকে দেখিয়া তাঁহার এই সহজাত বোধ সমর্থিত হইয়াছিল মাত্র। যে ইংরেজ-পরিবারে তিনি ছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—

"এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি —মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের দেশে পতিভক্তির একটা বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বী গৃহিণীর সঙ্গে মিসেস স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই।"[১]

ভিন্ন দেশের আচার-ব্যবহার-প্রথা ভেদ করিয়া মানুষের অন্তরতর রূপটি দেখা, বিশেষ এত অল্পবয়সে, সহজ কথা নয়—ইহার জন্য সহজাত শক্তির প্রয়োজন।

ছেলেবেলা গ্রন্থে এই ভাবটিকে আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন—

"আমি য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিন মাস মাত্র। কিন্তু আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁওয়া লেগে। আমাদের কারিগর সুযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নূতন নূতন মালমসলা। তিন মাসে ইংরেজের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই মিশোলটি ঘটেছিল। আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সন্ধ্যেবেলায় রাত এগারোটা পর্যন্ত পালা করে কাব্য নাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের

১ জীবনস্মৃতি, "বিলাত"

মিলন। বিলেতে গেলেম, ব্যারিস্টার হই নি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো ধাক্কা পাই নি, নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত-মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।"[১]

রবীন্দ্রনাথের জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাই যে সর্বমানবীয় উপাদানে রচিত! এইদিকে স্বাভাবিক প্রবণতা না থাকিলে কেহ এত অল্পবয়সে এমন অনায়াসে বৈদেশিক আবহাওয়ার কুয়াশা ভেদ করিয়া জাতি-দেশ-সম্প্রদায়-নির্মুক্ত বিশুদ্ধ মানুষের রূপ দেখিতে পায় না। সর্বমানবীয়তা তাঁহার সাহিত্যের প্রধান উপাদান বলিয়াই বিদেশের পক্ষে তাঁহাকে বুঝিতে পারা বোধ করি এত সহজে হইয়াছিল। আবার তাঁহার কাব্যে তাৎস্থানিকতা গৌণ বলিয়াই দেশের লোকের পক্ষে তাহা অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিতে বোধ করি এমন বিলম্ব হইয়াছিল। রবীন্দ্রকাব্যে 'বিশ্ববোধ' কবির জীবনের পরিণতির সঙ্গে পল্লবিত পুষ্পিত হইয়াছে মাত্র; কিন্তু অঙ্কুররূপে তাহা গোড়া হইতেই বর্তমান ছিল।

৯

জীবনস্মৃতির ভাষারীতি বা স্টাইলের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতির একটি প্রধান লক্ষণ অলঙ্কারবাহুল্য। অলঙ্করণবহুল গদ্য সব ক্ষেত্রে গুণ নয়, অনেক ক্ষেত্রেই দোষ। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাময়িক প্রবন্ধাদির একটি প্রধান দোষ অলঙ্করণবহুলতা। অন্যত্র ইহা গুণ, যেমন বিচিত্র প্রবন্ধে বা প্রাচীন সাহিত্যে; অলঙ্করণবাহুল্য তাঁহার গদ্যরীতির সাধারণ লক্ষণ, কৈশোরের রচনা হইতে বার্ধক্যের রচনা সর্বত্র সমান ভাবে বর্তমান। কিন্তু মাঝখানের একটা পর্বের কতকগুলি রচনায় অলঙ্করণপ্রবণতা অনেক কম। জীবনস্মৃতি ও গোরা

১ ছেলেবেলা, চতুর্দশ অধ্যায়

এই পর্বের সেই শ্রেণীর রচনা। বোধ করি জীবনস্মৃতির চেয়েও গোরাতে অলঙ্কার অল্প। এই সময়টাকে তাঁহার গদ্য রচনারীতির মধ্যপর্ব বলিয়া ধরিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্বদ্বয়ের অধিকাংশ গদ্যগ্রন্থ অলঙ্কারভারে মন্থরগতি। পরবর্তী পর্বে অলঙ্কারের ব্যবহার পূর্ববর্তী পর্বের চেয়েও বোধকরি বেশি। বিচিত্র পর্যায়ের উৎপ্রেক্ষা ও উপমাকে ঘরে-বাইরে বা শেষের কবিতার মতো উপন্যাসের ভাবের বাহন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কর্তার ইচ্ছায় কর্মের মতো সাময়িক প্রবন্ধও অলঙ্কারভারে বিব্রত।

কিন্তু সৌভাগ্যবশত মধ্যপর্বে রচিত গোরা ও জীবনস্মৃতির ন্যায় গ্রন্থ বহুল পরিমাণে এই দোষ হইতে মুক্ত—আর সেই জন্যই তাঁহার এই পর্বের গদ্যরীতি এমন একটি ঋজুতা ও দার্ঢ্য লাভ করিয়াছে যাহা অনন্যসাধারণ। ঋজুতা ও দৃঢ়তা সুসমন্বিত হইলে গদ্য ভারসাম্য লাভ করে—উহাতেই গদ্যের পরাকাষ্ঠা। গোরা ও জীবনস্মৃতির ভাষায় যে ভারসাম্য দেখি রবীন্দ্র-গদ্যের অন্যত্র তাহা বিরল। তাহার পরবর্তী গদ্যে নমনীয়তা, লঘুতা প্রভৃতি গুণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তাহাকে সাধারণভাবে গদ্যরীতির আদর্শ বা রবীন্দ্র-গদ্যরীতির আদর্শ বলা চলে না। উক্ত গদ্যরীতির উত্তরপুরুষ রবীন্দ্রনাথের গদ্যচ্ছন্দ বা গদ্য-কবিতা। সমসাময়িক গদ্যরীতি বা পদ্যরীতির (গদ্য-কবিতাকে পদ্য বলিয়া ধরিলে) উপরে উহার প্রভাব সমধিক হইলেও উহা গদ্য রচনার আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবে কি না সন্দেহ। উহা রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশিষ্ট সরণী বলিয়া চিহ্নিত থাকিবে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে অনুসরণযোগ্য রাজপথ বলিয়া গৃহীত হইবে মনে হয় না। যে গদ্য লেখকের ব্যক্তিত্বের ছাঁচে আগাগোড়া ঢালাই করা, তাহা একান্তভাবে লেখকেরই নিজস্ব থাকিয়া যায়, সাধারণের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা বিপদ্‌জনক। শ বা চেস্টারটনের গদ্য-রীতিকে অনুসরণ করিবার কথা কোনো বুদ্ধিমান ইংরেজ লেখক মনে

করে না। এ ক্ষেত্রেও তেমনি হওয়া উচিত। কিন্তু উচিত মতো অনেক কাজ সংসারে যে হয় না, তাহার প্রমাণ অনেক আধুনিক রবীন্দ্রেতর লেখকের গদ্যরীতি। ইহাদের অনুসৃত (সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে) গদ্যের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের গদ্যরীতি। তাহাদের ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণ মগ্ন হইয়া যায়, ফলে লেখার উদ্দেশ্যটাই যে ব্যর্থ হইতে থাকে তর্ক করিয়া ইহা বোঝানো সহজ নয়।

শরৎচন্দ্রের উক্তি বলিয়া প্রচলিত আছে যে, তিনি লেখক-জীবনে গোড়াতে গোরা উপন্যাসখানা নাকি পঞ্চাশবার পড়িয়াছিলেন। ইহা সত্য বলিয়াই মনে হয়, কেন-না, শরৎচন্দ্রের গদ্য-রীতির উৎকর্ষের মূলে গোরার গদ্যরীতির আদর্শ। অথচ ঐ আদর্শকে তিনি নিজের রসে জারিত করিয়া বৈশিষ্ট্যদান করিয়াছেন, পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের মধ্যে যেমন মিল থাকা উচিত তেমনি আছে অথচ দুটিই বিশিষ্ট, একটি আর-একটির নকল নয়।

আবার প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতি স্বকীয়তায় বিশিষ্ট, তাহাকে অপর কাহারো রচনার সঙ্গে ভুল করিবার উপায় নাই—তৎসত্ত্বেও আমার ধারণা—প্রমথ চৌধুরীর গদ্য রচনার উৎকর্ষের মূল রহিয়াছে গোরার ঋজু, স্বল্পবাক্, অলঙ্কারবিরল গদ্যে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনারীতির আলোচনা করিলে মনে হয় যে, গোরা ও জীবনস্মৃতির অনুসৃত গদ্য ভাষাটাই পরবর্তী গদ্য রচনা-রীতির পক্ষে সুফল প্রসব করিয়াছে, কারণ লেখক এখানে সাধারণের অনুসরণযোগ্য একটি রাজপথ তৈয়ারি করিয়াছেন, ইহা তাঁহার নিজের কীর্তি কিন্তু একান্তভাবে নিজস্ব নয়; আর শেষের কবিতা বা তিন সঙ্গীর ভাষা কেবল তাঁহার নিজের কীর্তিমাত্র নয়, তাহা নিতান্তই তাঁহার নিজস্ব। গরুড় কল্পনালক্ষ্মীর অধিপতি একমাত্র বিষ্ণুরই যোগ্য বাহন, অপরে তাহা দেখিয়া

বিস্মিত হইতে পারে, কিন্তু পিঠে চাপিতে গেলেই বিড়ম্বিত হইবার আশঙ্কা।

গোরা ও জীবনস্মৃতির গদ্যরচনারীতির ভারসাম্যের আর একটি কারণ, এখানে তৎসম তদ্‌ভব ও দেশী শব্দের একটি সুষ্ঠু ও রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বিদ্যাসাগরের আমল হইতে বাংলা গদ্য এই সংমিশ্রণ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে—বাংলা গদ্যরীতির সম্মুখে ইহাই পরীক্ষা এবং ইহাই আদর্শ। বাংলা গদ্যরীতি এখনো সম্যক্‌ভাবে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও এই আদর্শে উপনীত হয় নাই সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যপর্বের গদ্যরীতিতে তাহার একটা সার্থকতা ঘটিয়া গিয়াছে। তাই কেবল রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বিবর্তনে মাত্র নয়, বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাসেও গোরা ও জীবনস্মৃতির গদ্যরীতি একটি স্থায়ী উল্লেখ লাভ করিবার যোগ্য।

১০

অনেকের ধারণা যে, ক্রিয়াপদের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতার উপরেই চলিতভাষায় নির্ভর। বস্তুত ক্রিয়াপদের রূপের সঙ্গে সাধুভাষা বা চলিতভাষার সম্বন্ধ সামান্যই। দীর্ঘ ক্রিয়াপদ সত্ত্বেও ভাষা চলিতভাষা হইতে পারে, উদাহরণ 'আলালের ঘরের দুলাল'। আবার ক্রিয়াপদ হ্রস্ব হওয়া সত্ত্বেও ভাষা সাধুভাষা হইতে পারে, উদাহরণ রাজশেখর বসু কর্তৃক অনূদিত 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'। আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপরেই বহুল পরিমাণে ভাষার সাধুত্ব বা চলিতত্ব নির্ভর করে; বিষয়ভেদে ভাষা মন্থরতা বা দ্রুতি লাভ করে। আমরা যাহাকে ভাষার সাধুত্ব বা চলিতত্ব বলি তাহা মূলত ঐ মন্থরতা বা দ্রুতি। হ্রস্ব ক্রিয়াপদ অনেক সময়ে ভাষাকে দ্রুত করিয়া তোলে বলিয়াই অনেকের ধারণা জন্মিয়াছে যে, উহা বুঝি চলিতভাষার অপরিহার্যতম লক্ষণ। ক্রিয়াপদের রূপের সঙ্গে ভাষার

রূপের যে কার্যকারণ-সম্পর্ক নাই তাহার উদাহরণ তো পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। আরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে; চলিত-ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মধ্যপর্বের গদ্যরচনারীতি, প্রধানত নিম্নোক্ত তিনখানি গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া ইহা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে—গোরা, জীবনস্মৃতি ও চতুরঙ্গ।

ছিন্নপত্রের কবি

ছিন্নপত্রের চিঠিগুলিকে আমরা অন্যত্র পত্রসাহিত্যরূপে আলোচনা করিয়াছি। এখানে আলোচ্য বিষয়, এই পত্রগুলিতে প্রকাশিত কবি-পুরুষের স্বরূপ।

ছিন্নপত্রে সবসুদ্ধ একশো বাহান্নখানা চিঠি আছে। তন্মধ্যে প্রথম তেরোখানা ১৮৮৫ হইতে ১৮৯০ সনের মধ্যে লিখিত। ছয় বছরে মাত্র তেরোখানি, নিতান্তই বিক্ষিপ্ত, কবিপুরুষের সুসংলগ্ন পরিচয় পাইবার পক্ষে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ নয়। কিন্তু অবশিষ্ট একশো উনচল্লিশখানি পত্র ১৮৯১ হইতে ১৮৯৫ সনের মধ্যে অর্থাৎ পাঁচ বছরের মধ্যে লিখিত। হিসাব করিলে দাঁড়ায় যে, মাসে দুইখানার অধিক; কাজেই পত্রাঙ্ক অনুসরণ করিলে লেখকের অন্তঃপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। এখানে সেই চেষ্টাই করিব।

১৮৯১ হইতে ১৮৯৫ সনে, কবির বয়স তখন ত্রিশ হইতে চৌত্রিশ, পরিণত প্রতিভার প্রথম পর্ব। রবীন্দ্রনাথ ডায়ারি লেখেন না, এই চিঠিগুলিকে তাঁহার ডায়ারিলিপি বলিয়া গ্রহণ করিলে ক্ষতি নাই। মূল চিঠির যে-সব অংশে ব্যক্তিগত ও সাময়িক বিষয় ছিল সে-সব কর্তিত হওয়াতে পত্রগুলি প্রায় ডায়ারির নৈর্ব্যক্তিকতা লাভ করিয়াছে। তাহার ফলে পত্রসাহিত্যরূপে এগুলির ক্ষতি যেমনি হোক, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের তেমনি ক্ষতি হয় নাই, কারণ লেখক ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অকরুণ হস্তে ছাঁটিয়া দিলেও রবীন্দ্রনাথের কবিপুরুষের ধ্যানধারণার উপরে হস্তক্ষেপ করেন নাই, বরঞ্চ অনেক অবান্তর বস্তু ঝরিয়া যাওয়াতে সেই পরিচয়টি আরও উজ্জ্বল, আরও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।[১] সেই পরিচয় উদ্‌ঘাটনই তো আমাদের কাজ, কবি আমাদের কাজ অনেক সহজ-সাধ্য করিয়া দিয়াছেন।

১ পূর্ণতর পাঠ ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থে সংকলিত।

শ্যামলা মা-জাতের মেয়ে, উর্মিমালা প্রিয়া-জাতের মেয়ে, আর মা ও প্রিয়ার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পুরুষ শশাঙ্কের চিত্তে।

মালঞ্চও ইহারই অনুবৃত্তি। নীরজা মা-জাতের মেয়ে, সরলা প্রিয়া-জাতের মেয়ে—আর দুজনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পুরুষ আদিত্যনাথের চিত্তে। দুই গ্রন্থে কিছু কিছু স্থানিক স্বাতন্ত্র্য আছে—কিন্তু দু'য়ের চেহারাটা এক।

চার অধ্যায়ের সূত্র বা প্রতিপাদ্য 'আভাস' অংশে লিপিবদ্ধ। সমস্ত 'আভাস'টাকেই সূত্র বলিতে পারি। কিন্তু বীজাকারে তাহা নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে রহিয়াছে।

"সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘরে একলা বসে ছিলেম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।' এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্মজালে জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না। এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা। উপন্যাসের আরম্ভে এই কথাটি উল্লেখযোগ্য।" [১]

উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, সন্ন্যাসীর সেই দৃষ্টি ও মর্মান্তিক বাক্য বহু বৎসর কবির হৃদয়ে গুপ্ত থাকিয়া চার অধ্যায় আকারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রহ্মবান্ধবের শেষ সাক্ষাৎকার না ঘটিলে চার অধ্যায় লিখিত হইত কি না সন্দেহ। 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে' এই সত্যটি চার অধ্যায়ে নানা আকারে মূর্তি-লাভ করিয়াছে—অতীন্দ্র-আকারে, ইন্দ্রনাথ-আকারে, গুপ্তষড়যন্ত্র-বাদের আকারে। এ বিষয়ে চার অধ্যায় প্রকাশকালে মতভেদ

১ গ্রন্থপরিচয়, চার অধ্যায়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩শ খণ্ড

ঘটিয়াছিল, এখনো যে মতের মিল হইবে এমন সম্ভাবনা নাই, সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা—ঐ সূত্রটার ব্যাখ্যা চার অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলিয়াছেন যে, চার অধ্যায় মতামতের সমষ্টি নয়, গল্প। কিন্তু এ কথা আংশিক স্বীকার্য। চার অধ্যায় একটি বিশিষ্ট মতের অভিব্যক্তি, গল্পটি তাহার বাহন, কিংবা গল্পটি উপন্যাসে-বিবৃত মতামতের উদাহরণ মাত্র।

এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনার আংশিক প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ আগেও করিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্থল নৌকাডুবি। রচনাবলী-সংস্করণে নৌকাডুবির ভূমিকা পড়িলেই আমার উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু নৌকাডুবি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, খণ্ডোপন্যাস নয়, প্রমাণমূলক উপন্যাস তো নয়ই, তাহার কারণ, তত্ত্বের একটা তাগিদ কবির মনে থাকিলেও গল্পের ধারাটাই প্রবলতর, আর সেই প্রবলতার বেগে উপন্যাস আপন স্বাভাবিক আয়তন লাভ করিয়াছে, তত্ত্বের খাতিরে তাহাকে আত্মসঙ্কোচন করিতে হয় নাই।[১]

তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই যে, আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থ খণ্ডোপন্যাস-পর্যায়ভুক্ত। ইহাদের সাধারণ লক্ষণ—রচনার আংশিকতাধর্ম, গল্প-গ্রন্থনে প্রত্যাশিতঘটনালঙ্ঘনপ্রয়াস, চরিত্র-চিত্রণে ন্যূনতম রেখাপ্রয়োগ, অপরিহার্যতম ভারকেও পরিত্যাগের চেষ্টা, এবং ভাষার নির্গুণরূপ। আবার এই-সব লক্ষণের মূলে হইতেছে তত্ত্বকে প্রাধান্যদান এবং গল্পের গৌণীকরণ। গল্প এখানে তত্ত্বের বাহন বলিয়া স্বেচ্ছায় চলিতে পারে নাই, তত্ত্বের প্রয়োজন-মতো চলিতে বাধ্য হওয়ায় আপন ধর্ম ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য গল্পকথা নয়, তত্ত্বপ্রতিপাদন। এগুলি যেন পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয়, উপন্যাসের খসড়া মাত্র—সংক্ষেপে খণ্ডোপন্যাস

১ তত্ত্বোপন্যাস বা প্রমাণমূলক উপন্যাস হইয়াও যে গল্পের আকর্ষণ, আপন আয়তন ও নর-নারীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য বজায় রাখা যায়, তাহার উদাহরণ আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে সমস্ত রসসাহিত্যকে, বিশেষভাবে এ তিনখানি গ্রন্থকে, রসের দিক হইতেই বিচার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু রস-সাহিত্যে যেখানে তত্ত্বের মূর্তি সুপ্রকট সেখানে তত্ত্বের বিচার অনিবার্য হইয়া পড়ে, আর এ তিনখানি উপন্যাসে তত্ত্বরূপ মুখ্য বলিয়া স্বভাবতই তাহার বিচারও মুখ্য স্থান অধিকার করিবে। সমালোচকের কর্তব্য রচনার ধর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট।

দুই বোন ও মালঞ্চকে একত্র বিচার করা যাইতে পারে, কেননা, আগেই বলিয়াছি, ইহাদের একটি যেন আর-একটির অনুবৃত্তি। চার অধ্যায়ের বিচার স্বতন্ত্র করিতে হইবে।

শর্মিলা মা-জাতের মেয়ে, উর্মিমালা প্রিয়া-জাতের মেয়ে; শশাঙ্কের পুরুষচিত্তের উপর ইহাদের প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসই দুই বোন উপন্যাস। এ গ্রন্থখানির নাম যদি হয় দুই বোন, মালঞ্চের নাম ভাইবোন দেওয়া যাইতে পারে, কারণ আদিত্যনাথ ও সরলা দূরসম্পর্কিত ভাইবোন। শর্মিলা ও উর্মিমালা সহোদরা হওয়ায় যে ট্র্যাজেডি তীব্রতার চরমে পৌঁছাইতে পারে নাই, নীরজা ও সরলা সম্পূর্ণ অসম্পর্কিত হওয়াতেই তাহা যেন দুঃখের শিখরে উপনীত হইয়াছে। শর্মিলা ও উর্মিমালার সোদরত্ব দুঃখের চরম অভিব্যক্তির পক্ষে বাধা মনে করিয়াই কি রবীন্দ্রনাথ নীরজা ও সরলাকে সম্পূর্ণ অনাত্মীয়রূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন, যাহাতে দুঃখের অভিব্যক্তি সেখানে কোনো বাধা না পায়? যে কারণেই হোক্, 'দুই বোনে'র অসমাপ্ত ট্র্যাজেডি 'মালঞ্চে' চরমে পৌঁছিয়াছে।

শর্মিলার মন গোড়া হইতেই মা-জাতের মেয়ের মতো, শশাঙ্কের প্রতি তাহার ব্যবহারও প্রধানত মাতৃধর্মী। ইহাতে শশাঙ্কের

সাংসারিক মন বেশ স্বস্তিতে ছিল, কিন্তু কোথায় কোন্ গভীরে
সুখকর অশান্তির জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা তাহার রহিয়া গিয়াছিল।
এই সুখকর অশান্তি প্রিয়া-জাতীয় মেয়েতেই দিতে পারে। শর্মিলা
অসুস্থ হইয়া পড়াতে উর্মিমালা যখন তাহাদের সংসারের মধ্যে
আসিয়া পড়িল, তখন সে শশাঙ্কের চিত্তের সুপ্ত সুখকর অশান্তির
কামনাকে যেন উস্কাইয়া দিল। এতদিন পরে শশাঙ্কের স্বস্তি
গেল, তাহার স্থলে দেখা দিল প্রেমের সুখজ্বালাময় অশান্তির
দোলা। এ অবস্থায় শর্মিলার কর্তব্য কি? মা-জাতের মেয়ে
রুগ্ণা শর্মিলা শশাঙ্ককে যে পরামর্শ দিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তিনী
নামে ছোটগল্পের নায়িকা হরসুন্দরী স্বামী নিবারণকেও সেই
পরামর্শ দিয়াছিল। নিবারণ শৈলবালাকে বিবাহ করিয়াছিল,
পত্নীর পরামর্শে শশাঙ্কও উর্মিমালাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইল।
এমন সময়ে উর্মিমালার আধুনিকী বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া শর্মিলা,
শশাঙ্ক ও পাঠককে এই অবাঞ্ছিত অবস্থা হইতে বাঁচাইয়া দিল।
আসন্ন বিবাহের সঙ্কল্প ছিন্ন করিয়া উর্মিমালা বিলাত যাত্রা করিল।

দুই বোন গল্পের যেখানে শেষ, মালঞ্চ গল্পের প্রায় সেখানে
সূত্রপাত। গুরুতর রোগগ্রস্তা নীরজার অনুপস্থিতির স্বাভাবিক
সুযোগে, মালঞ্চের মধুময় নিবিড় আকর্ষণে আদিত্য ও সরলা
ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল। শয্যাসীনা নীরজা সবই বুঝিত, কিন্তু
করিবার কিছুই নাই, কেবল দুঃখে পুড়িয়া মরা ছাড়া। সকলেই
জানিত নীরজার রোগ চিকিৎসার অসাধ্য, আদিত্য ও সরলা
ততদিন সবুর করিবে স্থির করিল। তবু একত্র আর থাকা চলে না;
কিন্তু সরলার পক্ষে বিলাত যাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই সে জেলে
গেল। জেলে গিয়াও সমস্যা-সমাধান হইল না, কারণ মেয়াদ
উত্তীর্ণ হইবার আগেই সরলা ছুটি পাইল। ইংরেজের জেলও
যাহার প্রতি অকরুণ, তাহার একমাত্র সান্ত্বনা মৃত্যু। সরলার জেল
হইয়াছে জানিতে পারিয়া, কিছুদিনের জন্যও যে সে দূরে

থাকিবে ভাবিয়া নীরজা সুখী হইয়াছিল। সরলার অপ্রত্যাশিত আগমনে তাহার সেই শেষ ঐহিক সান্ত্বনা দূর হইল, সরলা ও মৃত্যু এক মুহূর্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীর অধিকার কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না—এই শেষ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে করিতে নীরজা অব্যক্তে প্রস্থান করিল। দুই বোন গল্পের সুখ-সমাপ্তি এখানে নাই, দুই বোনে লেখক সন্তর্পণে 'নটে গাছটি মুড়াইয়া' গল্প ও তত্ত্বকে যুগপৎ রক্ষা করিয়াছেন; এখানে 'নটে গাছ' ঝড়ে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, লেখকের সযত্ন করবিন্যাসের অপেক্ষা রাখে নাই; গল্পটি শেষ মুহূর্তে কবির পরিকল্পিত তত্ত্বের প্যাটার্ন ছিন্ন করিয়া প্রত্যাশিত মানবিক ট্র্যাজেডিতে পরিণত হইয়াছে; তাত্ত্বিক যেন আপন অনভিপ্রায়ে শিল্পীর নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়াছে; যাহা একটি সুষ্ঠুতত্ত্ব প্যাটার্ন হইতে পারিত তাহা দুঃসহহৃদয়তাপোৎসারিত শিল্পমূর্তি লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন যে, আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে মালঞ্চই অবিসংবাদী-রূপে শ্রেষ্ঠ।

দুই বোন ও মালঞ্চ একই তত্ত্বের প্যাটার্নভুক্ত হইলেও, চরিত্র-পরিকল্পনায় একই তত্ত্বের ইঙ্গিত অনুসরণ করিলেও, দু'য়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। শশাঙ্ক ও আদিত্য একই ধাতুতে, একই ছাঁচে গড়া; দু'জনেই উদাস পুরুষ, দু'জনেই মা-জাতীয় রমণীর স্বামী, আর দু'জনের মনেই প্রিয়া-জাতীয় রমণীর স্পর্শের কাতরতা, প্রথম সুযোগেই তাহারা সেই অভাব পূরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বস্তুত তাহাদের চরিত্র সমান ছাঁচে ঢালাই করা। ব্যবসায়ে একজন ইঞ্জিনীয়ার, আর একজন ফুলওয়ারী, দু'য়ে যেটুকু তফাত সে ঐ ভিন্ন ব্যবসায়ের সূত্রে আসিয়াছে; সে প্রভেদ নিতান্তই গৌণ, মৌলিক নয়।

শর্মিলা আর নীরজা মা-জাতের মেয়ে, যেমন ঊর্মিমালা ও সরলা প্রিয়া-জাতের; তবু ওদের মধ্যে প্রভেদ আছে। শর্মিলার

আগাগোড়াই মা-জাতের, প্রকট বা প্রচ্ছন্ন প্রিয়া-জাতের কোনো লক্ষণই তাহার চরিত্রে লেখক দেখান নাই। নীরজার কিন্তু এমন অবস্থা নয়। শয্যাগ্রহণের পূর্বে সে প্রিয়া-জাতীয় ছিল, প্রিয়ার স্পর্শে আদিত্যের মালঞ্চ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু নীরজার সে সৌভাগ্য দীর্ঘকাল থাকিল না; দীর্ঘ দুরারোগ্য রোগে তাহার প্রিয়া-সত্তায় ভাঁটা পড়িল, গুপ্ত মাতৃসত্তা জাগিয়া উঠিল; রুগ্‌ণা পত্নী স্বামীর প্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা আর মিটাইতে পারিল না। শয্যাশ্রয়ী সতর্কতার দ্বারা কোনোক্রমে স্বামীর মাতৃরসের অতৃপ্তি পূরণ করিতে চেষ্টা করিল; পুরুষের চিত্তে প্রিয়ার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে মাতৃরসের আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই দুর্বল।

ঊর্মিমালা প্রিয়া-জাতীয় রমণীর আদর্শ, পুরুষের চিত্তকে সে যেমন নাড়া দিতে সক্ষম, স্বামীর চিত্তকে তেমন স্বস্তি দিতে পারিবে কি না সন্দেহ। তাহার তুলনায় সরলার রঙ ও রস অনেক কোমল, অনেক মধুর। তবু সে প্রিয়া-জাতীয় ছাড়া আর কিছু নয়। তবে ঊর্মিমালার মতো সাংসারিক সুখ সৌভাগ্য স্বাচ্ছন্দ্যের শিখরে শিখরে সে লালিত নয় বলিয়া তাহার গতিতে দ্বিধা আছে, মনে উৎকণ্ঠা আছে, হাবেভাবে ভীরুতা আছে; আর এই-সব দ্বিধা, উৎকণ্ঠা ভীরুতাই আদিত্যের চোখে তাহাকে মধুরতর, অধিকতর রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। উভয় কাহিনীতেই পুরুষচিত্তের অধিকার লইয়া প্রিয়া-জাতীয় মাতৃ-জাতীয় রমণীর দ্বন্দ্ব; জয়পরাজয় নানা অবান্তর ঘটনার উপরে নির্ভর করে, সেটা মুখ্য নহে, মুখ্য ঐ বিচিত্র দ্বন্দ্বটা।

এই দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রসাহিত্যে নূতন নয়, এবং রূপান্তরে ইহা তাঁহার মূল ভাবধারার অন্তর্গত। এবারে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

একই রমণীতে প্রিয়া ও জায়াকে পাওয়া যায় কি না, জায়া ও পুত্রের-জননীকে লাভ করা সম্ভব কি না, প্রেম ও বিবাহের স্বরূপ ও স্বাদ রক্ষা করিয়া, সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সংসারে চলা সম্ভব

কি না—এ বিষয়ে মানুষ চিরকাল চিন্তা করিয়া আসিতেছে। শেক্সপীয়র এক রকম উত্তর দিয়াছেন, দান্তে ও আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিগণ আর-এক রকম উত্তর দিয়াছেন, আবার কালিদাস শকুন্তলাকাব্যে তাঁহার উত্তর লিখিয়াছেন। কালিদাসের অভিজ্ঞতা এই যে, প্রিয়াই জায়াতে পরিণত হয়, জায়াই কালক্রমে পুত্রের জননীতে চরিতার্থতা লাভ করে। এ বিষয়ে অধিক ব্যাখ্যার স্থান নাই, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে কালিদাসীয় প্রেমতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই তত্ত্বকে "জায়া-জননী-বাদ" বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের জায়া-জননী-বাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রেমতত্ত্বের মূলে আছে জায়া-জননীবাদ। তাঁহার প্রেমতত্ত্বের নাম "প্রণয়িনী-গৃহিণীবাদ" বলা চলিতে পারে। চিত্রাঙ্গদাকাব্য প্রণয়িনী-গৃহিণী-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রণয়িনী চিত্রাঙ্গদাই কালক্রমে গৃহিণী চিত্রাঙ্গদায় পরিণত হইল, জায়ার জননীত্বে উপস্থিতিতে চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সমাপ্তি। কিন্তু চিত্রাঙ্গদাকাব্যের পৌরাণিক পরিবেশে যে সিদ্ধান্তকে কবি গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাস্তব সংসারের পরিবেশে তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আমার শেষের কবিতা প্রবন্ধে তাহার বিশদ আলোচনা আছে—এখানে উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট। সংসারে প্রিয়া ও গৃহিণীকে সাধারণ নিয়ম হিসাবে একত্র পাওয়া যায় না ইহাই অমিতের ধারণা—ইহাকে কবির ধারণা বলিয়াও গ্রহণ করিতে হইবে। শেষের কবিতায় যাহা তত্ত্বত স্বীকৃত, দুই বোন ও মালঞ্চে তাহা কার্যত গৃহীত হইয়া সূত্রাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রিয়া বসন্ত ঋতু, মাতা বর্ষা ঋতু; দুই-ই মানবজীবনের এক ও অখণ্ড অভিজ্ঞতাচক্রের অঙ্গীভূত হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন, দুই এক নহে। কাজেই প্রণয়িনী ও গৃহিণী এক রমণীতে পাওয়া সম্ভব নয়, কেননা, বিধাতা দুটিকে স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়াছেন, দুয়ের স্বাদ ও সত্তা ভিন্ন, ইহাই যেন কবি বলিতে চান।

প্রেম ও বিবাহ, দু'য়ের স্বাতন্ত্র্য ও স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংসারে পাওয়া সম্ভব নয়, ইহাই যেন কবির অভিপ্রায়। তাই যদি হয়, তবে রবীন্দ্রসাহিত্যের মূলতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। "সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা"— ইহাই রবীন্দ্রসাহিত্যের মূলতত্ত্ব। প্রেম অসীম, কারণ প্রেম একটা মানসিক ভাব মাত্র, বিবাহ সীমাবদ্ধ, কারণ বিবাহ একটা সামাজিক সংস্কার মাত্র—দু'য়ে সম্পূর্ণ মিলন সম্ভব নয়। তবে কি কবি, দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার অন্তে ইহাই স্বীকার করিতে উদ্যত যে, সীমা ও অসীমের মিলন জীবনের সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়? সীমা ও অসীমের মিলন জীবনের যত ক্ষেত্র সম্বন্ধে সত্য হইবে তত তাহার গুরুত্ব; আংশিক মাত্র সত্য হইলে পূর্ণ জীবনতত্ত্ব হিসাবে তাহার গুরুত্ব হ্রাস পায়; প্রেম ও বিবাহ লইয়াই মানবজীবনের প্রধান অংশ গঠিত, সেখানে সীমা ও অসীম তত্ত্ব যদি প্রযোজ্য না হয়, তবে সেই পরিমাণে তাহার মূল্য কমিয়া আসে। কমিয়া আসুক আর নাই আসুক, উহাই রবীন্দ্রসাহিত্যের মূলতত্ত্ব। সীমা ও অসীম বারংবার পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া যাইতেছে,—কিন্তু তাহারা পরস্পরের মধ্যে আত্মবিলোপ করিয়া সম্পূর্ণ মিলিত হইতে পারিতেছে না—রবীন্দ্র-সাহিত্যে ইহাই লক্ষিত হইবে। এই অসম্পূর্ণ মিলন-প্রয়াসেই এই তত্ত্বের যথার্থ মূল্য, সম্পূর্ণ মিলনসাধনে নয়। কি জীবনে, কি সাহিত্যে ইহা তত্ত্বত স্বীকৃত হইয়াও কার্যত সার্থক হইয়া ওঠে নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। বরঞ্চ শেষের দিকে দেখি আজন্ম-লালিত এই তত্ত্বের মধ্যেও যেন দ্বিধার সঞ্চার হইয়াছে।[১]

১ শেষের কবিতা, বাঁশরী, দুই বোন, মালঞ্চ প্রভৃতি রচনায় এই দ্বিধার ভাবটি খুব স্পষ্ট, যতই শেষের দিকে আসিয়াছে দ্বিধা ততই প্রবল। বাঁশরীতে প্রেম ও বিরহের পার্থক্যের উপরে খুব বেশি ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে; দুই যে মিলিত হইতে পারে না, মিলিত হইলে জীবনব্রত নষ্ট হইয়া যায় ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে এ কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। দুই বোনের প্রকাশ ১৯৩৩ সাল আর বাঁশরী ও মালঞ্চ প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৩৪

দুই বোন, মালঞ্চ প্রভৃতি রচনা রবীন্দ্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন না হইতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রতত্ত্ব-বিচারপ্রসঙ্গে ইহারা একান্ত অপরিহার্য।

৪

চার অধ্যায় প্রকাশিত হইবামাত্র পাঠকসমাজে হুলস্থূল পড়িয়া যায়, অপাঠক-সমাজও তাহাতে যোগ দিয়াছিল। সকলেরই মত এই যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের 'অগ্নিযুগ' সম্বন্ধে অবিচার করিয়াছেন, আর 'আভাসে' ব্রহ্মবান্ধবের উক্তি প্রকাশ করিয়া সুবিবেচনার কাজ করেন নাই। এই প্রতিবাদ এমনই প্রবল হইয়াছিল যে, পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থের 'আভাস' অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পাঠকসমাজ 'আভাস' অংশ লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কাহিনী-অংশের প্রতি মনোযোগ দিবার সময় তাহাদের ছিল না, রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ত' প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও যে কাহারো দৃষ্টি এদিকে পড়িয়াছে তাহা মনে হয় না।[১]

চার অধ্যায়ে প্রকাশিত কবির মন্তব্যটা কী আগে দেখা যাক্, পরে গল্পাংশের বিচার করিলেই চলিবে। চার অধ্যায়ের তত্ত্ব সূত্রাকারে 'আভাসে' লিপিবদ্ধ, আগেই এ কথা বলিয়াছি। ব্রহ্মবান্ধবের উক্তিতে তাহা সংক্ষেপে সূত্রাকারে বর্তমান—"রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।"

অতীন্দ্র নিজের কার্যকলাপ এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া বারংবার

সালে, একই বাংলা বৎসরের অগ্রহায়ণ ও চৈত্র মাসে। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে যাঁহারা নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাঁহাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, নিজের জীবনদর্শন সম্বন্ধে সমালোচকদের মতো কবি এত বেশি নিশ্চিত ছিলেন না। এই রচনাগুলি তাহার প্রমাণ।

১ অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চার অধ্যায় সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অবিবেচনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না।

উহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছে। "কী না করতে পারি আমি! পড়েছি পতনের শেষ সীমায়।…ইতিমধ্যে ভয় কোরো আমাকে, আমি নিজে ভয় করি আমার মৃত আত্মার কালো ভূতটাকে।"

ইহা এলাকে হত্যা করিবার ভূমিকা। এলাকে সে কেন খুন করিল? বটুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য, না দলের অস্তিত্বকে রক্ষার জন্য? যে কারণেই হোক অতীন্দ্রের চক্ষে ইহা পতনের লক্ষণ এবং খুব সম্ভব তাহার মত ভ্রান্ত নয়।

ইন্দ্রনাথকে অসাধারণ করিয়া আঁকিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহার চরিত্রও পতনের ঊর্ধ্বে নয়, বরঞ্চ অতীন্দ্রের চেয়ে পতনের কলঙ্ক তাহার বেশি বই কম নয়। অতীন্দ্রের মনে অনুশোচনা আছে, ইন্দ্রনাথে তাহা দেখি না। কানাই গুপ্ত তাহার স্বাভাবিক সরসতা সত্ত্বেও পতিত, নিজেই সে প্রকারান্তরে অনেকবার স্বীকার করিয়াছে —আর বটু কোথায় নামিয়া পড়িয়াছে সকলেই জানে। ফল কথা, পথটাই নিম্নমুখী এবং পিচ্ছিল। সেই পথে কেহ দ্রুত, কেহ ধীরে, কেহ অগোচরে, কেহ সগোচরে নীচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে; ইহা ব্যক্তিবিশেষের স্বভাব তেমন নয়, যেমন পথের ধর্ম; মানুষের মানসিক জগতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিরন্তর সক্রিয়।

বাংলা দেশের তথাকথিত 'অগ্নিযুগ' সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মত প্রকাশের সময় এখনও আসে নাই, কিন্তু একদিন সে মত প্রকাশ করিতেই হইবে। হত্যায় মানুষকে হীন করিয়া ফেলে, গুপ্ত হত্যায় হীনতর করে; ধর্মের নামে, কর্তব্যের নামে যখন সেই গুপ্তহত্যা চলে তখন পরিত্রাণের পথটাই বন্ধ হইয়া যায়। যে সমাজে এইরূপ গুপ্তহত্যার প্রশ্রয় থাকে, ব্যাপকভাবে সে সমাজের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী; আশু ফললাভের আশাতে এইরূপ কাণ্ড চলিলে আশু ফল ক্রমেই অধিকতর প্রাংশুলভ্য হইয়া পড়ে। মানুষের স্বভাব মূলত এরূপ গুপ্তহত্যার অনুকূল নয়, কিন্তু সে যখন ঐরূপ কাজে নামে, জোর করিয়া নিজের স্বভাবকে বিকৃত

করিতে হয় ; এইরূপ বিকার সমাজের বহুলোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে তাহার প্রতিক্রিয়া সমাজের উপরে কখনোই শুভ হয় না। এমন-কি, হত্যা যেখানে গুপ্ত নয়, সেখানেও মানুষের মন প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। এ কথা মহাভারতকার জানিতেন, সেইজন্য ভারত-যুদ্ধের প্রারম্ভে, শিল্পত অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাঁহাকে একখানা আস্ত গীতা প্রক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতযুদ্ধজয়ী পাণ্ডবদের মন অনুশোচনার উর্ধ্বে ছিল না, প্রমাণ অশ্বমেধযজ্ঞ ও বহু দুঃখে বিজিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থানের পথে অনন্ত প্রয়াণ।[১]

কাজেই রবীন্দ্রনাথ চার অধ্যায়ের যে শোচনীয়তা দেখাইয়াছেন তাহাতে তিনি ভারতীয় চিন্তাধারার মূল পথটার উপরেই দণ্ডায়মান ; তাঁহার পূর্বসূরি স্বয়ং মহাভারতকার আর লৌকিক ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র। অথচ এ পর্যন্ত মহাভারতকার ও বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ দোষী বা দায়ী করে নাই। আর বাংলা দেশের তথাকথিত 'অগ্নিযুগ' গীতা, আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'অগ্নিযুগে'র হোতাগণ গীতা ও বঙ্কিমী উপন্যাসদ্বয়ের Ideal ও Romanticism-এ এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাহাদের প্রকৃত শিক্ষাকে এবং ফলশ্রুতিকে গ্রহণ করেন নাই, কিংবা সেদিকে তেমন করিয়া মনোযোগও দেন নাই। তবে যে তাঁহারা বা 'অগ্নিযুগে'র সমর্থকগণ চার অধ্যায়ের প্রতি এমন বিরূপ হইলেন তাহার কারণ, শেষ পর্যন্ত নিজেদের মনের মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যর্থতা তাঁহারা বহন করিতেছিলেন, সেই frustration বা ব্যর্থতা এখন তাঁহারা চার

---

১ বঙ্কিমচন্দ্র গীতার নিষ্কামকর্মের শিক্ষাকে আরোপ করিয়া উপন্যাসত্রয় লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানেও শেষ পর্যন্ত অনুশোচনাটাই প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। আনন্দমঠ ভাঙিয়া পড়িয়াছে—বাহিরের আঘাতে নয়, অন্তরের অনুশোচনায়। নিষ্কাম ধর্মের দীক্ষাদাতা ভবানী পাঠক ধরা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। সীতারামের পরিণাম ভয়াবহ। এই-সব উদাহরণের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র যেন ইহাই বলিতে চান যে, লৌকিক ক্ষেত্রে নিষ্কাম হত্যার ফলাফল শুভসূচী হয় না।

অধ্যায়ের লেখকের উপরে চাপাইয়া দিয়া নিজেরা নিষ্কৃতি লাভের শেষ চেষ্টা যেন করিয়াছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে প্রাতকূল মত প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সঞ্চিত প্রতিকূল মতেরই প্রক্ষেপমাত্র—বিশেষ, যখন দেখি যে, চার অধ্যায়ের পূর্বসূত্র ঘরে বাইরে, তাহারও পূর্ব সূত্র আবার গোরা। এই তিনখানিতে মিলিয়াই দেশহিতব্রত-সাধন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতের পূর্ণ অভিব্যক্তি। চার অধ্যায়ের তত্ত্ব বীজাকারে গোরাতে, অঙ্কুরাকারে ঘরে বাইরেতে বর্তমান, গুপ্ত পন্থার সমর্থন কোথাও পাওয়া যাইবে না। আর মহাভারতের, আনন্দমঠের, দেবীচৌধুরাণীর গ্রন্থের পরিণাম যদি শোচনীয় হয়, 'অগ্নিযুগে'র অবসানে বাংলা দেশের অবস্থা যে অন্যরূপ হইবে এরূপ আশা করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

৫

চার অধ্যায়ের কাহিনী-অংশের প্রতি সাধারণের তেমন মনোযোগ পড়ে নাই—ইহা আগে একবার বলিয়াছি। কাহিনীটি পড়িলে এই ধারণাই হয় যে, রবীন্দ্রনাথ এখানে অপরিচিতক্ষেত্রে, নিজ অভিজ্ঞতার বাহিরে পা ফেলিয়াছেন।[১]

কাহিনীর মূল পরিবেশ, গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপের পদ্ধতি ও সেই জীবনের আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে জনশ্রুতিমাত্র। জনশ্রুতির উপরে ভরসা রাখিয়া চলিতে গেলে যাহা হয় তাহাই হইয়াছে। পরিচয়ের অভাবকে পূরণ করিবার আশায় তাঁহাকে 'মেলোড্রামা' এবং অতিশয়োক্তির অবতারণা করিতে হইয়াছে। অতীন্দ্র-কর্তৃক এলাকে হত্যার ঘটনা নিতান্ত অবাস্তব বলিয়া বোধ হয়, এই অবাস্তবতার বাহ্যরূপ মেলোড্রামা। আর শুধু ঐখানে

১ তুলনীয় শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর কাহিনী। শরৎচন্দ্রও এখানে পরিচয় ও অভিজ্ঞতার বাহিরে পদার্পণ করিয়াছেন।

মাত্র নয়, কানাই গুপ্তর চায়ের দোকানের দৃশ্যটিও মেলোড্রামার রকমফের। এ-সব স্থান ও ঘটনা রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত নয়, কাজেই পরিচয়ের অভাবকে ঢাকিবার উদ্দেশ্যে গলা চড়াইয়া অতিশয়োক্তি করিতে হইয়াছে। উদাহরণ, চায়ের দোকানের বর্ণনা এবং তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে বর্ণিত অতীন্দ্রের গুপ্ত বাসভবনের বিবরণ। দুটি চিত্রই সত্য, কিন্তু রঙের বাড়াবাড়িতে সত্যের যাথার্থ্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়। বাস্তব নিজেকে প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে এত বেশি সাজগোজ করিয়া হাজির হয় না। বাস্তবের মাত্রা সম্বন্ধে যাহার মনে অনিশ্চয়তা আছে তাহাকে চারিদিক ঘাঁটিয়া প্রমাণপত্র আনিয়া উপস্থিত করিতে হয়। যুক্তি যেখানে দুর্বল, গলার স্বর সেখানে স্বভাবতই প্রবল হইয়া ওঠে।[১] এত বেশি সাজাইয়া বর্ণনা না করিলে এ-সব দৃশ্যে পাঠকের বিশ্বাস আরও বেশি জমিয়া উঠিত। দুটি দৃশ্য সম্বন্ধে যাহা সত্য সমস্ত কাহিনীটি সম্বন্ধেও তাহা অল্পবিস্তর সত্য।

অতীন্দ্রের অবস্থায় অতীন্দ্রের মতো ব্যক্তি পড়িলে খুব সম্ভব ঐভাবেই কাজ করিত, কিন্তু তাহার বাস্তব প্রকাশ ঐরূপ হইত কিনা সন্দেহ। এলা সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের আধেয়ে ভেজাল নাই, যত গোল করিয়াছে আধারটাতে। রবীন্দ্রনাথের মতে—

"নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপরে নির্ভর করে তা নয়, চারিদিকের ঘাত-প্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝরপ্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষ রূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, এক দিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ, আর-একদিকে তার বাহিরের সংবাধ।

১ রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' নামে প্রসিদ্ধ কবিতাটির প্রারম্ভেও এইরূপ বাস্তবের অতিশয় রূপ অঙ্কিত হইয়াছে।

এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র চিত্তের বৈশিষ্ট্য। এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মূর্তিমান করতে চেয়েছি। তাদের স্বভাবের মূলধনটাও দেখাতে হয়েছে, সেই সঙ্গেই দেখাতে হয়েছে যে-অবস্থার সঙ্গে তাদের শেষ পর্যন্ত কারবার করতে হ'ল তারও বিবরণ।"[১]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ মূলত ঠিক। আধার ও আধেয়ের যথার্থ সমাবেশেই সত্য রূপগ্রহণ করে। কিন্তু যেখানে এ দুয়ের সুষ্ঠু সমাবেশ না হয় সেখানে সত্যের রূপ কি বিকৃত হয় না? নারিকেলের মালার যোগ্য আধেয় নারিকেলের জল, উত্তম পানীয়, কিন্তু তাহাতে অমৃত রক্ষা করিলে সত্যোপলব্ধি ঘটিবে কি? সত্যের নির্গুণ মূর্তি বলিয়া কিছু নাই, আধারের প্রসঙ্গেই তাহা সত্য। এখানে যে আধার রবীন্দ্রনাথ নির্বাচন করিয়াছেন তাহা জনশ্রুতির হাত হইতে সংগৃহীত, তাহার আব্‌ছায়া প্রসঙ্গে সত্যের মূর্তি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পাঠকের বিশ্বাসযোগ্য হইবার জন্য যেমন উজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক তেমন হইয়া ওঠে নাই।

চার অধ্যায় কাহিনীর নায়ক-নায়িকা অতীন্দ্র ও এলা, আর ইহার অতিনায়ক ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়; কিংবা জনশ্রুতি যতটা সত্য, যতটা মিথ্যা, সে ততখানি সত্য ও মিথ্যা, ইন্দ্রনাথ কল্পনার আতস কাচের মাধ্যমে সংহত জনশ্রুতির রশ্মি। সমস্ত কাহিনীটির উপরে সে গ্রীক নাটকের 'দেবযন্ত্রে'র মতো প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এমন একটা নির্গুণপ্রায় যন্ত্রের সহিত হৃদয়ের যোগাযোগের পথ থাকিতে পারে না। ইন্দ্রনাথ পাঠকের বিস্ময় আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু পাঠকের হৃদয়ের উপরে তাহার কোনো দাবি নাই।

১ গ্রন্থপরিচয়, চার অধ্যায়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩শ খণ্ড

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কয়েকটি রচনায় যে তিক্ততা, যে তীব্রতা, যে নিদাঘদাহ পাই আগের দিনের রচনায় তাহা বিরল। বাঁশরী, মালঞ্চ, চার অধ্যায়, তিন সঙ্গী প্রভৃতি রচনার কথাই ভাবিতেছি। প্রত্যেকটি রচনা যেন লেখকের কোন্ অবচেতন মনের তৃষ্ণার ও অতৃপ্তির উপাদানে গঠিত। এই-সমস্ত রচনার শেষে পাঠক যেন একটা নিদাঘদাহময় তেপান্তরের মাঠের মধ্যে আসিয়া হাজির হয়। রবীন্দ্র-শিল্পে ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। রবীন্দ্রনাথের শিল্পধর্ম এরূপ পরিণামসূচী নয়, সাধারণত তাহার রচনার এরূপ পরিণাম ঘটে না। চোখের বালিতে জ্বালাময় উপসংহারের যথেষ্ট অবকাশ ছিল, বরঞ্চ সেই রূপই প্রত্যাশিত, কিন্তু লেখক সে রূপ হইতে দেন নাই; সমস্ত ক্ষোভ ও বেদনার উপরে ক্ষমার ক্ষৌমবস্ত্র টানিয়া দিয়াছেন। নৌকাডুবি, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ প্রত্যেক উপন্যাসেই যে জ্বালা ও বেদনা প্রত্যাশিত লেখক শান্তিবারি আহরণ করিয়া তাহার উপরে ঢালিয়া দিয়াছেন, আর গল্পের মধ্যে সম্ভাবনা না থাকায় সে শান্তিবারি তাঁহার আপন হৃদয় হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এই ধারা দুই বোন পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। শর্মিলার মনের অবস্থা নীরজার মতো হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু না, সে মেয়ে-ঘটক সাজিয়া স্বামী ও বোনের বিবাহ দিতে উদ্যত হইল! এ না স্বভাবসঙ্গত, না শিল্পসঙ্গত। তবে যে এমন হইল, তাহার কারণ রচনার পরিণামে দাবদাহ রবীন্দ্রনাথের কাব্য নয়। ইহাই রবীন্দ্র-শিল্প সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম। কিন্তু দুই বোনের পর ব্যতিক্রম শুরু হইয়াছে, আর সে ব্যতিক্রম একাধিক। হঠাৎ এমন হইতে গেল কেন? এই-সব রচনায় দেখা যাইবে যে, সীমা ও অসীমের গাঁঠছড়া খুলিয়া গিয়াছে—যুক্তবেণী আবার মুক্তবেণী। চিরজীবনের

সযত্নলালিত আদর্শের ভিত্তি শিথিল হইবার ফলেই কি এই জ্বালা ও তিক্ততা? না অপর কোনো কারণে জ্বালা ও তিক্ততা—যাহার একটা লক্ষণ জীবনতত্ত্বে কবিমুষ্টির শিথিলতা? বিষয়টা অনুধাবনযোগ্য। কারণ যাহাই হোক, কার্যত দেখিতে পাইতেছি যে, বহু নদনদীর যুক্তবেণী গঙ্গা যেমন সমুদ্র-সমীপে সমাগত হইয়া পুনরায় বহু নদী-মালায় আত্মমুক্তি ঘটাইয়া মহামুক্তির সন্ধানে ধাবিত, কবির জীবনেও তেমনি যেন একটা লীলা ঘটিয়া গিয়াছে; সুসংহত সীমা ও অসীমের যুক্তবেণী শান্তিপারাবারের সম্মুখে আসিয়া মুক্তবেণীতে পরিণত। শেষ জীবনের রচনা-কয়েকটিতে তাহারই চিহ্ন—আর এই কারণেই রচনাগুলির সমধিক গুরুত্ব।

৭

আগেই বলিয়াছি যে, এই উপন্যাসগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিকের দায়িত্বের প্রতি তেমন সচেতন নন, তত্ত্ববিশ্লেষণেই তাঁহার প্রকৃত আগ্রহ। কিন্তু যেখানে তিনি ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন—কাহিনীর বিবৃতিতে নয়, মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে—সেখানে তাঁহার তুলনা নাই; ও-সব কথা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই লিখিতে পারিতেন। সরলার গ্রেফতার-সংবাদে তাহার প্রতি নীরজার উদ্বেলিত দরদ, সে যেন একপ্রকার কৃতজ্ঞতা; সরলার সম্বন্ধে নিজের মন পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া একপ্রকার আত্মপ্রসাদ অনুভব সে তো নিজের মনের সঙ্গে ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পর হঠাৎ সরলার আবির্ভাব। তরঙ্গ যেমন চূড়ান্তে উঠিয়া কলধ্বনিত অশ্রুশীকরে ভাঙিয়া পড়ে, তেমনি করিয়া নীরজার বিলপিত বেদনাশ্রুপাতের সঙ্গে অভিশাপবর্ষণ ও মহাপ্রয়াণ—এ চিত্র এমনভাবে আর কে আঁকিতে পারিত? নীরজার সমস্ত আত্মত্ব মালঞ্চটার সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছিল, সেই মালঞ্চের মাধ্যমে অপসৃয়মাণ সংসারকে ব্যাকুলভাবে আঁকড়াইয়া ধরিবার প্রয়াস। এই

দেবযানী

রবীন্দ্রনাথ বিদায়-অভিশাপ-এর মূল কাহিনীটি মহাভারতের কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। মূল কাহিনীর রূপান্তরকালে একাধিক গৌণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, কচের ব্যবহারে পুরুষোচিত মর্যাদা ও সম্ভ্রম দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু দেবযানীর চরিত্রে কোনো পরিবর্তন কবি করিতে পারেন নাই, করিবার প্রয়োজনও ছিল না; দেবযানীর উদ্দেশে যেন তিনি বলিয়াছেন, 'যেমন আছ তেমনি এসো।' মহাভারতের কাহিনীটি কতকাল আগে কল্পিত হইয়াছিল জানি না, ধরা যাক, পাঁচ হাজার বৎসর, এই সুদীর্ঘ-কালের মধ্যে দেবযানীর কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। সে আজও যেমন আধুনিকা, সেদিনও তেমনি আধুনিকা ছিল। সে প্রাচীনতম আধুনিকা—দেবযানী সব চেয়ে পুরাতন 'মডার্ন উয়োম্যান'।

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা প্রভৃতি যে-সব নারীকে আমাদের দেশে আদর্শ বলা হয়, দেবযানী কোনোক্রমেই তাঁহাদের দলভুক্ত নয়। তাহাকে আদর্শ পত্নী, আদর্শ প্রণয়িনী বা আদর্শ মাতা বলিবার উপায় নাই, সে আদর্শ-হীনতায় আদর্শ। দুর্দাম প্রণয়-পিপাসা তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, কোনো বাধাই সে মানিতে প্রস্তুত নয়, বেচারী কচ কোনোরকমে পালাইয়া বাঁচিয়াছে। কিন্তু সকলের ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটে নাই। শর্মিষ্ঠার কৌশলে সে একটি কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, অনুকম্পাবশত যযাতি তাহাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া তুলিল; অমনি দেবযানী বলিয়া বসিল—এবারে আমাকে বিবাহ করো, আমার পাণিগ্রহণ তো করিয়াছ। হাতে ধরিয়া টানিয়া তুলিলে যে পাণিগ্রহণ করা হয়—বেচারী যযাতির তাহা জানা ছিল না, এমন হইলে কে আর পরোপকারে

প্রবৃত্ত হইবে! এরূপ ব্যবহার নিশ্চয় নারীত্বের আদর্শ নয়। কিন্তু নাই বা হইল আদর্শ। প্রাচীন ভারতের নারীসমাজের মধ্যে সে সম্পূর্ণ একক! কোনো পুরুষের তাহাকে ভালো না লাগিলে বুঝিতে হইবে সে সম্পূর্ণ পুরুষ নয়। পৌরুষের পরীক্ষার স্থল দেবযানীর চরিত্র। তাই বলিয়া তাহাকে বিবাহ! না, সেরূপ বলিতেছি না। ভালো লাগা ও ভালোবাসা এক পদার্থ নয়।

কচ দেবযানীকে ভালোবাসিত, কিন্তু তাহার তো স্বাধীনতা ছিল না; সঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া তাহাকে স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে হইবে, দেবযানীকে লইয়া ঘর পাতিয়া বসিলে তাহার চলিবে না। শুক্রাচার্যের তপোবন হইতে কচের বিদায়মুহূর্ত সমাগত, দেবযানীর নিকটে সে বিদায় লইতে আসিয়াছে। দেবযানী এই ক্ষণটির জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। সে একেবারে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো হতভাগ্য কচের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। প্রথমেই লাফটা দেয় নাই, কিছুক্ষণ শিকারের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল, কিছুক্ষণ শিকারের চারিদিকে চক্রাকারে আবর্তন করিয়াছিল, কিছুক্ষণ সে অগ্রিম শিকারসুখ অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু কচ পালাইবার উদ্দেশ্যে পা তুলিবামাত্র বাঘিনী তাহার ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িল—তাহার অন্তস্তমতল হইতে আর্ত হুঙ্কারে নিঃসৃত হইল—

ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে। এ বন্ধন নারিবে কাটিতে।
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে।

নিঃসৃত হইল—

আজ মোরা দোঁহে একদিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহো সখা চিনে
যারে চাও। বল যদি সরল সাহসে
'বিদ্যায় নাহিকো সুখ, নাহি সুখ যশে,

দেবযানী, তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্তিমতী—
তোমারেই করিনু বরণ,' নাহি ক্ষতি,
নাহি কোনো লজ্জা তাহে। রমণীর মন
সহস্রবর্ষেরই সখা, সাধনার ধন।

দেবযানীর এই স্পর্ধিত আহ্বান, এই উদ্ধত অভিনয়, নারী-মহিমার এই অভ্রভেদী গৌরীশৃঙ্গ অকস্মাৎ উর্ধ্বোত্থিত হইয়া স্বর্গ-লোককে কি ঈর্ষাময় বেদনার শূলে বিদ্ধ করে নাই? এই মুহূর্তে দেবযানীর যে বিরাট স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার দিকে তাকাইবার উপায় কি? কঠিন তুষারপুঞ্জে প্রতিফলিত রবিরশ্মির মতো চোখ ধাঁধাইয়া দেয়। সত্যই ইন্দ্র আর ইন্দ্র নহে, দেবযানী তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার সিংহাসনখানি দখল করিয়া বসিয়াছে।

কচ তাহাকে কত রকমেই-না ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কর্তব্যের আহ্বান, ধর্মের ব্রত, পুরুষের আদর্শ! কিন্তু না, দেবযানী ভুলিবার নয়। অবশেষে কচকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে সে দেবযানীকে ভালোবাসে—তাই বলিয়া বিবাহ! না, তা হইবার নহে। কিন্তু 'প্লেটোনিক প্রেমে' ভুলিবার পাত্রী দেবযানী নহে। সে যে নিতান্ত মৃন্ময়ী—মাটির সমস্ত দোষ এবং সমস্ত গুণে তাহার দেহ নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে। সে জানে, সংসারে যেটুকু হাতে হাতে পাওয়া গেল সেইটুকুই যথার্থ পাওয়া। তাহার অধিক যাহা সে তো কেবল কল্পনা, সে তো কেবল অনুমান। মৃত্যুর নির্ঝরের ধারে যাহার বাস, দেহের প্রমাণ ব্যতীত তাহার সান্ত্বনা কোথায়? বিধাতা তাহাকে গড়িবার সময়ে মাটি ছাড়া আর কোনো উপাদান ব্যবহার করেন নাই। যখন সে দেখিল কচ নিতান্তই বিদায় হইবে, তাহার মোহে কিছুতেই ধরা দিবে না, তখন আহত নারীচিত্তের সমস্ত আক্রোশ ও ঈর্ষা, সমস্ত অবলুণ্ঠিত মহিমা ও ব্যর্থ প্রণয় বজ্রাগ্নিপরিপূর্ণ একখানি মারাত্মক বিদ্যুতের প্রচণ্ডতায় তাহার মাথার

উপরে ভাঙিয়া পড়িয়াছে—

তোমা-’পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ; তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ;
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

এই চরিত্র ও ব্যবহার নিশ্চয়ই আদর্শ নয়—কিন্তু তবু যে এত ভালো লাগে, তার কারণ মানুষ আদর্শকে ভক্তি করে, আর ভালো-বাসিবার বেলায় অনেক সময়েই আদর্শকে বাছিয়া লয়। মর্তবাসী আমরা দেবযানীর দুঃখের ভাগী, তাহাকে কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু দূর হইতেই বোঝা ভালো, নতুবা কূপ হইতে হাত ধরিয়া তুলিলে পাণিগ্রহণ করিবার জন্য যে মেয়ে জেদ করিয়া বসে তাহাকে দূর হইতে ভালোবাসাই বুদ্ধিমানের কাজ।

দেবযানীর অনুরূপ প্রাচীন সাহিত্যে বিরল বলিয়াছি—রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাহার একটি জুড়ি আছে। সে বাঁশরী নাটিকার নায়িকা —“শ্রীমতী বাঁশরী সরকার বিলিতি য়ুনিভার্সিটিতে পাস করা মেয়ে। রূপসী না হলেও তার চলে। তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুত শক্তিতে সমুজ্জ্বল, তার আকৃতিটাতে শান-দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য।” বাঁশরী সরকারের আকৃতি ও প্রকৃতি দেবযানীর উপরে আরোপ করা অন্যায় হইবে না—দুজনেরই ধমনীতে একই রক্তপ্রবাহ বহমান। অবস্থাভেদে বাঁশরী দেবযানী হইয়া উঠিতে পারিত, কালভেদে দেবযানী বাঁশরীতে পরিণত হইয়াছে। বাঁশরী নাটিকা বিদায়-অভিশাপের উপাদানে রচিত—কেবল কালের একটা দুস্তর ভেদের ফলে নাটিকাটি বিদায়-অভিশাপের পরিবর্তে ‘বিদায়ে বরদান’ হইয়া উঠিয়াছে।

বাঁশরী ভালোবাসিত তেজস্বী ক্ষত্রিয় রাজা সোমশঙ্করকে। বিবাহের বাধা ছিল না, কিন্তু বাধা হইয়া দেখা দিলেন সোমশঙ্করের গুরু। সোমশঙ্কর কঠিন ব্রতচর্যায় উদ্যত। গুরুর ভয় বাঁশরীকে বিবাহ করিলে ব্রতের উপরে বাঁশরীর জয়লাভ ঘটিবে, তাই তিনি সুষমা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে সোমশঙ্করের বিবাহ স্থির করিলেন। অভিমানিনী তেজস্বিনী বাঁশরী সোমশঙ্করকে আঘাতদানের উদ্দেশ্যে ক্ষিতীশ ভৌমিক নামে একজন অভাজন সাহিত্যিককে বিবাহ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিল। এমন সময়ে নিজের বিবাহের পূর্ব মুহূর্তে সোমশঙ্কর বাঁশরীর কাছে বিদায় লইবার জন্য আসিয়াছে—

সোমশঙ্কর

তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি আর আমি যা দিয়েছি তোমাকে, এ বিবাহে তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারবে না, এ তুমি নিশ্চয় জানো।

বাঁশরী

তবে বিবাহ করতে যাচ্ছ কেন?

সোমশঙ্কর

সে কথা বুঝতে যদি নাও পারো, তবু দয়া কোরো আমাকে।

বাঁশরী

তবু বলো। বুঝতে চেষ্টা করি।

সোমশঙ্কর

কঠিন ব্রত নিয়েছি, একদিন প্রকাশ হবে, আজ থাক্, দুঃসাধ্য আমার সংকল্প, ক্ষত্রিয়ের যোগ্য। কোনো-এক সংকটের দিনে বুঝবে সে ব্রত ভালোবাসার চেয়েও বড়ো। তাকে সম্পন্ন করতেই হবে প্রাণ দিয়েও।

বাঁশরী

আমাকে সঙ্গে নিয়ে সম্পন্ন করতে পারতে না?

সোমশঙ্কর

নিজেকে কখনো তুমি ভুল বোঝাও না বাঁশি। তুমি নিশ্চিত জানো তোমার কাছে আমি দুর্বল। হয়তো একদিন তোমার ভালোবাসা আমাকে টলিয়ে দিত আমার ব্রত থেকে।...

বাঁশরী

সন্ন্যাসী হয়তো ঠিকই বুঝেছেন। তোমার চেয়েও তোমার ব্রতকে আমি বড় ক'রে দেখতে পারতুম না। হয়তো সেইখানেই বাধত সংঘাত। আজ পর্যন্ত তোমার ব্রতের সঙ্গেই আমার শক্রতা।

কচ ও দেবযানীর সংলাপের সুরটা আলাদা, বিষয়টা বাঁশরী-সোমশঙ্করের সংলাপের অনুরূপ। সোমশঙ্করের ভালোবাসা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া বাঁশরী প্রসন্নমনে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। দেবযানী তাহা পারে নাই। তৎসত্ত্বেও দুজনেই একই ধাতুতে গঠিত। বাঁশরী বিলাতি য়ুনিভার্সিটিতে পাস করা মেয়ে—আর শুক্রাচার্যের কন্যার চরিত্রেও পাশ্চাত্য দেশের উপাদান আছে। বাঁশরী যখন জানিল বিবাহ যাহাকেই করুক সোমশঙ্কর তাহাকেই ভালোবাসে, তখন তাহাকে আঘাত করিবার প্রয়োজন আর রহিল না, ক্ষিতীশ ভৌমিকের সহিত বিবাহের প্রস্তাব সে নাকচ করিয়া দিল। ইহাই বাঁশরী নাটিকার কাহিনী।

দেবযানী ও বাঁশরী অনুরূপমাত্র, একরূপ নয়, তার কারণ বাঁশরী আমাদের আর-সকলের মতোই নীতির জগতের অধিবাসী। এটা ভালো, ওটা মন্দ—এই দ্বন্দ্ব অনেক পরিমাণে তাহার প্রচণ্ডতাকে খর্ব করিয়া রাখিয়াছে, দেবযানীতে যে ঝাঁজ পাই, বাঁশরীতে তা পাই না। আর দেবযানী সেই আদিম জগতের ব্যক্তি, যেখানে সুনীতিও নাই, দুর্নীতিও নাই—সে এক অনীতির জগৎ, যাহার স্মৃতিটুকুও মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, কেবল মাঝে মাঝে বিদায়-অভিশাপের মর্মন্তুদ আর্ত হাহাকারে চকিতের মধ্যে সেই ভোলা দিনের আভাস মনে প্রবেশ করিয়া মানুষকে

আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়। মনে পড়িয়া যায়, আমরা সকলেই সৃষ্টির কোন্ এক ব্রাহ্মমুহূর্তে এমনি অনীতির জগতে বিচরণ করিতাম। দেবযানীর মধ্যে আমাদের সেই হারানো সত্তাকে দেখিতে পাই, বুঝিতে পারি দেবযানী আমাদের প্রাক্‌পৌরাণিক রূপ। যে-কারণে প্রাগৈতিহাসিক বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হই, দেবযানীর প্রতিও ঠিক সেই আকর্ষণ। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ তো প্রাগৈতিহাসিক হইতে চাই না, দেবযানীর শিকারেও পরিণত হইতে চাই না। দূরত্বেই ইহার আসল রস—দূর হইতেই দেবযানী রমণীয়।

মা লি নী

রবীন্দ্রনাথের মালিনী নাটকখানি আশানুরূপ লোকপ্রিয় নয়; চারটি মাত্র দৃশ্যে বর্ণিত, সংহত, সংযত, সর্বপ্রকার অবান্তরবিষয়-বাহুল্যহীন কাব্যনাট্যখানিতে (পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৯) স্ফটিক-শিলাখণ্ডের দীপ্তি, কাঠিন্য এবং কিঞ্চিৎপরিমাণে শীতলতা লক্ষিত হয়। এমন বস্তু লোকপ্রিয় না হওয়াই স্বাভাবিক। সাধারণ পাঠক পরিসরের ব্যাপ্তি চায়, বহু বিষয়ের শিথিলতা চায় এবং মাঝে মাঝে জিরাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে নমনীয় উপত্যকার আশ্রয় চায়। মালিনী নাটকে এ-সব কিছুই নাই। ফলে মালিনীর পাঠকসংখ্যা স্বল্প।

কিন্তু এই কাব্যখানি কবিত্বগুণে এবং চরিত্র-পরিকল্পনায় এক অভিনব বস্তু। রাজকুমারী মালিনীর চরিত্রটিকেই লওয়া যাক।

ওস্তাদ খেলোয়াড় যেমন তীক্ষ্ণ তলোয়ারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, না কাটে তাহার পা, না যায় সে পড়িয়া,—অথচ দুয়েরই আশঙ্কা অবিরল, তেমনি মালিনী-চরিত্র—বরাবর নাটিকার কাহিনী প্রবাহিত, কোথাও এতটুকু স্খলন নাই, কোথাও এতটুকু পতন নাই যেখানে আছে বলিয়া মনে হইতে পারে, সেখানেই কবিত্বের পরাকাষ্ঠা। মালিনীর অনুরূপ চরিত্র কবি দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করেন নাই; কোনো কোনো ক্রীড়াকৌশল আছে যাহার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নহে।

মালিনী নাটকের প্রথম তিন দৃশ্যে মালিনীর এক মূর্তি পাই, চতুর্থ দৃশ্যের মালিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। চতুর্থ দৃশ্যে মালিনীর অবনমন ঘটিয়াছে। প্রথম দিকে যাহাকে দেখি তুষারনদী, যাহার জ্যোতি-দীপ্তিতে চোখ ঝলসিয়া যায়, চতুর্থ দৃশ্যে সে হইয়াছে ঝরনা, কেবল তৃষ্ণা নিবারণে সমর্থ নয়, সে যেন আমাদের গ্রামেরই অঙ্গীভূত। তুষারনদীকে কবে কে আপন মনে করিতে পারিয়াছে!

প্রথম দিকে মালিনী ছিল দেবী, শেষের দিকে সে হইয়াছে মানবী। মালিনী-চরিত্রের বিবর্তনে ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার ব্যাপার।

প্রথম দিকের মালিনীর হৃদয়ে নবধর্ম আবির্ভূত হইয়াছে। এই আবির্ভাব শব্দটির উপরে বিশেষ জোর দিতে চাই। মালিনী কাশীরাজের কন্যা; সেই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে কাশীরাজ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ রাজার কাছে মালিনীর নির্বাসনদণ্ড প্রার্থনা করিয়াছে। হঠাৎ বিদ্রোহী জনসমুদ্রের দিগন্তে অবরোধমুক্ত রাজকন্যার আবির্ভাব জনতাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছে। যে মূঢ়ের দল তাহার নির্বাসন চাহিয়াছিল, তাহারাই মুগ্ধ হইয়া মালিনীকে লোকমাতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এমনই মালিনীর লোকপরিচালনক্ষমতা।

বিদ্রোহীদের নেতা দুই বন্ধু ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়। তাহারা মূঢ় নয়, মুগ্ধও হয় নাই। ক্ষেমঙ্কর সুপ্রিয়কে দেশে রাখিয়া বিদেশে যাত্রা করিল, পররাজ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া কাশীরাজের কলঙ্ক দূর করিবে এই আশাতে। ক্ষেমঙ্করহীন সুপ্রিয় ইতিমধ্যে এক কাণ্ড করিয়া বসিল। ক্ষেমঙ্করের অনুপস্থিতিতে সে মুগ্ধতমরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। রাজকন্যার সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটিল, পরিচয় অচিরকালের মধ্যে প্রণয়ে পরিণত হইল—প্রণয়টা একতরফা নয়। কর্তব্যবোধে, প্রণয়ের অনুরোধে সুপ্রিয়র কত বিচিত্র কাজকেই না কর্তব্য বলিয়া মনে হয়; রাজার কাছে সে ক্ষেমঙ্করের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া দিল। রাজা অনায়াসে আসন্নপ্রায় ক্ষেমঙ্করের সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বন্দীভাবে লইয়া আসিলেন। সুপ্রিয় রাজ্য রক্ষা করিয়া দিল—কাজেই তাহার কিছু পুরস্কার প্রাপ্য। কোন্ পুরস্কার সে চায়? সে কি রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক? সুপ্রিয় ইতস্ততঃ করিয়া বন্ধুর মুক্তি প্রার্থনা করিল। কিন্তু সুপ্রিয় ও মালিনীর বিবাহ যে রাজার অনভিপ্রেত নয় তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আর

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মালিনীর তাহাতে আপত্তি নাই—মিত্রঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, নবধর্মের ভূতপূর্ব শত্রু, সুপ্রিয়কে বিবাহের প্রস্তাবে মালিনী দ্বিধামাত্র করিল না—একবার মৌখিক লজ্জাও প্রকাশ করিল না। যে-কাজ করিতে একজন সাধারণ মানবকন্যা অন্ততঃ করি-কি-না-করি ভাবিত, মালিনী অনায়াসে তাহা স্বীকার করিয়া লইল। এই কি নাটকের পুরোভাগের দেবী মালিনী? চতুর্থ দৃশ্যে সাধারণ মানবীর স্তরেরও নীচে যেন সে নামিয়া গিয়াছে। এমন কি করিয়া হইল?

এবারে 'আবির্ভাব' শব্দটার উপর জোর দিবার কথা স্মরণ করিতে বলি। মালিনীর জীবনে নবধর্ম আবির্ভূত হইয়াছে, সাধনার দ্বারা তাহাকে লাভ করিতে হয় নাই। যতদিন আবির্ভাবের দীপ্তি উজ্জ্বল ছিল মালিনী দেবী ছিল, সেই দীপ্তি ম্লান হইবার সঙ্গেই সে মানবী হইয়া পড়িয়াছে। উজ্জ্বল বাতিটা নিবিয়া গেলে ঘর একটু বেশি অন্ধকার মনে হয়, বাতি যত বেশি উজ্জ্বল, নিবিবার পর ঘর তত বেশি অন্ধকার। প্রান্তভাগের মানবী পুরোভাগের দেবীর তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত। ইহাই স্বাভাবিক—এমন না হইলেই অদ্ভুত হইত এবং কবিকল্পনা স্বকর্তব্যচ্যুত হইত।

নবধর্ম যাহারই হৃদয়ে দেখা দেয়, আবির্ভূত হইয়াই দেখা দেয়। সেটা ইচ্ছাধীন নয়। সেই আবির্ভাবকে অর্থাৎ পড়িয়া-পাওয়াকে সুদীর্ঘ সাধনার দ্বারা আপন করিয়া লইতে হয়। কিন্তু জীবনে লালন করিয়া তুলিবার আগে তাহাকে জীবনে প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে সব সময়ে আবির্ভাব সুফল দেয় না—অন্ততঃ দীর্ঘকাল নিশ্চয় দেয় না। জীবনের জটিল ক্ষেত্রে আবির্ভাবটাই যথেষ্ট নয়, তার জন্য সাধনারও আবশ্যক। বাল্মীকির কবিকল্পনার শিখরেও একদিন এমনি একটি আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, আদি শ্লোকটি আদি কবির আবির্ভাবলব্ধ। কিন্তু রামায়ণ কাব্য তো আবির্ভাব নয়, সে যে সাধনা। আবির্ভাবের ধনকে সাধনের দ্বারা তিনি আপন করিয়া

লইয়াছিলেন। মালিনী করে নাই, কেহ তাহাকে বলিয়াও দেয় নাই। তাহার গুরু কাশ্যপ তখন তীর্থপর্যটনে নিষ্ক্রান্ত, তিনি উপস্থিত থাকিলেও শিষ্যাকে হয়তো সতর্ক করিয়া দিতে পারিতেন।

চতুর্থ দৃশ্যে যে-মালিনীকে দেখি, আবির্ভাবের দীপ্তি তাহার ললাট হইতে অপগত, আর সেই সঙ্গে তাহার পূর্বতন লোকচালন-ক্ষমতা, সূক্ষ্ম কাণ্ডজ্ঞান সমস্তই অপসৃত। সে এমনি অসহায় যে, পূর্বতন শত্রু সুপ্রিয়ের পরামর্শ ও নির্দেশ ব্যতীত এক পা অগ্রসর হইতেও অক্ষম। ইহাকেই বলিয়াছি মালিনীর অবনমন।

মালিনীর চরিত্রের অবনমন-পরিকল্পনাতেই কবিত্বের পরাকাষ্ঠা। মানবমনোজ্ঞ মহাকবির দ্বারাই একমাত্র ইহা সম্ভব। সেই সম্ভাবনার পরিণাম মালিনী-চরিত্র।

প্রথম দৃশ্যে মালিনীর মুখে নবধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া মহিষী বলিতেছেন—

> শুনিলে তো মহারাজ? এ কথা কাহার?
> শুনিয়া বুঝিতে নারি। এ কি বালিকার?
> এই কি তোমার কন্যা? আমি কি আপনি
> ইহারে ধরেছি গর্ভে?

রাজা বলিতেছেন—

> যেমন রজনী
> উষারে জনম দেয়। কন্যা জ্যোতির্ময়ী
> রজনীর কেহ নহে, সে যে বিশ্বজয়ী
> বিশ্বে দেয় প্রাণ।

দেখা যাইতেছে কন্যার অপূর্বতায় পিতামাতা উভয়েই মুগ্ধ।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখিতে পাইব, মালিনীর অকস্মাৎ দর্শনে বিদ্রোহী ব্রাহ্মণগণও সমান মুগ্ধ—

> এ কী অপরূপ রূপ! এ কী স্নেহজ্যোতি
> নেত্রযুগে!

তাহারা ভাবিয়াছিল, স্বর্গের দেবী ভক্তের আহ্বানে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যখন শুনিল যে, তাঁহারই নির্বাসনের জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রার্থনা জানাইয়াছে, তখন তাহারা বলিয়া উঠিল—

ধিক্ পাপ রসনায়।
শতভাগে ফাটিয়া গেল না বেদনায়—
চাহিল তোমার নির্বাসন!

সকলে সমবেত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

জয় জননীর।
জয় মা লক্ষ্মীর। জয় করুণাময়ীর।

সব দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারি মালিনীর চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে কোথাও একটা অলৌকিক কিছু আছে। সে অলৌকিকত্ব আবির্ভাবজাত।

চতুর্থ দৃশ্যে মালিনীর সে ব্যক্তিত্ব আর দেখি না। সে তখন উপবন ছাড়িয়া এবং সুপ্রিয়কে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে অনিচ্ছুক। জনতার সম্মুখে দাঁড়াইবার শক্তি তাহার চলিয়া গিয়াছে। এখন সে সুপ্রিয়কে বন্ধু ও মন্ত্রগুরু হইবার জন্য মিনতি করিতেছে; সুপ্রিয়-রূপ যষ্টিখানাকে ভর করিয়া ছাড়া চলিতে সে এতই অশক্ত। আর চূড়ান্তভাবে সুপ্রিয়ের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব যখন আসিল, তখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রাজা বলিলেন—

বহুদিন পরে মোর মালিনীর ভাল
লজ্জার আভায় রাঙা। কপোল উষার
যখনি রাঙিয়া উঠে, বুঝা যায়, তার
তপন উদয় হতে দেরি নাই আর।
এ-রাঙা আভাস দেখে আনন্দে আমার
হৃদয় উঠিছে ভরি—বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে

বিকশি উঠিল—দেবী না রে, দয়া না রে,

ঘরের সে মেয়ে।

এখানেই মালিনীর চরিত্রে চূড়ান্ত অবনমন। আকাশের চন্দ্র ছিঁড়িয়া পড়িয়া উদ্যানের চন্দ্রমল্লিকায় পরিণত হইল। চন্দ্র অধিকতর সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু চন্দ্রমল্লিকা যে মানুষের নিজের। পুরোভাগের মালিনীর ছবি পটে বাঁধাইয়া রাখিবার যোগ্য—প্রান্তভাগের মালিনী যে একেবারে ঘরের মেয়ে। যাঁহারা দেবীচৌধুরাণীর পুকুরঘাটে বাসনমাজার দৃশ্যকে অবাস্তব বলিয়া থাকেন, তাঁহারা এবারে কি বলিবেন?

মালিনীর অবনমন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেই কি বোঝা যায় না মালিনীর নবধর্ম কত উর্ধ্বোত্থিত? সে তুঙ্গতায় কেহ অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না। সংসারে যেমন নবধর্ম আছে, তেমনি মাধ্যাকর্ষণও তো বিদ্যমান। বস্তুত মাধ্যাকর্ষণে টানিয়া নামায় না, ঠেলিয়া তুলিয়া দেয়; মাধ্যাকর্ষণে মালিনীকে যত বেশি নীচে নানাইয়াছে, তাহার নবধর্মকে কি তত বেশি উর্ধ্বে উঠাইয়া দেয় নাই? মালিনী নিজে নামিয়া পড়িয়া নবধর্মকে উচ্চতর লোকে উঠিতে মুক্তি দিয়াছে, বেলুনের ভারা খসিয়া গিয়া তাহাকে ঠেলিয়া যেমন আরও উঁচুতে তুলিয়া দেয়। কবি এক অপূর্ব কৌশলে মালিনীর আদর্শের জয় ঘোষণাই করিয়াছেন। এ কলাকৌশল মহাকবি ছাড়া আর কাহারও কল্পনায় আসিত না।

ধনঞ্জয় বৈরাগী

বাংলা প্রবাদ বলে যে, রামচন্দ্রের জন্মের আগে রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল। প্রবাদের অনেকটা অংশ বাদ দিয়া লইলেও বুঝিতে পারা যায় যে, ভাব-সত্য বাস্তব-সত্যের পূর্বজ। ভাবরূপে আজ যাহা সৃষ্টিকর্তার মনে বিরাজিত, আগামীকাল তাহাই বাস্তবরূপে জগতে দৃশ্যমান। অনেকে মনে করেন যে, রুশ সমাজে 'নিহিলিস্ট' দেখা দিবার আগেই টুর্গেনিভের 'ফাদার অ্যাণ্ড সন্স' উপন্যাসে তাহার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। একথা কতদূর সত্য বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারেন। তবে এই সত্যের একটি ঘরোয়া দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসাহিত্যে আছে। রবীন্দ্রনাথের পরিত্রাণ নাটকের অন্যতম প্রধান পাত্র ধনঞ্জয় বৈরাগীর কথা বলিতেছি। পরিত্রাণের পূর্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত নাটকের প্রকাশকাল ১৯০৯ সাল। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিশাল ক্ষেত্রে গান্ধীজির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার জীবনে সত্য, অহিংসা, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ প্রভৃতি যে-সব লীলা সকলে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, যাহার সুফল এখন সকলে ভোগ করিতেছেন—তাহারই আভাস দেখিতে পাওয়া যায় ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে ও কীর্তিতে। আজ যে পাঠক পরিত্রাণ নাটক পড়িবেন তাহার কাছে ধনঞ্জয় বৈরাগী বাস্তবের প্রতিফলন, কিন্তু গান্ধীজির আবির্ভাবের পূর্বের পাঠকের কাছে ধনঞ্জয় বৈরাগী ছিল সৃষ্টিপূর্ব আভাস। সেদিনের পাঠক হয়তো চরিত্রটিকে অবাস্তব মনে করিয়াছেন—আজকার পাঠক তাহাকে কি মনে করেন? আর যাহাই করুন অবাস্তব মনে করেন না, হয়তো মনে করেন যে বাস্তব-সত্য শিল্প-সত্যকে কত পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে।

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের মাধবপুর নামে একটি পরগনা ছিল। ধনঞ্জয় বৈরাগী সেখানকার লোক। মাধবপুর পরগনা

যশোর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত, সেখানকার প্রজাগণ বিদ্রোহ করিতে পারে আশঙ্কা করিয়া মন্ত্রীর পরামর্শে যুবরাজ উদয়াদিত্যকে মাধবপুরের শাসনকর্তারূপে পাঠানো হইয়াছে। যুবরাজের সহৃদয় শাসনে প্রজারা বশীভূত। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের ধারণা, সহৃদয়তা ও রাজ্যশাসন পরস্পরবিরুদ্ধ—তাই তিনি যুবরাজকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এদিকে মাধবপুরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। যুবরাজ থাকিতে তাহাদের ভয়ের কারণ ছিল না, তিনি খাজনা আদায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যুবরাজের অপসারণের পরে কে আর তাহাদের আশ্রয় দেয়? রাজার আদেশে জোর খাজনা আদায় চলিতে লাগিল—প্রজারা ভয়ে খাজনা দিতে উদ্যত, ধনঞ্জয় তাহাদের নিষেধ করিল; সে প্রজাদের বুঝাইয়াছে যে, রাজা খাজনা চাহিলে তাহাকে বলিতে হইবে—

"ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তাহলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।"

প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে এই কথাটাই আরো বিশদভাবে ধনঞ্জয় বলিয়াছে—

"আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে?

প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে!

ধনঞ্জয়। হাঁ, মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না, পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।"

ধনঞ্জয়ের খাজনা না দিবার যুক্তি হইতে তাহার জীবনতত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। দুর্ভিক্ষে খাজনা বন্ধ করিবার তথ্যটা নূতন নয়, কিন্তু ধনঞ্জয়ের যুক্তিটা অভিনব। খাজনা বন্ধের আন্দোলন এখানে রাজনীতিক কর্মপন্থা মাত্র নয়, তাহার চেয়ে অনেক বেশি। এ খাজনা বন্ধ নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মাত্র নয়—ধর্ম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে; আবার এ খাজনা বন্ধ রাজাকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যেও নয়, তাহাকে নরহত্যার পাপ হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে। ধনঞ্জয়ের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়, মানুষের কর্তব্য কেবল নিজের প্রতি নয়, যে ব্যক্তি অপরপক্ষে তাহার প্রতিও কর্তব্য রহিয়াছে।

গান্ধীজি ইংরাজকে ভারত ছাড়িতে বলিয়াছিলেন সে কি কেবল ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্যই? তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে ইংরাজেরও মঙ্গল হইবে, কেননা অত্যাচার ও অত্যাচারের ফলে দুই পক্ষেরই মনুষ্যত্ব নষ্ট হইতে থাকে।

মাধবপুরের প্রজারা যুবরাজের প্রত্যাবর্তন প্রার্থনা করিবার আশায় রাজধানীতে আসিয়াছে, সঙ্গে আসিয়াছে ধনঞ্জয় বৈরাগী। অনেকদিন হইতে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আটক করিবার ইচ্ছা ছিল প্রতাপাদিত্যের মনে, এবারে সুযোগ পাইয়া তিনি তাহাকে কয়েদ করিলেন। প্রজারা যুবরাজকেও পাইল না, ধনঞ্জয়কে হারাইল।

ধনঞ্জয়ের উৎসাহে ও পরামর্শে প্রজারা খাজনা দিতে অস্বীকার করিয়াছে—কিন্তু সকলেই জানে যে, এজন্য রাজার মার সহ্য করিতে হইবে। কাজেই মূল পরামর্শ অনুসারে কাজ করিবার জন্য প্রজাদের কানে বৈরাগী অভয়মন্ত্র দিয়াছে। সে প্রজাদের বুঝাইয়াছে যে, ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেলে চলিবে না, আগাইয়া আসিয়া মারটাকে বুক পাতিয়া লইতে হইবে। অত্যাচারীর আঘাত বুকে পিঠে সর্বত্র পড়িতে পারে। আঘাত যেখানেই লাগুক, ভয় না করিলেই মারের বিষদাঁত আপনি ভাঙিয়া যায়। অনিচ্ছায় যে মার

খায়, ভয়ে যে মার সহ্য করে সেও তো অত্যাচারীর মতোই অপরাধী। প্রজারা এতদূর বুঝিতে পারে, কিন্তু তার পরেই গোলমাল! তারা বলে, ঠাকুর, তোমার গায়ে হাত দিলে সহ্য করতে পারব না। ধনঞ্জয় বৈরাগী বলে—

"আমার এই গা যাঁর তিনি যদি সইতে পারেন বাবা, তবে তোমাদেরও সইবে। যেদিন থেকে জন্মেছি আমার এই গায়ে তিনি কত দুঃখই সইলেন, কত মার খেলেন, কত ধুলো মাখলেন—"

প্রজারা রাজধানীতে আসিবার সময়ে হাতিয়ার লইয়া আসিতে চাহিয়াছিল; ধনঞ্জয় বৈরাগী বলিয়াছিল—হাতিয়ার ব্যবহার করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহাদের না আসাই উচিত। ধনঞ্জয় বৈরাগীর শিক্ষা এই যে, মারের বদলে মার দেওয়া চলিবে না, মারকে সাহসের সঙ্গে সহ্য করিতে হইবে, আর যে মারিতেছে সে যে মানুষের গায়ে আঘাত করিতেছে না, আঘাত যে প্রাণের ঠাকুরের গায়ে লাগিতেছে, সেই কথাটা অত্যাচারীকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে দেবঘাতী অপকার্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যতক্ষণ সে চেষ্টা সফল না হয়, সাহস অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছায় মার খাওয়াই ধর্মকার্য।

গান্ধী-চরিত্র অবগত হইবার পরে এ-সব কথা এখন সকলেই জানিয়াছেন; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ১৯০৯ সালে এ সত্যকে হয়তো অধিকাংশ পাঠককেই জীবনপরাঙ্মুখতা মনে করিতেন, হয়তো কবির অবাস্তব কল্পনা মনে করিতেন। আরও মনে রাখিতে হইবে ১৯০৯ সালে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। সে আন্দোলনের তত্ত্ব ধনঞ্জয় বৈরাগীর তত্ত্বের অনুকূল নয়। তখনকার পাঠক কবির ধনঞ্জয়তত্ত্বকে কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন তাহা জানিবার কৌতূহল এখন পাঠকের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক।

এত নাম থাকিতে কবি ধনঞ্জয় নামটা বাছিয়া লইলেন কেন? একটি উদ্ভট শ্লোকে আছে যে, ধনঞ্জয় নামক ব্যক্তিটিকে প্রহার

করিয়া দূর করিতে হইয়াছিল। তাহারই প্রতিবাদে কি এই নামটির নির্বাচন? কবি কি বলিতে চান যে, এমন ধনঞ্জয়ও থাকিতে পারে, প্রহার করিয়া যাহাকে নিবৃত্ত করা যায় না, কিম্বা প্রহারটাই ঠিক সেই পন্থা যাহাতে নিশ্চিত সে নিবৃত্ত হইবে না?

ধনঞ্জয় প্রজাদের অভয়মন্ত্রের সঙ্গে আনন্দমন্ত্রও দিয়াছে। সেই আনন্দের প্রকাশ গানে আর নৃত্যে। মাধবপুরের দলের শক্তি বাহুতে নয়, কণ্ঠে। মার যখন বেদম পড়ে তখন তাহারা গান গায়—আর যে পায়ের সাহায্যে ভীরুরা পলায়ন করে সেই পা দুটাকে তাহারা নাচের কাজে লাগাইয়া দেয়।

সন্দিগ্ধ পাঠক ইহাকেও বোধকরি একটা কবিকল্পনা মনে করেন? কিন্তু ইহারই বৃহত্তর রূপ, বাস্তবতর রূপ কি আমাদেরই জীবনকালে ভারতবর্ষে ঘটিয়া যায় নাই? এবারে আর মাধবপুর পরগনা মাত্র নয়—সুবিশাল ভারতবর্ষ এই ভাবোদ্বেলতার ক্ষেত্র! "হম যব যাত্রা সুরু করেঙ্গে তামাম হিন্দুস্থান উথল যায়েঙ্গে।" গান্ধীজির যষ্টির তালে তালে উৎকট মারের মুখে সমস্ত ভারতবর্ষ কি নাচে নাই? জাদুকরের যষ্টির ইঙ্গিতে ত্রিশকোটি নরনারী কি আশায় আনন্দে অভয়ে উদ্বেল হইয়া ওঠে নাই? সকলে দেখিতে পাইল না, কারণ সকলেই যে নাচের দলভুক্ত! যে দেখিবে সে দূরে থাকিয়া দেখিবে। ভবিষ্যতের ইতিহাসলেখকরা, কবিরা দূর হইতে গান্ধী-পরিচালিত ভারত-নৃত্য দেখিয়া বিস্মিত হইবে, মুগ্ধ হইবে যেমন আজকার আমরা দুই-চারশত বৎসর আগেকার বাংলাদেশজোড়া আর-একটি দিব্য নৃত্য স্মরণ করিয়া। শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব, গান্ধীজি বৈষ্ণব, আবার ধনঞ্জয়ও বৈষ্ণব—তিনজনেই বৈরাগী।

এই বৈরাগ্য-ব্যাপারটাকে পাশ্চাত্য দেশ ভালো বুঝিতে পারে না, বিশেষ বৈরাগ্য যখন ধর্মাচরণের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া রাজনীতিতে প্রবেশ করে। গান্ধীজি সাধুপুরুষ, আবার রাজনীতিকও বটেন; ধনঞ্জয় বৈরাগীমানুষ, আবার রাজনীতিকও বটে। ইউরোপের

চোখে ইহা কি বিসদৃশ। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহাতে বৈসাদৃশ্য কিছুই নাই। জীবনটাকে সমগ্রভাবে দেখিলে রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি সমস্তই অঙ্গাঙ্গী হইয়া পড়ে। আর সমস্ত পৃথক পৃথক কোঠায় ভাগ করিয়া দেখিলে সমস্তই স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। পূর্ণ দৃষ্টিতে সমস্তই তো এক জীবনসত্তার অন্তর্গত। ইউরোপ এ কথাটা ভালো [illegible] নাই, [illegible] তাহার রাজনীতিকের পক্ষে রাজনীতিক্ষেত্রে মিথ্যা বলিতে বাধে না, তাই ব্যক্তিগত আচরণে সাধু হইয়াও সমষ্টির কল্যাণসাধনক্ষেত্রে অসাধুতা করিতে তাহার দ্বিধাবোধ হয় না। যথার্থ ভারতীয় দৃষ্টির কাছে এমন খণ্ডদর্শন অবাস্তব। ভারতীয় দৃষ্টির সম্মুখে জীবনের বিভিন্ন বিভাগ এক অভিন্ন সত্তার অন্তর্গত। তাই গান্ধীজির কাছে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, সমস্তই মূল ধর্মনীতির অঙ্গীভূত। অখণ্ড দৃষ্টিকে আয়ত্ত করিতে গেলে কোনো খণ্ডসত্তার সঙ্গে নিজেকে আসক্ত করিয়া ফেলা চলে না—সমস্তকে যে স্বীকার করিবে সমস্ত হইতে তাহাকে অনাসক্ত থাকিতে হইবে। ইহারই অপর নাম বৈরাগ্য। তাই ধনঞ্জয়ের বৈরাগী অভিধা সার্থক।

পরিত্রাণ নাটকের শেষাংশে দেখিতে পাই যে, ধনঞ্জয় মাধবপুরের প্রজাদের ত্যাগ করিয়া উদয়াদিত্য ও বিভা প্রভৃতির সঙ্গে যাত্রা করিল। অনেকে ইহাকে ধনঞ্জয়ের পক্ষে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ মনে করিতে পারেন—লোকটা তো বেশ, সকলকে গাছে তুলিয়া দিয়া মই কাড়িয়া লইয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল! এমন যাহারা ভাবেন ধনঞ্জয়ের জীবনতত্ত্ব তাহারা বুঝিতে পারেন নাই। ধনঞ্জয় প্রজাদের এই শিক্ষাই দিয়াছিল যে, পরের মই লইয়া গাছে চড়া চলিবে না, গাছে যদি একান্তই চড়িতে হয়, নিজে মই তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। এবারে মই শব্দটির পরিবর্তে আত্মশক্তি শব্দটা ব্যবহার করিলেই বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। ধনঞ্জয় প্রজাদের আত্মশক্তি উদ্বোধন করিয়া দিয়াছে—এখন আর তাহার থাকিবার কি প্রয়োজন? বরঞ্চ

এখন তাহার সরিয়া পড়াই দরকার, নতুবা আত্মশক্তির পরীক্ষা বাকি থাকে। ধনঞ্জয়ের সরিয়া পড়িবার বিশেষ সার্থকতা আছে—না সরিয়া পড়িলেই অনুচিত হইত। তাহা ছাড়া, উদয়াদিত্য ও বিভার কাছে থাকা তাহার বিশেষ প্রয়োজন।

সংক্ষেপে ধনঞ্জয়ের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম—কিন্তু ধনঞ্জয়-চরিত্র সংক্ষেপে সারিবার নয়, কেননা গান্ধীবাদ, গান্ধী-রাজনীতির সহিত ধনঞ্জয়-চরিত্রের নিগূঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা সে চেষ্টা করিলে পাঠকসমাজ উপকৃত হইবেন।

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাটকে ঠাকুর্দা বা দাদাঠাকুর নামে একটি ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। নামান্তর সত্ত্বেও ব্যক্তি যে একই, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ইহারা সকলেই একই ছাঁচে গড়া, এমন-কি ইহাদের উল্লেখ করিতে ঠাকুর্দা বা দাদাঠাকুর ছাড়া আর কোনো বিশেষ পরিচয়ের প্রয়োজন কবি বোধ করেন নাই। কেবল মুক্তধারা রক্তকরবীতে একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। মুক্তধারার ধনঞ্জয় বৈরাগী আর রক্তকরবীর বিশু পাগল, ঠাকুর্দা-চরিত্রেরই রূপান্তর, নামান্তর তো বটেই। কিন্তু ঐ নামের বিশিষ্টতাটুকু বাদ দিলে দেখা যাইবে যে ইহারা ঠাকুর্দা-চরিত্রেরই রকমফের, ঠাকুর্দা-চরিত্রের সমস্ত গুণই ইহাদের মধ্যে বর্তমান।

ঠাকুর্দা-চরিত্রের বিশেষ গুণ কি? নির্বিশেষই ইহাদের বিশেষ গুণ। ইহাদের জাতি কুল বংশ-পরিচয় কিছুই নাই; আগে উল্লিখিত চরিত্র দুটির নাম বাদ দিলে কাহারও ব্যক্তিগত নাম অবধি নাই। যে-সব পরিচয়ের দ্বারা চিহ্নিত হইয়া মানুষ বিশিষ্ট হইয়া ওঠে, ইহাদের মধ্যে তাহাদের কিছুই নাই। রাজা নাটকের ঠাকুর্দা অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছে যে, এক সময়ে তাহার গৃহ পুত্র পরিবার সবই ছিল। কিন্তু সে অবস্থা নাট্যবিষয়ের বহির্ভূত কালে—নাটকে তাহাকে নির্বিশেষ অবস্থাতেই পাই। সংসার ত্যাগ করিবার পরে সন্ন্যাসীর অঙ্গ হইতে যেমন পূর্ব-আশ্রমের সমস্ত পরিচয় ঝরিয়া পড়িয়া যায়, তখন যেমন সে সন্ন্যাসী মাত্র, ঠাকুর্দাও সেইরূপ। ঠাকুর্দা মুক্ত জীব। কোনোপ্রকার বিশেষের সহিত সে সংশ্লিষ্ট নয় বলিয়াই সে সকলের সহিত নির্বিশেষে মিলিতে পারে। ঠাকুর্দার নির্বিশেষ অবস্থা দেখিয়া তাহাকে শ্রেণীরূপের প্রতীক মনে করিলেও ভুল হইবে। শ্রেণীরূপকেও সে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—সে সকল

শ্রেণীর উর্ধ্বে অবস্থিত, সে সার্বজনীন জীব, এই জন্যই শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বহির্ভূত মানবের সুখ-দুঃখকে অনুভব করা তাহার পক্ষে অনায়াস।

নাটকে অনেক শ্রেণীর, অনেক ধরনের লোক আছে—তাহাদের সুখদুঃখের হেতুও বিচিত্র। তৎসত্ত্বেও যে ঠাকুর্দা সকলের বেদনার অংশীদার, তার কারণ সে নাটকের মূল রসের কেন্দ্রে অবস্থিত, কিংবা তাহাকে মূল রসের ভাণ্ডারী ও নাটকীয় ঘটনার কাণ্ডারী বলা যাইতে পারে। কিংবা সে আরও বেশি। সে নাটকের দর্শকগণেরও প্রতিনিধি। তাহার মুক্তি ও সার্বজনীনতা এতই অবাধ যে, অনায়াসে সে যুগপৎ নাটকীয় পাত্রপাত্রী ও নাটকের দর্শকগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ। কিংবা ইহাও বুঝি যথেষ্ট নয়, স্বয়ং নাট্যকারেরও সে প্রতিনিধি। নাটকের পাত্রপাত্রী ও দর্শকগণের যে ভাবে নাটকটিকে গ্রহণ করা উচিত ঠাকুর্দা তাহারই মুখপাত্র। সে আদর্শ দর্শক। আর নাট্যকার যে ভাবে নাটকট ব্যাখ্যা করিতে চান, ঠাকুর্দা তাহাই করিতেছে। সে নাটকের আদর্শ ব্যাখ্যাতা। ঠাকুর্দাকে বাদ দিলে নাটকের ঘটনা-বিন্যাসের হয়তো বিশেষ ত্রুটি হয় না। কিন্তু ভাবনা-বিন্যাসের রং একেবারে বদলিয়া যায়। আমাদের দেশের যাত্রাগানে জুড়ি এবং গ্রীক নাটকের কোরাস যে-কাজ করে, ঠাকুর্দার কাজ অনেকটা সেইরূপ।

এ হেন ঠাকুর্দা-চরিত্রের বিবর্তনের ইতিহাস রবীন্দ্রসাহিত্যের পূর্বযুগে লিপিবদ্ধ আছে। বৌঠাকুরানীর হাট নামে উপন্যাসে বসন্ত রায় নামে যে-ব্যক্তিটি আছে, পরবর্তী কালে লিখিত প্রায়শ্চিত্ত নাটকে যাহাকে দেখিতে পাই, সেই বসন্ত রায়কেই ঠাকুর্দা-চরিত্রের পূর্বরূপ বা অপরিণত রূপ বলিয়া আমার মনে হয়। বসন্ত রায়ের সংসার হইতে বিবিক্ত ভাব, সার্বজনীন সমবেদনা, সংগীতানুরক্তি, সুখদুঃখে অটল সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ ঠাকুর্দা-চরিত্রের গুণের অনুরূপ। পরবর্তী কালে আসিয়া এই-সব গুণ বাড়িয়াছে, বসন্ত রায়ের অ

স্থান কাল পাত্র শ্রেণী সম্প্রদায় প্রভৃতির যে-সব চিহ্ন বর্তমান তাহা ঝরিয়া গিয়াছে—ফলে ঠাকুর্দা-চরিত্রটি পূর্ণ বিবর্তিত হইয়া দেখা দিয়াছে। এ বসন্ত রায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও পদাবলী-লেখক কি না, নাটকের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, প্রাসঙ্গিক কেবল তাহার সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

কিন্তু আর-একটা প্রশ্ন ওঠে, নাটকের বসন্ত রায়ের কোনো পূর্বরূপ ছিল কি না? বাস্তবে ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে শ্রীকণ্ঠ সিংহের চিত্র আঁকিয়াছেন, সেই শ্রীকণ্ঠ সিংহকেই বসন্ত রায়ের ও পরবর্তী কালের ঠাকুর্দা-চরিত্রের পূর্বতম বাস্তবরূপ বলিয়া মনে হয়। শ্রীকণ্ঠ সিংহ ভক্ত ও সাধু ব্যক্তি ছিলেন, সকলের সুখদুঃখের অংশীদার ছিলেন, বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে তাঁহার সাম্যবন্ধন ছিল, আর সংগীতে ছিল তাঁহার একান্ত অনুরাগ। এ সমস্তই বসন্ত রায়ের ও ঠাকুর্দার চরিত্র-লক্ষণ। তার উপরে যখন মনে পড়ে যে শ্রীকণ্ঠ সিংহ বালক রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তখন অস্পষ্ট ধারণা নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়। ঠাকুর্দা-চরিত্রের রহস্য না বুঝিলে রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের নাটকগুলি বুঝিয়া ওঠা কঠিন, আর ঠাকুর্দা-চরিত্রকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করিতে হইলে বসন্ত রায় হইয়া বাস্তব জগতের শ্রীকণ্ঠ সিংহ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে হইবে। এক দিকে বাস্তব জগৎ আর-এক দিকে রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের নাটকের নির্বিশেষ জগৎ—মাঝখানে রহিয়াছে বসন্ত রায়। দুই জগতের কিছু কিছু পরিচয় তাহাতে বর্তমান। সে বিশেষ বটে কিন্তু নির্বিশেষ হইবার মুখে চালিত, সে ঠাকুর্দা-ভাবাপন্ন বটে কিন্তু এখনো ঠাকুর্দা হইয়া ওঠে নাই, তাহাকে বিশ্লেষণ করিলে দুই জগতেরই সন্ধান মেলা সম্ভব। ইহাই বসন্ত রায় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব।

বিনোদিনীর মতো নারী-চরিত্র রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল; বিরল এই জন্যে যে, দেবযানী, রুক্মিণী ও বাঁশরী সরকার বিনোদিনীর সগোত্র হইলেও এই শ্রেণীর নারী-চরিত্র অঙ্কন কবির স্বভাবসংগত নয়। বিনোদিনীকে দেখিয়া মনে হয়, সে যেন শরৎচন্দ্রের কোনো অলিখিত উপন্যাসের নায়িকা। কিংবা বলা উচিত যে—যেহেতু চোখের বালির আগে শরৎচন্দ্রের কোনো উপন্যাস লিখিত হয় নাই—শরৎচন্দ্রের অনেক নারী-চরিত্রই বিনোদিনীর ধাতুতে গঠিত।

বিধবা বিনোদিনী হঠাৎ মহেন্দ্রের ভরা সংসারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদিনী রূপবতী, যুবতী, নানা গুণময়ী, তার উপরে এক সময়ে মহেন্দ্রের সঙ্গে তাহার বিবাহের একটা প্রস্তাব উঠিয়াছিল। বিলুপ্ত সেই বিস্মৃতপ্রায় সূত্র যেন এই সংসারের উপরে মহেন্দ্রের উপরে তাহার একপ্রকার দাবি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। যে সিংহাসনে একদা সে বসিলে বসিতে পারিত, তাহাকে সে সবলে আঘাত করিল, মহেন্দ্র ও আশালতার সংসার নড়িয়া উঠিল। এখানে আর-একটা নূতন সূত্র যুক্ত হইয়া বিনোদিনীর মনস্তত্ত্বকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। সে মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারী। বিহারী মহেন্দ্রের আসক্তি হইতে মুক্ত—সে বিনোদিনীকে দূরে রাখিতে কৃতসংকল্প, আর দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যেই তাহার সহিত স্বাভাবিক ব্যবহারের ঘনিষ্ঠতা করিয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ মহেন্দ্র, বিনোদিনী ও বিহারীকে লইয়াই আকর্ষণ বিকর্ষণ ও প্রত্যাকর্ষণের ত্রিভুজ গঠিত—আশালতা একেবারেই অবান্তর। ত্রিভুজের স্বভাবই এই যে, সে ক্রমাগত চরকির মতো পাক খাইতে থাকে—অন্তত একটা ভুজ খসিয়া না পড়া অবধি তাহার শান্তি নাই। শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্ররূপ ভুজটি খসিয়া পড়িয়াছে—তখনই বিনোদিনীর সঙ্গে

মহেন্দ্র, বিহারী ও অন্যান্য সকলের সম্বন্ধ পুনরায় সংসারের স্বভাবে ফিরিয়া আসিয়াছে। অসামাজিক কামনার স্থান সংসারে নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া মানুষের মনেও থাকিবে না এমন নয়। যাহা মনে আছে কোনো সময়ে তাহা বাহির হইয়া পড়িবেই—তখন তাহাকে সামলাইবার উপায় কি? সে উপায় ঐ মনের হাতেই আছে। বিনোদিনী যখন জানিল যে, বিহারী তাহাকে ভালোবাসে, তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত, তখনই তাহার ক্ষুব্ধ আত্মসম্মান শান্ত হইল এবং মনের দিক হইতে যাহা মিলিল তাহাকে হাতে পাইবার উদ্দেশ্যে আর আকুলতা প্রকাশ করিল না। এখানেই বিনোদিনীর ও লেখকের কৃতিত্ব। কিন্তু অনেক পাঠক ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর বিবাহ হইয়া গেলেই বোধকরি তাঁহারা খুশি হইতেন। সংসারে এমন হইলেও শিল্পে কদাচিৎ এমন ঘটে—ইহাতেই বাস্তবের সঙ্গে শিল্পের পার্থক্য।

বিনোদিনীর উত্তপ্ত যৌবনজ্বালাময় প্রকৃতির গূঢ় মর্মস্থলে একটি সজল কোমল পূজানিবেদিত নারীপ্রকৃতি ছিল। সমস্ত উপন্যাসের গতি সেই নারী-প্রকৃতিকে মুক্তিদানের দিকে যাত্রা করিয়াছে। কবি বলিতেছেন—

"বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপ-মায়ের কথা, তাহার বাল্যসাথির কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল; বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বলকৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্তসজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল, তখন বিহারী যেন আর-একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় সরস হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত রঙ্গরস-

কৌতুকবিলাসের দহনজ্বালায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সলজ্জ সতী-স্ত্রীভাবে একান্ত ভক্তিভরে পতিসেবা করিতেছে, কল্যাণপরিপূর্ণা জননীর মতো সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে মুহূর্তের জন্যও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই—আজ যেন রঙ্গমঞ্চের পটখানা ক্ষণকালের জন্য উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মঙ্গলদৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। বিহারী ভাবিল, বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে। বিহারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, প্রকৃত আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন; অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া উঠে, সংসারের কাছে সেইটেই সত্য।"

চোখের বালি উপন্যাসের, যুবতী বিনোদিনীর মর্মকথা উদ্ধৃত অংশে কবি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। মদনের পঞ্চশর বিনোদিনীর হৃদয়ে যে অগ্নি জ্বালিয়াছিল, যে অগ্নিতে মহেন্দ্রের সংসার ভস্ম হইতে পারিত, সেই অগ্নিকে কবি শান্ত করিয়া, সংযত করিয়া গৃহের মঙ্গলদীপে পরিণত করিয়াছেন। বাস্তবতার নামে স্বভাবের আগুনকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়া দাবানল বাধাইয়া বসা রবীন্দ্রনাথের শিল্পধর্মসংগত নয়—এটাই বোধ হয় আধুনিকেরা পছন্দ করেন না। তাঁহারা বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত যাইতে রাজি নহেন। কিন্তু শেষের পরেও তো আর-একটা শেষ আছে। দাবানল যত প্রচণ্ডই হোক এক সময়ে তাহারও অবসান ঘটে—তখন কি তাহার ভস্মস্তূপ বৈরাগ্যের বাণী বহন করে না? রবীন্দ্রনাথ যদি সেই বৈরাগ্যের ইঙ্গিত করিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া উচিত নয় যে, তিনি শেষ পর্যন্ত যাইতে রাজি নহেন। বাস্তববাদীগণের পরিকল্পিত শেষের পরে যে আর-একটা অতি-শেষ আছে—রবীন্দ্রনাথ ততদূর যাইতে সম্মত। বাস্তববাদীরা পথকেই গৃহ ভাবিয়া মনে করে যে, চঞ্চলতাই তাহার ধর্ম। কিন্তু যে ব্যক্তি পরবর্তী স্তরকে

দেখিয়াছে, সে জানে পথের পরে গৃহ, চঞ্চলতার পরে বিরাম। বাস্তববাদী অর্ধদর্শী—সমগ্রদর্শী ব্যক্তিকে আইডিয়ালিস্ট বলি, বাস্তবোত্তরবাদী বলিতেও বাধা নাই।

রবীন্দ্রনাথের মহুয়া কাব্যগ্রন্থে 'নাম্নী' নামে একটি উপকাব্য আছে; এই কাব্যটিতে নারীর বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব অনুসারে নারীর বিভিন্ন রূপ ইহাতে প্রদর্শিত। রবীন্দ্রনাথ-চিত্রিত নারীসমাজের কতখানি এই-সব বর্ণনার সঙ্গে মেলে তাহা একটা কৌতূহলজনক আলোচনার বিষয়। বিনোদিনী-চরিত্র কবিকল্পিত 'নাগরী'-পর্যায়ের সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত মেলে—এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবি বলিতেছেন—

সে যেন তুফান
যাহারে চঞ্চল করে সে-তরীকে করে খান্ খান্
অট্টহাস্যে আঘাতিয়া এপাশে ওপাশে;
অদৃশ্য আগুনে
কুঞ্জ তার বেড়িয়াছে;
যারা আসে কাছে
সব থেকে তারা দূরে রয়;
মোহমন্ত্রে যে-হৃদয়
করে জয়
তারি 'পরে অবজ্ঞায় দারুণ নির্দয়।

মহেন্দ্রের সম্বন্ধে বিনোদিনীর আচরণ স্মরণ করিলে এই বর্ণনার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। মহেন্দ্রকে সে লুব্ধ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, তাহাকে পুষ্পসৌরভে উতলা করিয়া দিয়াছিল নিশ্চয়—কিন্তু অদৃশ্য আগুনে তাহার কুঞ্জ পরিবেষ্টিত, মহেন্দ্র প্রবেশের পথ পায় নাই—এবং মোহমন্ত্রে তাহার হৃদয় বিজিত হইলেও বিনোদিনীর নির্দয় অবজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই তাহার ভাগ্যে জোটে নাই।

ইহার সহিত তুলনায় নির্বিকারকল্প বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর আচরণ ও মনোভাব কত পৃথক। কবি বলিতেছেন—

আপন তপস্যা লয়ে যে পুরুষ নিশ্চল সদাই,
যে উহারে ফিরে চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে ;
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভরে।

বিহারীর পায়েই এই নাগরী আপন চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে বিনোদিনী—

প্রসাধন-সাধনে চতুরা,
জানে সে ঢালিতে সুরা
ভূষণভঙ্গীতে,
অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে।

বিধবা বিনোদিনীর সাজসজ্জা স্বল্প প্রসাধনের সুনিপুণ দক্ষতা এবং বিরল ভূষণের সংকেতময় ভঙ্গীতে উপরের কাব্যাংশের সার্থকতা বুঝাইয়া দেয়। আর—

জাদুকরী বচনে চলনে ;
গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে ;
অকপট মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর
নিন্দা তার করি দেয় দূর ;
জ্যোৎস্নার মতন
গোপনেও নহে সে গোপন।

মহেন্দ্রের সহিত তাহার ব্যবহার স্মরণ করিলে উদ্ধৃত কাব্যসত্যকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

তবু উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে বিনোদিনীর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে না, ইহাই তাহার সম্পূর্ণরূপ হইলে চোখের বালির উপসংহার

অন্য রকম হইত। বিনোদিনীর প্রকৃতির গভীরে একটি সেবাপ্রয়াসী সলজ্জ মাতা ও পত্নী স্তিমিত ছিল। ঘটনাচক্রে তাহার অতৃপ্ত প্রণয়পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রই শেষ পর্যন্ত তাহার স্তিমিত প্রকৃতিকে গৃহদীপের মতো অচঞ্চল স্নিগ্ধ শিখায় পরিণতি দান করিয়াছে। নাম্নী উপকাব্যের 'শামলী' কবিতাটি হইতে বিনোদিনী-চরিত্রের উপসংহারের বর্ণনা পাওয়া যায়—

গৃহকোণে ছোট দীপ জ্বালায় নেবায়,
দিন কাটে সহজ সেবায়।
স্নান সাঙ্গ করি এলোচুলে
অপরাজিতার ফুলে
প্রভাতে নীরব নিবেদনে
স্তব করে একমনে।

অনুকূল অবস্থায় পড়িলে স্বভাবতই বিনোদিনী যাহা হইতে পারিত, ঔপন্যাসিক যাহার আভাস দিয়াছেন—কবির কলমে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

আনন্দময়ী

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় আক্ষেপ করিয়াছেন যে, জীবনে মার স্নেহ ও সঙ্গ অল্পই পাইয়াছেন, সেইজন্যই তিনি স্থান পান নাই তাঁহার সাহিত্যে। এ আক্ষেপ সর্বৈব সত্য নয়। কেননা রবীন্দ্রসাহিত্যে জননীর বাস্তব চিত্র বিরল নয়। নৌকাডুবিতে, চোখের বালিতে মা আছেন; গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পে আছেন, শেষের কবিতায় যোগমায়ারূপে আছেন, আরও অন্যত্র অন্য নামে আছেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি করিয়া আছেন গোরা উপন্যাসে। গোরার মা আনন্দময়ী রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত শ্রেষ্ঠ জননী-চিত্র। আনন্দময়ী মাতৃমূর্তির পূর্ণতম প্রত্যক্ষতম ঘনীভূততম প্রকাশ। প্রাচীন কাব্যসাহিত্যে মাতৃরূপের যে-সব চিত্র দেখিতে পাই, তন্মধ্যে একমাত্র গান্ধারীর সঙ্গেই আনন্দময়ীর তুলনা চলে। দুজনেরই জীবন অবিচলিত সত্যাকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। দুজনেরই অপরিমেয় সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা, দুজনেরই মূর্তি আর-সকলের উপরে সগৌরবে উত্থিত, কেহই আর যেন পরিবারমাত্রের মাতৃস্থানীয়া নন, দুজনেই যেন 'জনক-জননী-জননী'। গান্ধারী শতপুত্রবতী, তবু তাঁহার পুত্রগৌরব পরিতৃপ্ত হয় নাই; বেদব্যাস গান্ধারীর যোগ্য পুত্র সৃষ্টি করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার উচিত ছিল গোরার মতো একটি পুত্রকে গান্ধারীর কোলে স্থাপন করা। অযোগ্য পুত্রের মাতা হওয়ার দুঃখই গান্ধারীর জীবনের চরম দুঃখ। আর আনন্দময়ী অপুত্রক হইয়াও কেবল সাধনবলে গোরাকে পুত্ররূপে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সাধনার দুঃখও বড় কম নয়। আপন সাধনগণ্ডীর সিদ্ধির মধ্যে গোরাকে টানিয়া আনিতে তাঁহাকে সামান্য বেগ পাইতে হয় নাই; শেষ মুহূর্তে আকস্মিকভাবে জন্মপরিচয় গোরার পরিজ্ঞাত না হইলে খুব সম্ভব আনন্দময়ীর চেষ্টা চিরকালই

অচরিতার্থ থাকিয়া যাইত। দৈবের হস্তক্ষেপের ফলে গোরা বুঝিতে পারিল যে, ভারতবর্ষ তাহার যেমন ধাত্রী, আনন্দময়ীও তেমনি তাহার জননী; বুঝিতে পারিল যে, কেহই তাহার আপন নহে বলিয়াই তাহার সবচেয়ে নিকটতম; বুঝিতে পারিল যে, আনন্দময়ীই ভারতবর্ষ। যে নিষ্ঠুর দৈব এতদিন দুইজনকে একস্থলে রাখিয়াও এক হইতে দেয় নাই, আজ সেই নিষ্ঠুর হস্তই গোরাকে তাহার মাতৃক্রোড়ে সবেগে নিক্ষেপ করিল। আনন্দময়ী চিরদিনের ভারতবর্ষ, গোরা আধুনিক ভারতীয়, একজন সাধ্য অপর জন সাধক, দৈবের অমোঘ হস্ত দুয়ে মিল ঘটাইয়া দিল। আনন্দমঠের উপসংহারের মতো গোরা উপন্যাসের উপান্তও প্রতীকভাবান্বিত। গোরা ও আনন্দময়ীকে উপন্যাসের অধ্যায়ের প্রহরে প্রহরে উন্নীত করিতে করিতে লেখক তাঁহাদের একেবারে মহিমার মধ্যাহ্নশিখরে তুলিয়া দিয়াছেন, সেখান হইতে তাহাদের আর মানবমাত্র বলিয়া মনে হয় না, অসীম রহস্য ও সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতীকী বলিয়া মনে হইতে থাকে। আনন্দময়ী ভারতভূমির প্রতীক।

একি আমার কেবল অনুমান মাত্র? আমার বিশ্বাস, নয়; আমার বিশ্বাস গোরা ও আনন্দময়ী চরিত্র কল্পনার সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিছক রক্তমাংসের মানুষের পরিকল্পনা করেন নাই—আর তাহাদের গড়িবার সময়ে রক্তমাংসের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে প্রতীকের মিশল দিয়াছেন। প্রত্যেক সার্থক শিল্পসৃষ্টি আপন সার্থকতার দ্বারা অভীষ্ট-সীমাকে ছাড়াইয়া যায়, রক্তমাংসের গণ্ডী অতিক্রম করে—তার পরেই যে প্রতীকের রাজত্ব। প্রত্যেক মহৎ চরিত্রই, কি শিল্পে কি বাস্তবে, প্রতীকের ইঙ্গিত বহন করিতেছে; তাহাকে দেখিলে তাহাকে ছাড়া আরও কিছু মনে পড়ে, মনে হয় ঐটুকুর মধ্যেই সে যেন সম্পূর্ণ নয়। পূর্ণ সৃষ্টির একটি লক্ষণ এই যে, পাঠকের মনে তাহা অপূর্ণতার ক্ষুধা জাগ্রত করিয়া দিবে। আর কিছুই নয়, আপন পূর্ণতার দ্বারাই তাহা পাঠকের অপূর্ণতার প্রতি অঙ্গুলি

নির্দেশ করে। এই অঙ্গুলি নির্দেশের ক্ষমতা প্রতীকের প্রধান ধর্ম। আনন্দময়ী চিরন্তনী ভারতভূমির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

বাস্তবিক, ভারতভূমি ছাড়া এমন সর্বংসহা আর কে? পরকে আপন করিবার এমন প্রতিভা আর কার? রক্তসম্বন্ধবহির্ভূত ব্যক্তিকে আর কে এমন করিয়া কোলে টানিয়াছে? আর, কোলের ছেলে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলে এমন পরিপূর্ণ ও ক্ষমার সঙ্গে সহ্য করিতে, মাতৃক্রোড়কে সম্পূর্ণ অবারিত করিয়া রাখিতেই বা আর কে সক্ষম? সাধনালব্ধ সন্তান যে জঠরজাত সন্তানের চেয়ে অনেক বেশি আপন, আনন্দময়ী ও ভারতভূমি ছাড়া আর কে তাহা জানে?

আনন্দময়ী কি ভাবে, কি সাধনমার্গ অনুসরণের ফলে সিদ্ধিতে উপনীত হইয়াছেন আমরা জানি না, আমরা যখন তাঁহাকে দেখি, একেবারে আদর্শের পূর্ণতাতেই দেখি। কিন্তু নিশ্চয় একটা দুঃসহ দুঃখময় সাধনার পর্ব তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষকেও অনুরূপ একটা পর্ব পার হইতে হইয়াছে—ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা তাহার সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু আমরা দুদিনের প্রাণী, সে-সব পূর্বেতিহাসের কি জানি, আমরা আনন্দময়ী ও ভারতভূমিকে ধৈর্যের প্রতিমারূপেই চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি।

গোরা আনন্দময়ীকে মাতৃজ্ঞানে ভালোবাসিত, কিন্তু তাহার মা যে মাতৃভূমির প্রতীক এ ধারণা তাহার ছিল না—কেমন করিয়া থাকিবে, আত্মজ্ঞানেরই যে উন্মেষ হয় নাই। সে-বোধ হইবামাত্র গোরা আবিষ্কার করিল যে, তাহার মাতৃদেবী ও মাতৃভূমি এক; আবিষ্কার করিল যে, একই ভ্রান্তি উভয়কে গোরার কাছ হইতে দূরে নির্বাসিত করিয়া রাখিয়াছিল; আবিষ্কার করিল যে, তাহারই মাতৃক্রোড় সমস্ত মাতৃভূমিতে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত মাতৃভূমি ঘনীভূত হইয়া একটি মাতৃক্রোড়কে সৃষ্টি করিয়াছে;

দৈবহস্তের পরমবিন্যাসে সে যুগপৎ জননী ও জন্মভূমিকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

গোরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পরেশবাবুকে বলিতেছে, "এতদিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি—একটা-না-একটা জায়গায় বেধেছে···আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি, সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে, সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়, সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণক্ষেত্র।"···"আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি—মাতৃক্রোড় যে কাকে বলে এতদিন পরে তা আমি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।" গোরা আনন্দময়ীকে বলিতেছে, "মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

দুইই কি এক ভাষা নয়? ভাব তো এক বটেই! দুয়ে মিলিয়া কি এক হইয়া যায় নাই? 'তুমিই আমার ভারতবর্ষ।' আনন্দময়ী গোরার জননী মাত্র নন, ভারতবর্ষ বলিয়া তিনি আমাদের সকলেরই জননী এবং সেখানেই প্রতীক-ভাবান্বিতা।

গোরা ও অমিত রায়

গোরা ও অমিত রায় একই লেখকের সৃষ্ট হইলেও দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের মানুষ। রবীন্দ্রসাহিত্যের দুই ভিন্ন কোটিতে অবস্থান করিয়া, বৃহত্তম ব্যবধান রক্ষা করিয়া, দুইটি স্বতন্ত্র যুগের প্রতিনিধি হিসাবে তাহারা বিরাজ করিতেছে। গোরা ও অমিত দুজনেই বাঙালীসমাজের অন্তর্গত হইলেও আচারে ব্যবহারে, সাজে সজ্জায়, কথায় বার্তায়, এমন-কি চেহারাটিতে অবধি তাহারা এমনি পৃথক্ যে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় লেখক কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়াই ইহাদের এমন স্বতন্ত্র করিয়া গড়িয়াছেন। গোরা বিদেশী হইয়াও ভারতীয় হইবার সাধনায় অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে, আর অমিত রায় ভারতীয় হইয়াও সর্বজাতীয় হইবার চেষ্টায় নিজেকে কিম্ভুত করিয়া তুলিয়াছে। গোরা আর-একটু হইলেই ট্রাজিক হইতে পারিত, অমিত প্রায় হাস্যকরতার কাছঘেঁসা। গোরা বাংলাদেশের সেই আমলের লোক, কেশব সেনের বক্তৃতায় দীক্ষিত বাঙালীর মন যখন চঞ্চল, বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্যের অধিদেবতা—রবীন্দ্রনাথ তখন কিছুকাল হইল লিখিতে শুরু করিয়াছেন। গোরার জন্ম ১৮৫৭ সালে, তার উপরে যদি আর পঁচিশটা বছর ধরা যায়, তবে তখন ১৮৮২ সাল। এদিকে অমিত রায় হাল আমলের লোক। ঠিক কোন্ আমলের অনুমান করা কঠিন নয়। সুনীতি চাটুজ্জের ভাষাতত্ত্বের বিখ্যাত বই দুখানা লইয়া সে শিলঙে গিয়াছিল—বই দুখানা তখন নবপ্রকাশিত (১৯২৬), কাজেই সময়ের একটা সীমা পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ তখন এমন সর্বজনস্বীকৃত যে তাঁর স্থান তর্কবিতর্কের ঊর্ধ্বে। বলা চলে যে, একজন তরুণ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বাংলাদেশের লোক, আর-একজন প্রৌঢ় প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের যুগের বাংলাদেশের অধিবাসী।

হুজনের সময়ের দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ বছরের—দুজনের ভাবের দূরত্ব আরও অনেক বেশি, কারণ এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে অনেকখানি ভাববিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে—গোরার বাংলাদেশ অমিত রায়ের বাংলাদেশ নয়।

এবারে গোরা বা গৌরমোহনের চেহারা ও সাজসজ্জার বর্ণনা উদ্ধার করা যাইতে পারে—

"সে চারিদিকের সকলকে যেন খাপছাড়া রকমে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে তাহার কলেজের পণ্ডিতমহাশয় রজতগিরি বলিয়া ডাকিতেন। তাহার গায়ের রংটা কিছু উগ্ররকমের সাদা—হলদের আভা তাহাকে একটুও স্নিগ্ধ করিয়া আনে নাই। মাথায় সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠা যেন বাঘের থাবার মতো বড়ো—গলার আওয়াজ এমনি মোটা ও গম্ভীর যে হঠাৎ শুনিলে 'কে রে' বলিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড়ো এবং অতিরিক্ত রকমের মজবুত; চোয়াল এবং চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মতো; চোখের উপরে ভ্রূরেখা নাই বলিলেই হয় এবং সেখানকার কপালটা কানের দিকে চওড়া হইয়া গেছে। ওষ্ঠাধর পাতলা এবং চাপা; তাহার উপরে নাকটা খাঁড়ার মতো ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মতো অতিদূর অদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য ঠিক করিয়া আছে, অথচ এক মুহূর্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কাছের জিনিসকেও বিদ্যুতের মতো আঘাত করিতে পারে। গৌরকে দেখিতে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই, সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই।"

এবারে তাহার বেশভূষার বর্ণনা—সে পরেশবাবুদের বাড়িতে আসিয়াছে—"গোরার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, পরনে মোটা ধুতির উপরে ফিতাবাঁধা জামা ও মোটা চাদর, পায়ে শুঁড়তোলা

কটকি জুতা। সে যেন বর্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো আসিয়া উপস্থিত হইল।"

এবারে অমিতের চেহারার ও বেশভূষার বর্ণনা উদ্ধার করা যাক। ছুটি বর্ণনার তুলনা করিলে কেবল যে গোরা ও অমিতের ব্যক্তিত্বের প্রভেদ জানা যাইবে তাহা নয়, তাহাদের ভিন্ন কালেরও স্বরূপ জানা যাইবে বলিয়া বিশ্বাস।

"অমিতের নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে, পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা-মাজা চিকণ শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তিভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না; মনটা এমন একরকমের চকমকি যে, ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের, যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এরকম ধুতি চলতি নয়। পাঞ্জাবী পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু-ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোট থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাঁকঘড়ি; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায়, একটা পাটকরা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে, বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানী লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর একরকমের উচ্চহাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে, যারা বোঝে তারা বলে—কিছু আলুথালু গোছের বটে, কিন্তু

ইংরেজিতে যাকে বলে ডিস্‌টিঙ্গুইশড্‌। নিজেকে অপরূপ করবার শখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কৌতুক ওর অপর্যাপ্ত।"

গোরা ও অমিত সম্বন্ধে আর কিছু যদি নাও জানা যাইত, উপরের বর্ণনার টুকরা দুটি হইতেই তাহাদের চরিত্রের চেহারার একটা আভাস পাওয়া যাইত। আগে অমিতের কথাই ধরা যাক। কবি বলিতেছেন—অমিতের নেশাই হল স্টাইলে। ওই স্টাইলের চর্চার উদ্দেশ্যেই সে দেশী কাপড় পরিয়া থাকে, যেখানে যত কিছু অদ্ভুত পোশাক আছে শরীরে চাপাইয়া নিজেকে কিম্ভূত করিয়া তোলে, কেননা, স্টাইলে তার নেশা। অমিতের মতে স্টাইল কি, না, যাহাতে মানুষকে পাঁচজনের মধ্যে একেবারে পঞ্চম করিয়া তোলে।

এখন, স্টাইলের প্রতি এই উৎকট আগ্রহ কোনো ব্যক্তিতে বা সমাজে দেখা দেয় যখন বস্তুর অভাব ঘটে। তখন বস্তুর অভাব অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ের অভাব, বক্তব্যভঙ্গীর দ্বারা পূরণ করিয়া লইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। ডন কুইকসট বায়ুচালিত যন্ত্রটাকে শত্রু মনে করিয়া আক্রমণ করিয়াছিল—ইহারা অর্থাৎ নিছক স্টাইল-বিলাসীরা বায়ুকেই লক্ষ্য মনে করিয়া কলমের খোঁচা মারিতে উদ্যত হয়। আমাদের বক্তব্যকে সূত্রাকারে পরিণত করিয়া বলা চলে যে, বক্তব্যের স্বল্পতা ও স্টাইলের বাড়াবাড়ি পরস্পরসম্বন্ধ। সাহিত্য হইতে একটা উদাহরণ লওয়া যাক। ভারতচন্দ্রের স্টাইল স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তব্য কি? কিছু ছিল কি না সন্দেহ। নিজের বিদ্যা ও ভাষার সৌন্দর্যকে প্রকট করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি বিদ্যাসুন্দরের অবতারণা করিয়াছেন—তাই তাহারা এমন ছায়াবৎ, এমন বায়বীয়, ইহাকেই বলে বায়ুকে লক্ষ্য করিয়া কলম চালনা। অন্যদিকে মুকুন্দরামকে দেখা যাক, তাঁহার স্টাইল ছিল না, কিন্তু বস্তু ছিল।—এটাও আদর্শ অবস্থা নয়, কেননা সাহিত্যে, বস্তুতে ও স্টাইলে গাঁটছড়া পড়া আবশ্যক।

অমিত রায় দ্বিযুদ্ধান্তবর্তী শিক্ষিত বাঙালীসমাজের অন্যতম ব্যক্তি এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এখানেই তাঁহার আসল বৈশিষ্ট্য। সে যতই জীবন্ত হোক না কেন, তার আসল মূল্য মানুষ হিসাবে নয়, সামাজিক অবস্থার সাক্ষী হিসাবে। অমিত রায়ের কোষ্ঠী তৎকালীন সামাজিক অবস্থার একখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় দলিল। অমিত দ্বিযুদ্ধান্তর্বর্তী পর্বের সামাজিক তাপমান। অত্যাধুনিক সমালোচকদের ভাষায়, সে সমাজচৈতন্যধর্মের কৃষ্ণদাস কবিরাজ —তাঁহার সর্বাঙ্গে সমাজচৈতন্যধর্মের ফোঁটা-তিলকের ছাপ।

অমিতের যুগের সমাজধর্ম কি? অমিত 'সিনিক'; মানুষ তখনই সিনিক হইয়া ওঠে যখন নিজের বুদ্ধি ও শক্তির অনুযায়ী কর্মের অভাব হয়। যে বুদ্ধিকে সে বাহিরে প্রয়োগ করিতে পারিত, কর্মহীন সেই বুদ্ধি অন্তর্মুখী হইয়া আত্মবিশ্লেষণে নিযুক্ত হয়। আত্মবিশ্লেষণের অতিশয় ঝোঁকটা ভালো নয়—যেহেতু বিশ্লেষণের চরম ফল শেষ পর্যন্ত শূন্যতা। শূন্যতা মানুষকে নাস্তিকে পরিণত করে—সিনিসিজম একরকম নাস্তিক্য। অমিত রায় বুদ্ধিবৃত্তির নাস্তিক। তাহার হাতে কাজ নাই, অথচ ঘটে যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, তাই সে প্রমাণ করিতে বসিয়াছে কাজ করাটাই একটা কুসংস্কার, যেন তাহার কাজ নাই বলিয়াই কাজ না করাটাই সংসারের নিয়ম।

এই কথা স্মরণ করিয়াই অমিতকে বর্তমান যুগের বাঙালীর প্রতিনিধি বলিয়াছি। কিন্তু চিরকাল এমন ছিল না। এক সময়ে বাঙালীর হাতে কাজ ছিল, জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল, সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য মনে উৎসাহ ছিল—তখন সে সিনিক হইবার অবকাশই পায় নাই। যে বাঙালী ডিরোজিওর ছাত্র, যে বাঙালী রামমোহনের দলভুক্ত, যে বাঙালী দেবেন্দ্রনাথের ভক্ত, যাহারা কেশবচন্দ্রের অনুরাগী, রামকৃষ্ণের শিষ্য-প্রশিষ্য, সুরেন্দ্রনাথের চেলা-চামুণ্ডা—তাহারা বাহিরের কর্মপ্রবাহ লইয়াই এমনি ব্যস্ত ছিল যে, সূক্ষ্ম বুদ্ধির বিলাসের সময় তাহাদের ছিল না। গোরা সেই যুগের

বাঙালী। সে সমাজ সংস্কার করিতে চায়, ইংরেজ তাড়াইতে চায়, ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করিতে চায়—সে ঘোরতর ব্রাহ্মবিদ্বেষী—ভুল হোক ভ্রান্ত হোক, একটা বিশ্বাসের দ্বারা সে চালিত। যে উপাদানে বিধাতা বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রভৃতিকে তৈয়ারি করিয়াছিলেন, তাহারা সেই উপাদানের মানুষ। কিন্তু অমিত রায়? কালের ব্যবধানে ঘটনাচক্রের আবর্তনে ভারতবর্ষে যখন বাঙালীর প্রাধান্য কমিয়া আসিয়াছে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন অবাঙালীর করগত, ব্যবসাবাণিজ্যের লক্ষ্মী যখন বাঙালীর গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, যে বাঙালী এক সময়ে ভারতীয় চিন্তার পুরোভাগে ছিল সে যখন চিন্তার 'ক্যাম্প-ফলোয়ার'-এ পরিণত হইয়াছে, অমিত সেই যুগের লোক। তাহার বুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু যখন কর্ম নাই বুদ্ধি আছে তখন সে বুদ্ধি সর্বনাশের অর্থাৎ আত্মনাশের কারণ হইয়া বসে। তখন সে প্রমাণ করিতে বসে যে, রবি ঠাকুরের চেয়ে নিবারণ চক্রবর্তী বড় কবি, তখন সে প্রমাণ করিতে বসে যে, কাজ করাটা একটা বর্বরোচিত সংস্কার—তখন সে স্রোতের মুখের শেওলার মতো ঘটনার বেগে তাড়িত হইয়া কলিকাতা হইতে শিলঙ, শিলঙ হইতে নৈনিতাল করিয়া মরে—কোথাও তাহার স্থিরতা নাই, কারণ স্থিরতাকে জড়তা বলিয়া তাহার বিশ্বাস। নদীর স্রোত চঞ্চল, আবার স্রোতের শেওলাও চঞ্চল—কিন্তু দুইয়ে পার্থক্য আছে। গোরার চঞ্চলতা স্রোতের মতো, অমিতের চঞ্চলতা শেওলার মতো—এই যে ভেদ এ কেবল তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, যে সমাজের তাহারা মানুষ, সেই সমাজের সমষ্টিগত ব্যাপার। তাই গোরা ও অমিতকে তাহাদের বিভিন্ন যুগের সামাজিক প্রতিনিধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

নিখিলেশ ও সন্দীপ

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে দুটি করিয়া প্রধান পুরুষ-চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়—বিনয় ও গোরা; নিখিলেশ ও সন্দীপ; বিপ্রদাস ও মধুসূদন। এগুলি জোড়বাঁধা চরিত্র। ভাবের সূত্রে বা বৈষম্যের সূত্রে ইহারা পরস্পর গ্রথিত। প্রথম দিকের উপন্যাসেও এরকম জোড়বাঁধা চরিত্রযুগল পাওয়া যাইবে—কিন্তু পরবর্তী উপন্যাসের সঙ্গে তাহাদের মূলগত পার্থক্য আছে। চোখের বালির বিহারী ও মহেন্দ্র, নৌকাডুবির রমেশ ও অক্ষয় জোড়বাঁধা চরিত্র হইলেও তাহারা ব্যক্তিরূপের অধিক নয়। পরবর্তী উপন্যাসগুলির চরিত্রযুগল কেবল ব্যক্তিরূপ নয়, তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিরূপের চেয়ে শ্রেণীরূপের বিকাশই প্রবলতর। শ্রেণীরূপ বলিতে বুঝি 'টাইপ'। ইহাদের অঙ্গ হইতে নাম গোত্র প্রভৃতি পরিচয় আরও একটু স্খলিত হইয়া পড়িলে ইহারা বিশুদ্ধ symbol বা প্রতীকে পরিণত হইতে পারিত। পরবর্তী উপন্যাসের এই-সব চরিত্র টাইপ ও 'সিম্বলের' মাঝামাঝি এক প্রকার সৃষ্টি।

সন্দীপ ও নিখিলেশ কোনো শ্রেণীরূপ কিম্বা আরও একটু নির্গুণ হইলে কিসের সিম্বল হইতে পারিত ?

ঘরে বাইরে উপন্যাস স্বদেশী আন্দোলনের অনেক পরে লিখিত হইলেও ইহার ঘটনাকাল স্বদেশী আন্দোলনের সময়। তখন বন্দে মাতরম্ মন্ত্র ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইতেছে, স্বদেশী বক্তৃতায় দেশসুদ্ধ লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে, হাটে হাটে বিলাতী কাপড় ও বিলাতী লবণ বয়কট হইতেছে, যাহারা সে নিষেধ মানে না তাহাদের উপরে দেশহিতের নামে প্রতিকূল আচরণ চলিতেছে, তখন সমস্ত বাংলাদেশ একটা বিষম উত্তেজনার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে 'কি হয় কি হয়' এই অভাবিতের বাঁকের দিকে প্রধাবিত

সেদিনকার উত্তেজনা আজকার দিনে কল্পনার দ্বারাও অনুভব করা বোধকরি সম্ভব নয়। সন্দীপ স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা। নিখিলেশ তাহার ধনী বন্ধু, লোকে তাহাকে মহারাজ বলে, সে পুরাতন অভিজাত বংশের সন্তান। কলেজে পড়ার সময়ে দুজনের বন্ধুত্ব। তার পরে কর্মস্রোত দুজনকে ভিন্ন দিকে লইয়া গিয়াছে।

সন্দীপ নামটা অন্বর্থ, কেননা সে নিজেও স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, আবার বাগ্মিতার প্রভাবে অপরকেও উদ্দীপিত করিতে সমর্থ। নিখিলেশের স্বদেশপ্রেম বক্তৃতাধর্মী নয়, অকারণ উদ্দীপনাকে শক্তির অপব্যয় বলিয়া মনে করে—তাহার ধারণা এই যে, যে-অগ্নি সংযত হইলে অন্ন প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাকে মশাল জ্বালাইয়া শোভাযাত্রায় নিয়োগ করা নির্বুদ্ধিতা। সে জানে যে, উত্তেজনার দ্বারা কোনো স্থায়ী ফললাভ হয় না, কোনো বড়ো কাজ হয় না। নিজের বিচার ও সামর্থ্য অনুসারে যে স্বদেশসেবা করিতে চেষ্টা করে—তাহার চেষ্টা প্রধানতঃ সমবায়মূলক সংগঠন কার্যে নিবদ্ধ। তাহার বিস্তীর্ণ জমিদারির প্রজাদের কল্যাণসাধনকার্যে সে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, বাহির হইতে উপকারের ভার তাহাদের উপর চাপাইয়া না দিয়া প্রজাদের আত্মবিশ্বাস জাগাইতে সে সচেষ্ট। তাহার স্বদেশপ্রেম ফল্গুধারায় প্রবাহিত, বাহিরে তাহার প্রকাশ স্বল্প। সে বলিতে পারিত মাটির নীচে যে রস সর্বব্যাপী হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রকাশ নাই বটে, কিন্তু তাহারই গোপন সঞ্চারে কি পৃথিবী শ্যামল হইয়া উঠে নাই? এ-সব কথা সে বড়ো বলে না, আর বলিলেও বড়ো কেহ বিশ্বাস করিবে না, কারণ লোকে প্রত্যক্ষ প্রকাশ চায়, উত্তেজনা চায়। লোকের বিশ্বাস, ধনী নিখিলেশ স্বদেশী আন্দোলনটারই বিরুদ্ধে, কেননা দেশ জাগিয়া উঠিলে ধনীর প্রভাব, বিশেষ ধনী জমিদারের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা। অধিকাংশ লোকেই তাহাকে ভালোমানুষ মনে

করে, অনেকেই তাহাকে কাপুরুষ ভাবে, কেহ কেহ আসিয়া তাহাকে শুনাইয়া গিয়াছে যে, সে স্বদেশী-দ্রোহী। সব দিক দিয়াই সন্দীপ তাহার বিপরীত। তাহার বিশ্বাস, হিমাচলের অচল তুষারস্তূপ বন্যারূপে দেশ ভাসাইয়া দিবার জন্যই সঞ্চিত হইয়া আছে। বাগ্মিতার দ্বারা উত্তেজনা সৃষ্টি করাকেই সে স্বদেশসেবা মনে করে—সেই উত্তেজনা কোনো স্থায়ী কাজে লাগিল কি না সে হিসাব তাহার দেখিবার নয়। উত্তেজনা যে উদ্দেশ্য মাত্র এ কথা সে জানে কি না জানি না, জানিলেও নিজের অনুচরদের কাছে প্রকাশ করে না, খুব সম্ভব সে কথা এখন সে ভুলিয়াই গিয়াছে। সে জোর করিয়া বিলাতী কাপড় বয়কট করে, বিলাতী লবণের বস্তা নদীতে ফেলিয়া দেয়। দেশের জন্য লুট করা, মিথ্যা কথন, জোর-জবরদস্তি করা—কিছুকেই সে অন্যায় মনে করে না, বরঞ্চ নিখিলেশ প্রশ্রয় দেয় না দেখিয়া তাহাকে স্বদেশধর্মের বিধর্মী মনে করে। লোকে সন্দীপকে 'হীরো', বীরপুরুষ মনে করে। সন্দীপ নিজেও তাই মনে করে বলিয়া, স্বদেশের উদ্দেশ্যে যে পুষ্পাঞ্জলি দান করে সে-সব যে নিজেরই পায়ের কাছে পড়িতেছে তাহা লক্ষ্য করে না, আর লক্ষ্য করিলেও বোধ করি আপত্তি করিত না।

নিখিলেশের পত্নী বিমলার চিত্ত বাগ্মিতার দ্বারা স্বদেশসেবার উদ্দীপনাময় মোহের দ্বারা সে আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই আকর্ষণটা কেবল ভাবের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রহিল না। ইহা যে নীতিবিরুদ্ধ, সন্দীপ তাহা জানে বটে, কিন্তু জানিলে কি হয়, নীতিকেই যে সে মানে না। তাহার বিশ্বাস, ভীরুপ্রকৃতির লোকের জন্যই নীতির অনুশাসন। ধর্মভীরুতাকে সে নিছক ভীরুতা বলিয়াই মনে করে। বিমলা ও সন্দীপের আকর্ষণ-বিকর্ষণ আমাদের আলোচ্য নয়, নীতির প্রতি সন্দীপের কি ধারণা সেই প্রসঙ্গে কথাটা বলিলাম। অবশেষে একদিন খবর আসিল যে, মুসলমানেরা সন্দীপকে খুন করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তখন বীরপুরুষ সন্দীপ

রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করিল। পলাইবার সময়েও সে নিজেকে ভীরু মনে করে নাই, দেশের হিতের জন্যই সে জীবনটাকে লইয়া অন্যত্র চলিল। দেশের হিতের জন্যই অনেক বীরপুরুষ জীবনটাকে সযত্নে বাঁচাইয়া রাখে। এ দিকে সন্দীপের দলের অমিতাচারে মুসলমানেরা উত্তেজিত হইয়া হিন্দুর ঘরবাড়ি লুট করিতে, নারীনিগ্রহ করিতে শুরু করিয়াছে। খবর পাইবামাত্র নিখিলেশ ঘোড়া ছুটাইয়া বাহির হইয়া গেল। যখন তাহাকে ফিরাইয়া আনা হইল, মাথায় বিষম চোট লাগিয়া সে অজ্ঞান। লোকে যাহাকে ভালোমানুষ মনে করিত, সন্দীপ যাহাকে ভীরু ভাবিয়া অবজ্ঞা করিত, প্রয়োজনের সময়ে বিপদের মুখে যাত্রা করিতে সে দ্বিধা করে নাই—আর নিজের কৃত কার্যের দায়িত্ব ভীরু নিখিলেশের উপরে অনায়াসে চাপাইয়া দিয়া বীরপুরুষ সন্দীপ রাত্রির অন্ধকারে গোপনে পলায়ন করিল।

নিখিলেশ ও সন্দীপ দুই ভিন্ন মতের, পৃথক জাতের লোকের শ্রেণীরূপ। অন্য নামের অভাবে বলা যায় যে এক দল সহিষ্ণুতার দ্বারা পলে পলে সাধনা করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়, অপর দল পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া যাহা-কিছু সম্মুখে পড়ে তাহাকেই ভাঙিতে চায়—এক দল গঠনধর্মী, এক দল ভাঙনধর্মী, এক দল প্রগতিশীল বিদ্রোহী বা destructive revolutionary, আর-এক দল রক্ষণশীল বিদ্রোহী বা constructive revolutionary—প্রগতিশীল বিদ্রোহীর শ্রেণীরূপ সন্দীপ, আর রক্ষণশীল বিদ্রোহীর শ্রেণীরূপ নিখিলেশ। সব সমাজেই এই দুই শ্রেণীর লোক আছে। কোনো সমাজে এক শ্রেণী বেশি, কোনো সমাজে বা অপর শ্রেণী বেশি। আবার সমাজ-বিবর্তনের ফলে কখনো কখনো শ্রেণীর তারতম্য ঘটে। বাঙালীসমাজের কথাই ধরা যাক। ডিরোজিওর সময় হইতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে একাধিকবার এইরূপ শ্রেণীবিপর্যয় ঘটিয়াছে। প্রধানতঃ ডিরোজিও এবং পাশ্চাত্য

সাহিত্যের প্রভাবে গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভাঙনধর্মী লোকের সংখ্যা সমাজে বাড়িয়া গিয়াছিল। তার পরে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে গঠনধর্মীদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। এই বৃদ্ধি বাধা পায় স্বদেশী আন্দোলনের মুখে আসিয়া, তার পর হইতে এখন পর্যন্ত ভাঙনধর্মীদের সংখ্যাই দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে। একটা নেতিবুদ্ধি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় স্বৈরবুদ্ধি, বাঙালীসমাজে মারীর আকারে দেখা দিয়াছে।

ভাঙিতে বাঙালীর বড়ো উল্লাস। বাঙালীর সমস্ত আন্দোলনের মূলে নেতিবাদের একটা প্ররোচনা ছিল—এক সময়ে হয়তো প্রয়োজনের তাগিদে ছিল, ক্রমে অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে এবং অবশেষে অভ্যাস প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণ—স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালী কায়মনবাক্যে নামিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মূলতঃ বিষয়টা কি? ভাঙা বাংলাকে জোড়া লাগাইতে হইবে। ইহাকে যতই প্রোজ্জ্বল করিয়া দেখানো যাক, ইহা একটা নেগেটিভ প্রোগ্রাম মাত্র। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ—তখন বাঙালী তাঁহার সঙ্গে ছিল। পরে সেই সুরেন্দ্রনাথ যখন গঠনমূলক কাজে বাঙালীকে ডাক দিলেন, একটি লোকও অগ্রসর হইল না, সুরেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক একঘরে হইলেন। দেশবন্ধুর ডাকে বাঙালী তখনই সাড়া দিয়াছিল, যখন তিনি মন্ত্রিত্ব ভাঙিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু ইহাও একটা নেগেটিভ প্রোগ্রাম—গঠনমূলক কিছু নয়। সেই দেশবন্ধু যখন রেসপনসিভ কো-অপারেশন এর কথা বলিলেন, বাঙালীসমাজে অসমর্থনের গুঞ্জন উঠিল। আরও পরবর্তীকালের ইতিহাস হইতে অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে—কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন নাই। মোটের উপরে বলিলেই চলিবে যে, ভাঙনধর্মী লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, কি রাজনীতি, কি সমাজব্যবস্থা, কি শাসনব্যবস্থা এমন-কি সাহিত্য'শিল্পের মতো বিবিক্ত ক্ষেত্রেও

নেতিবুদ্ধি মারীর মতো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ চল্লিশ বছরের মধ্যে বাঙালী সমষ্টিগত প্রয়াসে কিছু গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। ইদানীংকালে যাহা সংগঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এককের সৃষ্টি [illegible] সৃষ্টির [illegible]াস সর্বত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত। যে আগুনে অন্ন প্রস্তুত হইতে পারিত, সেই আগুনে মশাল জ্বালিয়া সমস্ত দেশটা সর্বনাশের শোভাযাত্রার পথে বহির্গত। অন্তরের সার্থকতা যতই ক্ষয় পাইতেছে, বাহিরের উদ্দীপনায় ততই বেশি করিয়া সে তৃপ্তি খুঁজিতেছে। কিন্তু মদ্যের কাছ হইতে কি খাদ্যের পুষ্টি পাওয়া সম্ভব? বাংলাদেশে সন্দীপ আর একটিমাত্র নয়, সমস্ত বাংলাদেশ আজ সন্দীপের জনতায় পরিপূর্ণ। আর-এক দিকে নিখিলেশের দল সংখ্যায় ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে।

বাংলাদেশের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা আমার উদ্দেশ্য নয়—তাহার জন্য বিস্তারিত ক্ষেত্রের আবশ্যক। যে দুটি মনোভাব বাঙালীসমাজে সক্রিয় তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিতে চাই যে, নিখিলেশ ও সন্দীপ চরিত্রে তাহাদের সজ্ঞান প্রকাশ বর্তমান। স্বদেশী আন্দোলন কেন যে ব্যর্থ হইল, যে আন্দোলন একটা দেশব্যাপী নবজাগরণ ঘটাইতে পারিত, কেন যে তাহা সংকীর্ণ রাজনৈতিক অগ্ন্যুদ্গারমাত্রে পর্যবসিত হইয়া নিজেকে ব্যর্থ করিয়া দিল—সে আলোচনার ক্ষেত্র অন্যত্র হইলেও সংক্ষেপে বলা যায় যে, সন্দীপী নেতিবুদ্ধি ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। আরও বলা যায় যে, সমাজে যতদিন এই নেতিবুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন কাহারও মঙ্গল নাই। কেবলমাত্র সৃষ্টিধর্মী মনোবৃত্তির উন্মেষেই বাংলার বর্তমান দুর্গতির অবসান ঘটা সম্ভব।

শচীশ

চতুরঙ্গের নায়ক শচীশের জীবনে তিনটি স্তর দেখিতে পাই। জীবন না বলিয়া এখানে সাধনা বলিলেও চলিত, কেননা, শচীশের জীবনের যে অংশটুকু লেখক অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তাহার সাধনারই ইতিহাস।

প্রথম স্তরে দেখিতে পাই, শচীশ নাস্তিক জেঠামশায়ের কর্মসঙ্গী। দ্বিতীয় স্তরে দেখিতে পাই, সে লীলানন্দ স্বামীর প্রধান শিষ্য। আর তৃতীয় স্তরে সে কাহারও সঙ্গী বা শিষ্য নয়, সে নিজেকেই নিজে চালিত করিতেছে, বাহিরের সাহায্যের উপর আর তাহার ভরসা নাই, সে এখন অনন্যশরণ ও আত্মদীপ।

প্রথম স্তরে শচীশের সঙ্গী জেঠামশায়—পরে অবশ্য শ্রীবিলাস ও আসিয়া জুটিয়াছে। দ্বিতীয় স্তরে আছেন স্বামী লীলানন্দ, আছে শ্রীবিলাস আর দামিনী নামে একটি মেয়ে। দ্বিতীয় স্তরেই প্রথম তাহার দেখা পাইলাম। তৃতীয় স্তরে শ্রীবিলাস ও দামিনী আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকিতে পারে নাই—সাধক শচীশকে অনুসরণ করিয়া চলা সংসারী জীবের পক্ষে আর সম্ভব নয়। শচীশের সাধনমার্গের 'ক্যাম্প-ফলোয়ার' শ্রীবিলাস ও দামিনী স্বভাবত সংসারী জীব, তাহারা তখন বিবাহ করিয়া আসিয়া সংসার পাতিয়া বসিল—শচীশকে একাই চলিতে হইয়াছে। এইখানেই শচীশের সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি। মরুভূমির পথিককে মরীচিকার প্রান্তে এক-আধবার যেমন চোখে পড়ে, শচীশকে পদ্মার চরে তেমনি এক-আধবার দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু বোধ করি দেখিতে না পাইলেই ভালো ছিল। রৌদ্র-ভাস্বর বিরাট বৈরাগ্যের পটভূমিতে শচীশকে আর বদ্ধ জীব বলিয়া মনে হয় না। সে যেন আপনার পূর্বতন রূপের ছায়ামাত্র! জেঠামশায়ের সঙ্গী ও লীলানন্দ স্বামীর

শিষ্য, উভয়েই সংসারী জীব; কিন্তু তৃতীয় স্তরের শচীশ নিতান্তই সংসারাতীত। এ এমনি নির্মম সত্য যে, শেষ পর্যন্ত অমিত-আশাচারিণী দামিনীকেও তাহার আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে—শচীশের পায়ের কাছে শেষ প্রণতি রাখিয়া দামিনী বিদায় লইয়াছে, বিদায় লইয়াছে তাহাকে স্বামীরূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষা! দামিনী বুঝিতে পারিয়াছে যে, মরীচিকাকে লইয়া ঘর করা চলে না; বুঝিতে পারিয়াছে যে, মরীচিকা-নদীর কূলে শ্বেতপাথরের ঘাট বাঁধিলেও তৃষ্ণা নিবারণের উপায় হয় না। যাহাকে পতিরূপে পাইবার ইচ্ছা ছিল, তাহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া দামিনী ফিরিয়া আসিয়াছে, শ্রীবিলাসের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে—মুক্ত জীবকে মুক্তিপথে ছাড়িয়া দিয়া সংসারী জীব সংসারে প্রবেশ করিয়াছে।

শচীশের পরিণাম কি হইল আমরা জানি; তাহাতেই অনুমান করিতে পারি যে, সাধনার বাষ্পে ভরা উর্ধ্বমার্গগামী বেলুনের মতো মহাশূন্যে সে উধাও হইয়া গিয়াছে।

সংক্ষেপে ইহাই শচীশের সাধনমার্গের ইতিবৃত্ত। স্বল্পপরিসর গ্রন্থের মধ্যে কি বিপুল পরিবর্তন, কোথা হইতে একেবারে কোথায় আসিয়া পড়িলাম! কোথায় ডফ-সাহেবের ছাত্রের কর্মসঙ্গী, আর কোথায় আত্মদীপ, অনন্যশরণ মুক্তিসন্ধানী শচীশ! কোথায় ডফ-সাহেবের যুগ, আর কোথায় শচীশের পদ্মার চর! কোথায় কলিকাতা শহর, আর কোথায় অনির্দিষ্টভূগোল দক্ষিণ-সমুদ্রের নারিকেলপল্লববীজিত নির্জন সৈকত, আর কোথায় বা সেই প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মুখগহ্বরের মতো অন্ধকার গুহা! গভীর তমিস্রায় সেখানে ইতিহাসের পরপার হইতে সমীরিত দীর্ঘনিশ্বাস অনুভূত হয়, অজ্ঞাত দেহীর কোমল কেশরপুঞ্জ সুগভীর মিনতির মতো চরণদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া ধরে—এ যেন কায়ালোকের অতীত কোন্ ছমছম ছায়ার দুস্তর

দ্বীপান্তর! কেবল দামিনীর বুকের মধ্যে বেদনাটি জ্বলিতে থাকে কবির গোপন কথাটির মতো!

চতুরঙ্গ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের কথাশিল্প তুঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে—না আছে ইহাতে গোরার অতিবিস্তার, না আছে ছোটো গল্পের অতিসংক্ষিপ্ত সংকীর্ণতা! নৌকাডুবির ভাবালুতা, শেষের কবিতার দীপ্তরশ্মির ছুরি-চালনা, মালঞ্চ ও দুই বোনের অর্ধমনস্ক খসড়া-প্রণয়ন—সব দোষের উর্ধ্বে অবস্থিত চতুরঙ্গ। উপন্যাসের স্বাধীনতা আর ছোটো গল্পের সীমাবদ্ধ দায়িত্বে মিলিত হইয়া চতুরঙ্গের অনবদ্য শিল্পকে সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে উপন্যাসের বিস্তারকে পাওয়া গিয়াছে অথচ কাঠামো বজায় রাখিবার জন্য সদাজাগ্রত দৃষ্টির পাহারা রাখিতে হয় নাই; আবার ছোটো গল্পের মুক্তাসম মুহূর্তটিকে প্রতিবেশী গল্পের ধারার মধ্যে অনায়াসে বিতানিত করিয়া দিবারও অবকাশ পাওয়া গিয়াছে—ইহা না উপন্যাস, না ছোটো গল্পের সমষ্টি—চতুরঙ্গ খণ্ডউপন্যাস বা অখণ্ড ছোটো গল্প। ঠিক এই শ্রেণীর এ আকৃতির রচনাই রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুকূল, রবীন্দ্র-কথাশিল্প-প্রতিভার যথার্থ বাহন। বাহনের আনুকূল্যে গল্পের ধারাটি অভীষ্ট পরিণামে পৌঁছিয়াছে, পাত্রপাত্রীর চরিত্রের দলগুলি বিকাশে বাধা পায় নাই—উপন্যাসের পাতা পূরণের জন্য মনস্তত্ত্বের বিরক্তিকর জাল-বুননও নাই, তেমনি আবার ছোটো গল্পের অতিসংহত গণ্ডী অতিক্রম করিবার নিরন্তর দ্বিধাও নাই—ফলে বাহন ও বাহিত অখণ্ড একটি শিল্পমূর্তি সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই অখণ্ড শিল্পমূর্তির নাম দেওয়া যাইতে পারে শচীশের সাধনা।

৩

চতুরঙ্গের এমন একটা গঠনগত সৌষম্য দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যাহা বিরল। দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্ব ও সমন্বয় এখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট, অথচ সুস্পষ্টতার খাতিরে সৌন্দর্যকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করা হয়

নাই, বরঞ্চ বিরুদ্ধমুখী ধাক্কার টাল সামলাইতে গিয়া সৌন্দর্য আপনার বীর্যের সন্ধান পাইয়াছে। এই বীর্যেরই নাম সৌষম্য। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনাতেও সৌন্দর্যের অভাব নাই, কিন্তু সে যেন নারীর সৌন্দর্য; চতুরঙ্গের সৌন্দর্য বীরের সৌন্দর্য—গ্রীক athlete-এর দেহে যে বীরশ্রী পরিদৃষ্ট হয়, চতুরঙ্গের অঙ্গে তাহাই যেন দেখিতে পাওয়া যায়। এমন যে হইতে পারিয়াছে তাহার প্রধান কারণ, সৌন্দর্য এখানে গঠনগত সুষমার উপরে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে—দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্ব ও সমন্বয় আপন ভাবগত পূর্ণতাকে শিল্পগত সার্থকতায় পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে।

জেঠামশায়ের প্রভাব শচীশ-চরিত্রের মৌলিক বেশ। "পজিটিভিজম্" বা নিরীশ্বর কর্মযোগ জেঠামশায় সম্বন্ধে সার্থক হইলেও শচীশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। এমন কেন হইল? প্রথমতঃ নিরীশ্বর কর্মযোগ বস্তুটাই খুব খাঁটি নয়—অর্থাৎ মানুষের স্বভাবের উপরে তার প্রতিষ্ঠা খুব দৃঢ় নয়। কাজেই এক-আধ জনের জীবনে তাহা ফলপ্রদ হইলেও সাধারণভাবে মানুষকে ফলদান করিতে তাহা অক্ষম। জেঠামশায় লোকটা খাঁটি, কিন্তু শচীশের কর্মযোগ সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। এ বস্তু গুরুমুখী বিদ্যার মতো পাইবার নয়, জীবন হইতে উদ্ভূত হইলেই তবে সত্য হইল। নিরীশ্বর কর্মযোগ জগমোহনের জীবন হইতে উদ্ভূত—আর শচীশের পক্ষে তাহা ধার-করা বস্তু। যতদিন উত্তমর্ণ জীবিত ছিল বেশ চলিয়া যাইতেছিল—কিন্তু জগমোহনের মৃত্যুর পরেই সব কেমন ওলটপালট হইয়া গেল। নিরীশ্বর কর্মযোগী ভক্তিরস-সমুদ্রের ঠিক মাঝখানটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নিরীশ্বর ও অগুরু (জগমোহন কখনো গুরুর গৌরব দাবি করিত না) শচীশ প্রচণ্ড আস্তিক ও গুরুবাদী হইয়া উঠিল, তাহার কর্মযোগ ঘুচিয়া গিয়া নৈষ্কর্ম্যের লীলায় সে নাচিয়া-কুঁদিয়া পাড়া মাত করিতে লাগিল। দ্বন্দ্ব যত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্ব তত প্রচণ্ড হইল।

কিন্তু লীলাবাদেও তাহার স্থিতি হইল না, আবার তাহাকে পথে বাহির হইয়া পড়িতে হইল। কিন্তু এবারে আর বাঁধা পথের নিশানা ধরিয়া নয়। নাস্তিক্য ও আস্তিক্য, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ, লঘুবাদ ও গুরুবাদ—সবই তাহার পক্ষে সমান অবাস্তব প্রমাণিত হইল। অনন্যোপায় হইয়া তবে সে অনন্যশরণ হইল; পরের প্রদীপে যখন আর চলিল না, নিজের দীপটি সন্ধান করিয়া জ্বালিয়া লইতে তখন সে বাধ্য হইল। এ পথের পরিণাম লেখক দেখান নাই, কারণ সে পরিণাম অনায়াসদৃশ্য নয়; তাহার লক্ষ্য মহৎ বলিয়াই তাহার অন্ত অনির্দিষ্ট। নিরীশ্বর কর্মযোগে ছিল নিছক অরূপের সন্ধান, ভক্তিযোগে ছিল প্রত্যক্ষরূপের সন্ধান। আর এখন? শচীশ এখন হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছে যে, রূপেও নয় অরূপেও নয়, রূপারূপের সমন্বয়ের মধ্যেই সার্থকতার সন্ধান করিতে হইবে। তাহার মতে তিনি অরূপ হইতে রূপের দিকে নামিতেছেন, তাই সাধককে রূপ হইতে অরূপের দিকে উঠিতে হইবে, তবে তো মাঝপথে দুজনের মিলন হইবার সম্ভাবনা! সেই সম্ভাবনার আয়োজনে শচীশ এখন মগ্ন–ইহাই তাহার বর্তমান সাধনার স্বরূপ। নিরীশ্বর কর্মবাদ ও গুরুবাদী ভক্তিযোগ যদি ত্রিকোণের দুটি কোণ হয় তবে তৃতীয় কোণটির নাম দেওয়া যাইতে পারে আত্মযোগ! রূপ ও অরূপ যদি ত্রিকোণের দুটি কোণ হয় তবে তৃতীয়টির নাম রূপারূপের সমন্বয়। এই দুরূহ পথের সীমানায় আনিয়া লেখক শচীশকে ঘরছাড়া ও লক্ষ্মীছাড়া করিয়া একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন। দামিনী ও শ্রীবিলাস তাহার সঙ্গচ্যুত হইয়াছে, আর যাহার মুখে শচীশের কথা জানিতে পাইতাম সেই শ্রীবিলাস সঙ্গছাড়া হওয়াতে আমরাও শচীশের সন্ধানভ্রষ্ট হইয়াছি—মরুভূমির পথিক মরীচিকার উপকূলে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে।

শচীশের সাধনার ধারা, বিশেষতঃ প্রথম দুটি স্তরের, অনেকেরই জীবনে অনুরূপভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে; সে হিসাবে এমন কোনো

বৈশিষ্ট্য নাই—বিশিষ্ট শচীশ মানুষটি। অনায়াসলব্ধ সিদ্ধির দৃঢ় ভূমি হইতে সুগভীর অনিশ্চয়ের মধ্যে লাফাইয়া পড়িতে সে তিলমাত্র দ্বিধা করে নাই, সাধন বেগের উল্লাসে করায়ত্ত সিদ্ধিকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছে, পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় ব্যয় করিয়া পুরাপুরি নিঃস্ব হইয়া সে পথে বাহির হইয়াছে। সে কেবলমাত্র পথিক নয়, একেবারে দেউলে পথিক—ঘরের পথ যাহার চিরকালের জন্য রুদ্ধ। রবীন্দ্রজগতের নরনারীসমাজে শচীশ সত্যই অদ্বিতীয়, কেবল তাহার স্রষ্টার জীবনে অন্তহীন যে-সাধনবেগ অনুভব করা যায় তাহারই খানিকটা আপন বক্ষের মধ্যে লইয়া যেন সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর-কাহারও সঙ্গে তাহার বড়ো মিল নাই।

বিপ্রদাস ও মধুসূদন

যোগাযোগ উপন্যাসখানির নাম রবীন্দ্রনাথ প্রথমে তিন পুরুষ রাখিয়াছিলেন। পরে সে নামটি পরিবর্তন করিয়াছেন। কাহিনীটি তিন পুরুষ অবধি গড়াইলে ঐ নামটি সার্থক হইত; শুধু তাহাই নয়, পূর্ব নামের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাহিনীটি সম্পূর্ণ হইলে বইখানা রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস হইতে পারিত। বর্তমান আকারেও ইহাকে অনায়াসে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা চলে। কিন্তু এখন আমরা কাহিনীটির শিল্পালোচনা করিতে বসি নাই, আমাদের উদ্দেশ্য অন্য; যোগাযোগ নামটি হইতেই শুরু করা যাইতে পারে।

কবি তিন পুরুষ নামের বদলে যোগাযোগ নামটি কেন বাছিয়া লইলেন? যোগাযোগ কাহাদের মধ্যে? যোগাযোগ বলিতে দুই পক্ষ বোঝায়—এখানে সেই দুই পক্ষ কাহারা? কাহিনীটির প্রধান চরিত্র তিনটি—কুমুদিনী, বিপ্রদাস ও মধুসূদন। বিপ্রদাস ও মধুসূদন জোড়-বাঁধা চরিত্র; এ রকম জোড়-বাঁধা চরিত্র তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসেও আছে, এ কথা পূর্ব প্রসঙ্গে বলিয়াছি। বিপ্রদাস ও মধুসূদন জোড়-বাঁধা হইলেও বিজোড়ের জোড়-বাঁধা। বিপ্রদাস পুরাতন ধ্বংসোন্মুখ অভিজাত বংশের সন্তান; মধুসূদন নূতন অভ্যুদয়োন্মুখ ধনী, তাহার ধনের উপরে আভিজাত্যের ছাপ এখনো পড়ে নাই, তাহার ধন এখনো লক্ষ্মীর আসন হইয়া উঠে নাই, এখনো তাহা কুবেরের বোঝা। অপর পক্ষে বিপ্রদাসের ঐশ্বর্যের উপর হইতে লক্ষ্মী অপসৃত হইলেও তাহার সর্বাঙ্গে এখনো তাঁহার শতদলের সুগন্ধ জড়াইয়া রহিয়াছে। পুরাতন ধনী ও নূতন ধনের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়াছে উপন্যাসখানিতে, আর সে যোগাযোগের কারণ কুমুদিনী। ঠিক এই কথাটি কবির মনে ছিল কি না জানি না, কিন্তু পাঠকের মনে

উদিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই দুই বিপরীতের যোগাযোগ কুমুদিনীর পক্ষে সুখের হয় নাই। কাহিনীর পাতায় পাতায় নববধূর পায়ের যে অলক্তকচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, হৃদয়ের রক্ত মিলিত না হইলে সে-সব কি এমন উজ্জ্বল, এমন হৃদয়গ্রাহী হইতে পারিত? অসহায় কুমুদিনীর চিত্ত দুই মল্লের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, সেই ক্ষতির বিবরণ যোগাযোগ কাহিনী।

যোগাযোগের বিরুদ্ধে অনেক পাঠক অভিযোগ তুলিয়া থাকেন যে, উপন্যাসখানির সূচনার উদার সমারোহ উপসংহারে অতৃপ্ত রহিয়া যায়। অপর কোনো বাংলা উপন্যাস এমন বিপুল আড়ম্বরে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। চৈত্রসন্ধ্যার পশ্চিমদিগন্ত মেঘমালার বিচিত্র ও উচ্চনীচ হর্ম্যমালায় যেমন ভরিয়া ওঠে, অস্তসূর্যের করুণ আভা তাহাদের উপরে পালিশ মাখাইয়া দিয়া তাহাদের যেমন উজ্জ্বল করিয়া তোলে, বকের পাঁতি যেমন তাহাদের দ্বারে বাতায়নে মালা দুলাইয়া দেয়, বিদ্যুতের চকিত শিখা যেমন কক্ষে কক্ষে আলো জ্বালাইয়া বেড়ায়, সেই মেঘপুরীর ঈষন্মুক্ত গবাক্ষের ফাঁকে ফাঁকে অতিকায় বীরপুরুষ ও অলৌকিক সুন্দরীগণের চঞ্চল চেহারা যেমন ক্ষণে ক্ষণে চোখে পড়িতে থাকে, আর সবসুদ্ধ মিলিয়া একটা চাপা গুরুগুরু রবে অন্তিম উৎসবের গম্ভীর উল্লাসে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া দেয়—যোগাযোগ-কাহিনীর সূচনা অনেকটা সেই রকম। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে সে-সব কোথায় অন্তর্হিত! শূন্য দিগন্ত চমকিত করিয়া একটি অগ্নিময় শূল ভূগর্ভে আমূল নিহিত হয়—বিপুল সমারোহের কোথাও চিহ্নমাত্র থাকে না। কুমুদিনীর হৃদয়বেদনা সেই অগ্নিময় শূল, শেষ পর্যন্ত কেবল তাহাই দৃশ্যমান, সূচনার ঐশ্বর্য কোথায় বিলীন হইয়া যায়। যোগাযোগের বিরুদ্ধে এই যে আশাভঙ্গের অভিযোগ, তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে বস্তুসত্য থাকিলেও তজ্জন্য কবিকে দোষী করা চলে না। প্রথমতঃ, তিন পুরুষের ইতিহাসকে তিনটি কাহিনীতে সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা তাঁহার

ছিল। তিন পুরুষের কাহিনী লিখিতে গেলে বনিয়াদ দৃঢ় ও প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হয়। বনিয়াদের আড়ম্বরের সহিত অসমাপ্ত সংকল্পের বিশালতাকে মিলাইয়া লইয়া বিচার করিতে হইবে। সে বিচারে কবি নিরপরাধ প্রতিপন্ন হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার উদ্দেশ্যটাও মনে রাখা আবশ্যক। প্রাচীন বংশের কাহিনী লিখিতে তিনি বসেন নাই—তিনি প্রাচীন বংশের একটি কন্যার কাহিনী লিখিতে উদ্যত। ঐটুকু বলাই যথেষ্ট নয়; প্রাচীন বংশের কন্যাটি নূতন ধনীর ঘরে আসিলে যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়, পুরাতন সংস্কারের সহিত নূতন পরিবেশের যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠে, তাহাই লেখা তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রাচীন ও নবীনের পটভূমি যেখানে গায়ে গায়ে লাগিয়াছে কুমুদিনীর হৃদয় সেখানে বিন্যস্ত। মেঘমালার পটের উপরে যে বিদ্যুৎ-শিখা উদ্ভাসিত তাহারই অগ্নিজ্বালা লিখিতে কবি ব্যস্ত। কুমুদিনীই শিল্পীর লক্ষ্য। বিপ্রদাসের ও মধুসূদনের প্রাধান্য ও প্রসার যত বেশি হোক না কেন, কুমুদিনীর অন্তর্জ্বালার পটভূমির চেয়ে তাহারা গুরুতর নয়। আর সেইভাবেই তাহাদের বিচার করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাসের একটা শিল্পেতর গুরুত্ব আছে, তাহারা সামাজিক ইতিহাসের দলিলও বটে। গোরা, ঘরে বাইরে, আর যোগাযোগ প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।

অভিজাত ধনীবংশের ক্রমিক অবনতি অতিশয় করুণ দৃশ্য। কারণ, ধন গেলেও ধনের অভিমান যাইতে চাহে না, লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেও তাঁহার শূন্য আসনটা আঁকড়িয়া থাকিবার যেন একটা প্রবণতা দেখা যায়। তেমনি আবার আর-এক দিকে নূতন ধনের স্তূপীকৃত অহংকারের উপরে লক্ষ্মীর চরণ পড়িবার আগেই শ্রীমন্ত হইয়া উঠিবার বিসদৃশ প্রয়াস হাস্যকর। পুরাতন ধনী নূতন ধনকে অবজ্ঞা করে, নূতন ধনী ক্ষীয়মাণ অভিজাতবংশকে মনে মনে ঈর্ষা করিয়া বাহিরে নতশির করিয়া দিবার চেষ্টা করে। এই দ্বন্দ্বে যে মানব-রস নিহিত তাহা সাহিত্যের সামগ্রী সন্দেহ নাই। এই

সামগ্রীই যোগাযোগে সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশের পুরাতন জমিদারবংশের ঐশ্বর্যের চন্দ্রকলা ক্ষয় হইয়া আসিতেছে, নূতন স্বর্ণস্তূপের প্রোজ্জ্বল সূর্যমণ্ডল লোকচক্ষু ঝলসিয়া দিয়া উদিত হইতেছে—পুরাতন বংশের নাশ ও নূতন বংশের অভ্যুদয় রবীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি নিজেও পুরাতন অভিজাতবংশের সন্তান। তাঁহার দীর্ঘ জীবনকালে এ দেশে যে-সব সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে তন্মধ্যে পুরাতন ও নূতন বংশের সৌভাগ্য-বিবর্তন একটি প্রধান ব্যাপার। বাংলাদেশের সামাজিক ও সংস্কৃতিগত ইতিহাসের প্রকৃতি অনেক পরিবর্তনের দ্বারা চিহ্নিত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে। নবাবী শাসনের উপসংহারকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গত শতকের শেষাংশ পর্যন্ত এই পরিবর্তনের বিরাট স্রোত বাংলাদেশকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। এখন দুইটি ধারাই মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, এখন আমরা দুইটি ধারাকেই সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি—আর সেইজন্যই এই পরিবর্তন তেমন করিয়া আর আমাদের মনকে নাড়া দেয় না। কিন্তু পরিবর্তনের প্রারম্ভে অভিজাতের তিরোভাব আর সদ্যোজাতের প্রাদুর্ভাবকে নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইত, কাজেই মন বিশেষভাবে ধাক্কা খাইত।

পুরাতন বংশের ধন অভ্যস্ত, সে পরিবেশে বিপ্রদাস সম্ভব। নূতন অনভ্যস্ত ধনে মধুসূদন ছাড়া কি সৃষ্টি করিতে পারে? অবিনাশ ঘোষালে ধন অনেক পরিমাণে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে, নতুবা সে এমন বিশ্রব্ধভাবে নিজের জন্মদিনের উৎসবকে স্বীকার করিতে পারিত না। মধুসূদন কখনো নিজের জন্মদিন পালন করে নাই, কিন্তু খুব সম্ভব সে তাহার ব্যবসায়ের জন্মদিন পালন করিত। তিন পুরুষ অবধি কাহিনীটা গড়াইলে অবিনাশের পুত্রকে নূতন পরিবেশের বিপ্রদাসরূপে দেখিতে পাইতাম। কারণ, তখন ধন তাহার কেবল অভ্যস্ত হয় নাই, রীতিমত পরিপাক হইয়া গিয়াছে। অবিনাশের জন্মদিন-পালনে যে সচেতন প্রয়াস লক্ষিত হয়, অবিনাশের

পুত্রে তাহাও লোপ পাইত। তিন পুরুষের কমে ধন মজ্জাগত হইয়া উঠিতে পারে না, খুব সম্ভব সেই প্রক্রিয়াটা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই কবি তিন পুরুষ-কালের ইতিহাস লিখিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।

অভিজাতবংশের বিপুল ঔদার্য যেমন মনকে মুগ্ধ করে, নূতন ধনোপার্জনচেষ্টার পৌরুষও তেমনি মনকে আকর্ষণ না করিয়া পারে না। ঔদার্যে যেমন সৌন্দর্য আছে, পৌরুষের মধ্যেও তেমনি সত্য আছে; পৌরুষ বা শক্তি অভ্যস্ত না হওয়া অবধি পেশীতে পেশীতে স্ফীত হইয়া ওঠে, কিন্তু শক্তি যখন আত্মস্থ হয় তখন তাহার মতো সুন্দর আর কি? বিপ্রদাসকে দেখিয়া মোতির মার মনে হইয়াছিল যে, এই শান্ত সমাহিত পৌরুষ-গম্ভীর বীরমূর্তি রামায়ণ-মহাভারতের পৃষ্ঠা হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। মধুসূদনকে দেখিলে কি মনে হইবে? কেরোসিনের গুদাম হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে বলিলে অতিরঞ্জন হইবে না। কিন্তু এ দুইয়ে প্রভেদ কতখানি? প্রত্যেক রাজপ্রাসাদের বিস্মৃত আদিযুগেই যে গুদামঘরের ছায়া দেখিতে যাওয়া যায়। বিপ্রদাস, মধুসূদন ও অবিনাশে ধনের ত্রিমূর্তি। ধনের জরা বিপ্রদাস, ধনের পৌরুষ মধুসূদন, আর অবিনাশে—যাহার ধমনীতে বিপ্রদাসের বংশের আর মধুসূদনের দুয়েরই রক্ত প্রবাহিত তাহার মধ্যে—নূতন করিয়া ধনের নবজন্মলাভ। অবিনাশ আভিজাত্য লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা চাটুজ্জেদের প্রাচীন আভিজাত্য নয়, তাহার মধ্যে ধনের পৌরুষ আছে বটে কিন্তু তাহা কেরোসিনের গুদামঘর হইতে উদ্ভূত নয়। পুরাতন উদারতা ও নূতন পৌরুষ, পুরাতন আভিজাত্য ও নূতন পরিবেশ মিলাইয়া লইয়া অবিনাশ গঠিত; বিপ্রদাস তাহার মাতুল, মধুসূদন তাহার পিতা, কুমুদিনীর অন্তর্জ্বালাবিদীর্ণ গর্ভ হইতে তাহার প্রকাশ।

বিপ্রদাস ও মধুসূদন-চরিত্র বুঝিবার সময়ে এই কথাগুলি মনে রাখিলে কাজ সহজে হইবে বলিয়া মনে হয়।

অভীককুমার

আচারনিষ্ঠ হিন্দুপরিবারের সন্তান অভীককুমার। তাহার পিতৃদত্ত নাম অভয়াচরণ। অভীককুমার নামটি তার স্বোপার্জিত। সে নিজেকে বলে নাস্তিক, কোনো কিছুকে সে মানে না, কোনো কিছুকে সে ভয় করে না, অভীককুমার নাম তার সেই মনোভাবের প্রতীক। কিছু না মানিবার ঝোঁকে সে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে—এমন-কি যে ধরনের ছবি সে আঁকে, তাতেও আছে শিল্প-সংস্কারকে লঙ্ঘন করিবার ঝোঁক। তার ছবির সমজদারি যারা করে তারাও কিছু মানে না বলিয়া তাদের বিশ্বাস। অভীককুমারের ধারণা, তারা না মানে কিছু, না জানে কিছু। তাহাদের সমজদারিতে তাহাকে খুশি করিতে পারে না। পশ্চিমের বড়ো হাট হইতে খ্যাতি কিনিবার দুরাশায় জাহাজের খালাসি হইয়া সে ইউরোপ যাত্রা করিয়াছে।

তার না-মানাকে তার পিতা অনেক দূর সহ্য করিয়াছিলেন, অবশেষে বাড়াবাড়ি দেখিয়া তাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। অভীককুমারের মাতা গৃহত্যাগের সময়ে তাহাকে টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন; অভীককুমার বলিয়াছিল—টাকা তখনই লইতে পারিবে যখন সে উপার্জন করিতে শিখিবে। কিন্তু ছবি আঁকিয়া উপার্জন করিবার আশা তার নাই—সে শিল্পের কালাপাহাড়। কোনো বন্ধন যার নাই সেও মাধ্যাকর্ষণের অতীত নয়—সহপাঠিনী বিভার প্রতি তার একটা গূঢ় আকর্ষণ আছে।

অভীককুমারের জন্মগত বংশপরিচয় যাই হোক-না কেন, তার মনোগত বংশপরিচয় স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েকটি পুরুষের সহিত তাহার মনঃসাম্য বর্তমান। তাহার চেহারা, আচরণ, তাহার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, তাহার বাক্‌নৈপুণ্য স্মরণ করাইয়া দেয় যে, তাহার রক্তে আছে শচীশ, গোরা আর অমিত রায়ের রক্তের ছোঁয়াচ।

শচীশের পিতা ও জ্যেঠামশায় ছিলেন স্বতন্ত্র জাতের মানুষ। এখানেও দেখি, অভীককুমারের বংশেও তেমনি দুটি স্বতন্ত্র জাতের মানুষের অস্তিত্ব বর্তমান। তাহার পিতা অম্বিকাচরণ শচীশের পিতার মতোই সংস্কারবদ্ধ ব্যক্তি; আর তার জ্যেঠামশায় বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন—ঈশ্বর-না-মানা পণ্ডিত—ছিলেন শচীশের জ্যেঠামশায়ের অনুরূপ। আর অভয়াচরণে ছিল শচীশের সংস্কার-না-মানা নিষ্ঠা।

অভীককুমারের চেহারার বর্ণনা পড়িলে বোঝা যাইবে, কিরকম মিশ্রধাতুতে সে গঠিত।

"অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁচের। আঁট লম্বা দেহ, গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ম, চিবুকটা ঝুঁকেছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গীতে। আর ওর মুষ্টিযোগ ছিল অমোঘ, সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণিপীড়ন সহ্য করেছে, তারা একে শত হস্ত দূরে বর্জনীয় বলে গণ্য করত।"

এই বর্ণনার মধ্যে শচীশ, গোরা আর অমিত রায়—তিনজনেরই আভাস লুকানো। যে-উপাদানে রবীন্দ্রনাথ ইহাদের তিনজনকে গড়িয়াছিলেন তারই খানিকটা যেন অবশিষ্ট ছিল তাঁর শিল্পীমনের কোণে—তারই সাহায্যে পূর্বোক্ত তিনজনের চতুর্থ রূপে অভীককুমার গঠিত। তাহারা চারজনে ভাগ্যের পাশাখেলায় বসিয়াছে—নাস্তিক্যের পুরস্কার তাহাদের সম্মুখে দোদুল্যমান। গোরা নাস্তিক্যের আস্তিক; সে কিছু মানিতে চায়, কিন্তু কি মানিবে জানে না। শচীশ আস্তিক্যের নাস্তিক, তাহার জ্যেঠামশায়ের মতো সে না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত। অমিত উত্তম পুরুষের নাস্তিক; সে আপনাকে অবধি বিশ্বাস করে না, বনেদী নাস্তিককে সে ডিঙাইয়া গিয়াছে—বনেদী নাস্তিক আর-যাহাকেই অবিশ্বাস করুক, নিজের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে না। আর অভীককুমার নাস্তিক্যের ধূমকেতু; তার দিক নাই, দেশ নাই; তার উদ্দেশ্য নাই, লক্ষ্য নাই; কেবল আছে 'বী মধুকরী'রূপী একটা ধ্রুবতারা—কিন্তু সে

এত দূরে যে তাহার আকর্ষণের টান পৌঁছায় না ধূমকেতুর জগতে।

মনীষা নামে একটি মেয়ে অভীককে ভালোবাসিত। তাহার মৃত্যুর পরেই তাহার প্রদত্ত উপহারের ঘড়িটা সে বেচিতে আসিয়াছে বিভার কাছে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠিবে—বিভাকে তবে কি সে ভালোবাসে না? বলা মুশকিল। এই পর্যন্ত বলা যায় যে, বিভার প্রতি সে এক রকম আকর্ষণ অনুভব করে—তবে সে আকর্ষণ ভালোবাসার, না ভালোবাসার অহংকারজাত, বলা কঠিন। বিভা ধরা দেয় নাই বলিয়াই আকর্ষণ, ধরা দিলে কি হইত কে জানে। কিম্বা আকর্ষণের আসল কারণ বিভার ঈশ্বর-না-মানা মনকে পরাস্ত করিবার আশা। অভীককুমার তাহার পত্রে বলিয়াছে বটে যে, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া চোখ বুজিয়া নিজেকে সমর্পণ করিবে বিভার হাতে। কিন্তু প্রণয়ের সব কথা কি সমান বিশ্বাসযোগ্য? চতুর সেনাপতি হটিয়া আসিয়া পাল্টা আক্রমণ করে, তার হটিয়া-আসা পরবর্তী জয়েরই যে ভূমিকা। অভীকের উক্তিকে কি সেভাবে নেওয়া যায় না?

আগে বলিয়াছি বটে যে অভীক, শচীশ অমিত রায় প্রভৃতির সমোপাদানে গড়া। কথাটা মিথ্যা নয়, আবার সম্পূর্ণ সত্যও নয়। উপাদান একই বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল ঘরের কোণে পড়িয়া থাকাতে তাহাতে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কালের পরিবর্তন উপাদানে বর্তাইয়াছে।

নদীর জলের গভীরতা মাপিবার উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে নিশানা পোঁতা হয়। সমাজস্রোতের গতি ও গভীরতা-মাপক হিসাবে কোনো কোনো রচনাকে লওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনাকে এ ভাবে দেখা যাইতে পারে। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির ধারা অনুসরণ করিলে আমাদের সমাজবিবর্তনের ইতিহাস পাওয়া যাইবে। চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ,

শেষের কবিতা, বাঁশরী, দুই বোন, মালঞ্চ, চার অধ্যায় ও তিন সঙ্গী—একাধারে সাহিত্যিক সৃষ্টি এবং সামাজিক ইতিহাসের দলিল। চোখের বালির সঙ্গে মালঞ্চের প্রভেদ, গোরার সঙ্গে শেষের কবিতার প্রভেদ, ঘরে বাইরের সঙ্গে চার অধ্যায়ের প্রভেদ আলোচনা করিলে অল্পকালের মধ্যে আমাদের সমাজে কি গভীর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে বুঝিতে পারা যাইবে। আবার, বাঁশরী সরকার আর কুমুদিনী কি একই সমাজের লোক? নৌকাডুবি ও তিন সঙ্গীর গল্পগুলি কি একই লেখকের লেখা? তিন সঙ্গী রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রোথিত সমাজস্রোতমাপক শেষ নিশানা। এটি কেবল রবীন্দ্রনাথের হাতে পোঁতা শেষ নিশানা মাত্র নয়, সমাজ-স্রোতেরও শেষ নিশানা—আর-কোনো লেখকের পাইলট নৌকা এখনো এই সীমা ছাড়াইয়া যায় নাই। অতিবৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ অতিতরুণও বটেন, সনাতনের বার্তাবাহী আধুনিকতার চূড়ান্ত, চিরন্তনের সংবাদ জানিলে তবেই অদ্যতনের দিশারী হওয়া সম্ভব।

শেষের কবিতা লিখিত হইবার পরেও সমাজের আরো অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কবিজীবনেরও বটে। কবির জীবনের কথাই ধরা যাক—অমিত রায়ের উপহাসের বিষয় ছিল রবিঠাকুরের কবিতা, রবিবার গল্পের উপহাসের বিষয় অভীককুমারের নূতন ধরনের ছবি। সেটা বেনামে রবীন্দ্রনাথেরই ছবি বটে। ইতিমধ্যে কবিশিল্পী চিত্রশিল্পী হইয়া উঠিয়াছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ছবির ধর্ম অনেক পরিমাণে পরবর্তী রচনায় সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে। তাঁর শেষের রচনাগুলির সঙ্গে তাঁর ছবির মিল বেশি, তারা যেন একই গুহামুখ হইতে নিঃসৃত। অভীককুমারের ছবিগুলি কেবল স্বতন্ত্র ধরনের নয়, সে নিজেও সমাজের আর-পাঁচজন হইতে আলাদা জাতের লোক। তার মধ্যে যে দুর্দম সমাজ-ছাড়া শক্তি আছে তাহার প্রকৃষ্ট তুলনা-স্থান রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত দুর্ধর্ষ রেখার চিত্রগুলি। উদ্ধৃত বর্শাফলায়-অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের দান্তে-বিয়াত্রিচে ছবির

প্রণয়ীযুগলের মতো অভীককুমার ও বিভা, 'শেষ কথা'য় ননীমাধব ও অচিরা, বিরহের অসিপত্রব্যবধানে মুখামুখি হইয়া দণ্ডায়মান, সংকোচের শেষ ব্যবধানটুকু আর তাহাদের কিছুতেই ঘুচিল না, কামনার যজ্ঞানলে মিলনের হবি-বিন্দুটি সন্তঃপাতিতার মুখেই রহিয়া গেল। কেবল যে-রেখার উপাদানে তাহাদের শরীর গঠিত তাহাদের তড়িৎশিখাতীব্র বন্যাশ্ব-চঞ্চল দুর্দম চঞ্চলতায় বুঝিতে পারা যায়, কি অধীর অসামাজিক আগ্রহের আসক্তি শীতান্তে জাগ্রত ভুজঙ্গচয়ের মতো রক্তে তাহাদের সর্পিল হইয়া ফিরিতেছে! তবু শেষ ব্যবধান ঘোচে না! চোখের বালিতেও শেষ ব্যবধান ঘোচে নাই, ঘরে বাইরেতেও নয়—কিন্তু সেখানকার বাধা সামাজিক —তিন সঙ্গীর গল্পগুলির বাধা কোথায়? বাধা যেখানেই হোক, আলোচনা আবশ্যক সামাজিক দলিল হিসাবে এবং কবির মানসিক দলিল হিসাবে। ল্যাবরেটরি গল্পটিতে এ-দুটি ধারার চরম।

একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। তিন সঙ্গী বইখানির তিনটি গল্পেরই প্রধান উপজীব্য বিজ্ঞানসাধনা, প্রধান ব্যক্তিরা সবাই বৈজ্ঞানিক। এমন-কি আর্টিষ্ট অভীককুমারকেও বৈজ্ঞানিক বলিতে বাধা নাই। এঞ্জিনিয়ারিং-এ তাহার আসক্তির জন্য এ কথা বলিতেছি না; জীবনের প্রতি তাহার সিরাসক্ত, নিরপেক্ষ, কর্মফলে আকাঙ্ক্ষাহীন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি—তাহাকে শিল্পের বৈজ্ঞানিক বলা যাইতে পারে। শেষ কথা গল্পের নবীনমাধব ও অধ্যাপক দুজনেই বৈজ্ঞানিক। ল্যাবরেটরি গল্পটার আগাগোড়াই বৈজ্ঞানিকতায় পূর্ণ। সোহিনী নিজে বৈজ্ঞানিক না হইয়াও বিজ্ঞানের উজ্জ্বল দীপটার চারি দিকে মুগ্ধ মক্ষিকার মতো ঘুরিয়া মরিয়াছে। তিন সঙ্গীতে বৈজ্ঞানিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই আকর্ষণের কারণ কি? ১৩৪৪ সালে বিশ্বপরিচয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিন সঙ্গীর গল্পগুলি ১৩৪৬ সাল হইতে ১৩৪৭ সালের মধ্যে লিখিত। বিশ্বপরিচয় লেখা শেষ হইয়া গেলেও বৈজ্ঞানিক আবহাওয়াটা কবির মনে

সক্রিয় ছিল, তাহারই রূপান্তর কি তিন সঙ্গীর গল্পগুলি? বিশ্ব-পরিচয়ে যাহা নির্গুণ, তিন সঙ্গীতে তাই যেন মনের কার্য ও নামধাম গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত। তিন সঙ্গীর বৈজ্ঞানিকতার ইহা একটা কারণ মনে হয়। অন্য কারণ থাকাও বিচিত্র নয়, অনুসন্ধান আবশ্যক। এই অনুসন্ধানের ফলে কবির মনের ও প্রতিভার বিবর্তনের নূতন দিগ্‌দর্শন প্রকাশিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

সোহিনী

সোহিনীর মতো নারী বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। অনেকে বলিবেন, সে তো বাঙালী মেয়ে নয়। কিন্তু সে যে বাঙালীর মানসকন্যা তাতে আর সন্দেহ কি। বাঙালী লেখকের মানসকন্যা হিসাবেই সোহিনীর বিচার করিতে হইবে, তার ফলে সোহিনীর ও সোহিনীর সৃষ্টিকর্তার দুজনেরই পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা।

নন্দকিশোর লণ্ডনের পাশ-করা এঞ্জিনিয়ার, তার উপরে সে প্রতিভাবান ব্যক্তি। এ দুয়ের সমন্বয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সে প্রচুর টাকা উপার্জন করিয়া ফেলিয়াছিল। সে টাকা 'জপতপের টাকা' নয়—নন্দকিশোরের টাকা সাধুপন্থায় তার পকেটে আসে নাই। কিন্তু তাহাতে তার ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। তার বিশ্বাস এই যে, সাধু উদ্দেশ্য অসাধু টাকাকে সংশোধন করে। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, দেশে বিজ্ঞানসাধনার রাজপথটা খুলিয়া দিবে। এই উদ্দেশ্যে সে একটি বৃহৎ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই ঘটনার মুখে সোহিনীর সঙ্গে তার পরিচয়। নন্দকিশোরের টাকার মতোই সোহিনীর গায়েও অসাধ্বীতার ছাপ ছিল। কিন্তু তেমনি আবার দুয়ের মধ্যেই ছিল খাঁটি বস্তু। নন্দকিশোর ও সোহিনী প্রথম দর্শনেই পরস্পরকে চিনিল। নন্দকিশোর সোহিনীকে বিবাহ করিয়া একই সঙ্গে তাহাকে সহধর্মিণী ও সহকর্মিণী করিয়া লইল। সে বুঝিয়াছিল যে, মেয়েটি তাহার দুরূহ বিজ্ঞান-সাধনার উত্তরসাধিকা হইবার যোগ্যা। সোহিনীর কন্যা নীলিমা।

ল্যাবরেটরি পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিবার আগেই নন্দকিশোরের মৃত্যু ঘটিল। সে রাখিয়া গেল প্রচুর টাকা ও ল্যাবরেটরির অসমাপ্ত কাজ। সোহিনী সেই অসমাপ্ত সূত্র তুলিয়া লইল। কিন্তু শুধু যন্ত্রে তো কাজ হয় না, উপযুক্ত যন্ত্রী চাই। যন্ত্রী জোগাড়ের উদ্দেশ্যে সে তৎপর হইল। ইহাই তাহার সতীকর্ম হইয়া উঠিল।

সতীধর্ম সম্বন্ধে তাহার মনে কোনো মোহ ছিল না। প্রাক্-বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবন তাহার নিষ্কলুষ নয়। এ-সব কথা নন্দকিশোর জানিত, সোহিনীও নিজ মুখে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। কিন্তু এক জায়গায় সে খাঁটি ছিল, নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরি ও বিজ্ঞানসাধনার কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে তাহার মনে পাতিব্রত্যের অভাব ছিল না। এইজন্যই তাহার পাতিব্রত্যকে সতীধর্ম না বলিয়া সতীকর্ম বলিয়াছি। পতির কর্মে সে সতীর চরম। সে যতটা সহধর্মিণী তার চেয়ে অনেক বেশি সধর্মিণী। তাহার সতীত্বকে 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল' সতীত্ব বলা যাইতে পারে। সাধারণ সতীধর্ম কায়মনোবাক্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সোহিনীর সতীত্বের একমাত্র প্রতিষ্ঠা তাহার বুদ্ধি ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি। সাধারণ মাপকাঠিতে সে নিশ্চয়ই সতী নয়—কিন্তু একটা অসাধারণ মাপকাঠিও যে থাকিতে পারে, সোহিনীর চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইজন্যই গোড়াতে বলিয়াছিলাম, সোহিনীর মতো নারী-চরিত্র বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

দুর্লভ, কিন্তু একেবারে নাই এমন নয়। সোহিনীর প্রবল ইচ্ছাশক্তি, দুর্দমনীয় ভোগস্পৃহা, প্রখর বুদ্ধির ধার অনেক পরিমাণে দেবযানীর চরিত্রে প্রাপ্য। কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব বেশি নয়। পৌরাণিক কাহিনীর কাঠামোর দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ; কালান্তরে দেবযানী সোহিনী হইয়া উঠিতে পারিত, এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারা যায়। তার বেশি কিছু বলিবার নাই। বিনোদিনীতেও সোহিনী-চরিত্রের আদ্‌রা পাওয়া যায়—কিন্তু সে সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজের ও ভিন্ন কালের মেয়ে। সোহিনী-চরিত্রের অনুরূপ মিলিবে রবীন্দ্রনাথের শেষবয়সের রচনায়। বাঁশরী সরকার, ঊর্মিমালা, নীলিমা সোহিনীর উপাদানে, সোহিনীর প্রতিমায় গড়া—কিন্তু এই ধারার একেবারে চূড়ান্ত সোহিনী; কেবল এই ধারাটার চূড়ান্ত মাত্র নয়, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট নরনারীর শেষতম প্রান্তে অধিষ্ঠিত

সোহিনী। আপন সৃষ্টি-শিখরের চূড়ান্তে সোহিনীরূপ আগ্নেয় কিরীট পরাইয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দিব্য লেখনীর লীলা সংবরণ করিয়াছেন। সোহিনী অস্তগমনোন্মুখ রবির শেষকীর্তি হইয়াও মধ্যাহ্নজ্বালায় ভাস্বর, সায়াহ্নের গৈরিক তাহাকে এতটুকুও কোমল করিতে পারে নাই। কেন এমন হইল, সে রহস্য ভেদ করিতে পারিলে সোহিনীর স্রষ্টার একটা গূঢ় পরিচয় পাওয়া যাইবে মনে হয়। সায়াহ্নের সূর্যকিরণে মধ্যাহ্নের অপ্রত্যাশিত অন্তর্জ্বালা আসিল মানব-মনোরহস্যের কোন্ সূত্রপথে? জীবনের অপরিশোধিত কোন্ ঋণ সায়াহ্নের গৈরিক ঝুলি মধ্যাহ্নের স্বর্ণমুদ্রায় এমনভাবে নিঃশেষে শোধ করিয়া দিল? এর রহস্যের অনুসন্ধান আবশ্যক

২

কবির রহস্যলোক-অবরোহণের তিনটি ধাপ বর্তমান—গদ্যকবিতা, চিত্র ও শেষবয়সে লিখিত কয়েকটি গল্প; সবগুলিই তাঁহার শেষবয়সের কীর্তি। তাঁহার অন্যান্য রচনার সঙ্গে ইহাদের প্রভেদ এই যে প্রথমবয়সের রচনাগুলি পর্বে পর্বে, ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়াছে, আর শেষবয়সের রচনাগুলি, তন্মধ্যে চিত্রও অন্যতম, মনোরহস্যের রসাতলে অবরোহণমুখী। প্রথম বয়সের রচনা উচ্চেতনমুখী। উচ্চেতন বলিতে বুঝি ব্যক্তিগত চৈতন্যের ঊর্ধ্বে যে বিশ্বব্যাপী চৈতন্যলোক আছে তাহাই, ইহাকে বলিতে পারি বিশ্বচৈতন্য। আর অবচেতনা থাকে ব্যক্তিগত মনের অস্পষ্ট অন্ধকারে, জ্ঞানের সাধারণ আলোক সেখানে প্রবেশ করে না বলিয়া সেই রহস্যলোক সাধারণত অজ্ঞাত রহিয়া যায়। বিশ্বচৈতন্যে উন্নীত হইতে যেমন অনুপ্রেরণার আবশ্যক, অবচেতনার গহ্বরে নামিতেও তেমনি অনুপ্রেরণার আবশ্যক, অননুপ্রেরিতের পক্ষে দুই-ই দুষ্প্রবেশ্য। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, দুই জাতীয় অনুপ্রেরণাই তাঁহার জীবনে কার্যকরী হইয়াছে—উচ্চেতনমুখী প্রথম দিকে, আর

অবচেতনমুখী শেষ দিকে। শেষোক্ত অনুপ্রেরণার ইতিহাস বর্তমান তাঁহার গদ্যকবিতায়, চিত্রাবলীতে এবং তিন সঙ্গী জাতীয় গল্পে।

তবে সবগুলিতেই অনুপ্রেরণার তেজ সমান প্রবল নহে, গদ্যকবিতায় অপেক্ষাকৃত মৃদু, তাহার দ্বিধা যেন সম্পূর্ণ কাটে নাই; চিত্রে ল্যাবরেটরি গল্পে প্রবল, তখন সে নিঃসংশয়। রবীন্দ্রনাথ কেবল ত্রিকালদর্শী নহেন, ত্রিলোকদর্শীও বটেন। চেতন উচ্চেতন ও অবচেতন তিন লোকেরই সংবাদ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

গদ্যকবিতায় যে জাতীয় বিষয়বস্তু তিনি অবতারণা করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ববর্তী কাব্যে তাহা নাই, এমন-কি ছোটো গল্পেও বিরল। অভিজ্ঞতার নূতন ক্ষেত্রে বিচরণের উদ্দেশ্যেই কবিতার গদ্যময় রূপটি তিনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। বাঁশি নামে পরিচিত কবিতাটিতে রবীন্দ্র-রচনার সহিত তাঁহার একটা আন্তরিক অমিল আছে। তাঁহার পরিচিত সংসারের একান্তে দুর্ভাগ্যের যে আস্তাকুঁড় বর্তমান, সেখানে তিনি প্রথম পদার্পণ করিয়াছেন—অবচেতন লোকে নামিবার গুহাদ্বারটা যে ঐ আস্তাকুঁড়ের নিকটেই। কিন্তু পূর্বতন সংস্কার কাটাইয়া না উঠিতে পারিবার ফলে সেখানে একবার মাত্র পা ফেলিয়াই তিনি আবার উচ্চেতনলোকে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই কবিতাটির সমাপ্তি তাহার সূত্রপাতকে সমর্থন করে না। এটা যেন উচ্চেতন ও অবচেতন লোকের সীমান্ত।

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রগুলি অবচেতন লোকের বার্তাবাহী। ছবিগুলির কালানুক্রমিক বিবর্তন আলোচনা করিলেও খুব সম্ভব একটা ক্রমবিকাশের চিহ্ন পাওয়া যাইবে—কিন্তু মোটের উপরে ইহাদের অবচেতন বার্তাবাহিতা নিঃসংশয়। রবীন্দ্রচিত্রে নরনারীর স্বাভাবিক রূপ বিরল, যাহা আছে তাহাও যেন গুপ্ত অভিজ্ঞতার আলোতে বিকৃত। স্বাভাবিক গাছপালার চিত্র অল্প হইলেও মানবমূর্তির চেয়ে সংখ্যায় বেশি। সংখ্যাগৌরবে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুজানোয়ারের রূপ সুপ্রচুর। কিন্তু বোধ করি সংখ্যায় সবচেয়ে

অধিক এমন-সব জন্তুজানোয়ার ও উদ্ভিদ যাহাদের অনুরূপ মানুষের অভিজ্ঞতার বাহিরে। তাহারা কোনো কিছুর অনুরূপ নয়—তাহারা নিছক রূপ। শিল্পবিচারে 'Imitation Theory' বলিয়া একটা পথ আছে, 'Imitation' বস্তুসাপেক্ষ তাহা বস্তু-আশ্রয়ী সত্য, কিন্তু এই ছবিগুলির মূলে কোনো বস্তুভিত্তি না থাকায়, ইহা কোনো কিছুর 'Imitation' নয়, কোনো কিছুর সত্য নয়, ইহা নিছক সত্য। এ যেন এমন কতকগুলি বস্তু যাহাদের ছায়া পড়ে না। কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করিবার উপায় না থাকাতে ইহাদের অবাস্তব মনে হওয়া অসংগত নয়। কিন্তু বস্তু ও তাহার ছায়ার মধ্যে ছায়াটাই কি অধিকতর বাস্তব? ছায়াটাই তো অপেক্ষাকৃত অবাস্তব। ছায়া লইয়া যাদের কারবার, সেই অবাস্তববিলাসীদের জন্য প্লেটো তাঁহার 'রিপাবলিকে' একটু স্থানও রাখেন নাই। গুরুর এই একদেশদর্শিতার প্রতিবাদেই যেন অ্যারিস্টটলকে 'Imitation Theory' খাড়া করিয়া শিল্প ও সাহিত্যকে সমর্থন করিতে হইয়াছিল। শিল্পবিচারের Imitation Theory বা Criticism of Life theory, কোনো থিয়োরিই অবচেতন লোকের শিল্প-বিচার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। শেষোক্ত থিয়োরি অনুসারেও বিচারের জন্য একটা অনুরূপ আবশ্যক। এই অনুরূপকেই ম্যাথু আর্নল্ড 'moral ideas' বলিয়াছেন। তাঁহার মতে application of ideas to life-দ্বারাই কাব্যের মহত্ত্ব প্রমাণ হয়—আর application of ideas to life বলিতে দুটা বস্তু বোঝায়, idea ও life। কিন্তু বস্তু যেখানে দুটা নয়, মাত্র একটা, সেখানে criticism of life থিয়োরি সম্পূর্ণ অচল। কারণ এ-সব ছবিতে life ও idea দুটা নাই, মাত্র ideaটাই আছে এবং সে ideaটাও অবচেতনলোকের idea (খুব সম্ভব সেখানে idea ও reality অভিন্ন), সেখানে সাহিত্য ও শিল্প-বিচারের মাপকাঠি অচল। রবীন্দ্রনাথের ছবি এমন এক জগৎ যাহার মাপকাঠি ও কম্পাস এখনও অনাবিষ্কৃত।

এখানকার নদী নদীমাত্র, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার জানিবার উপায় নাই; এখানকার জন্তু-জানোয়ার রূপ মাত্র, তাহার অধিক নয়; এখানকার স্বল্পসংখ্যক নরনারীও নিছক রূপ, অতিরিক্ত কিছুই নয়। ইহা নিছক রূপময় জগৎ। রবীন্দ্রনাথ জাগতিক রূপ হইতে অরূপ লোকে উত্থিত হইয়াছেন—ইহাই রবীন্দ্র-সাহিত্য ও শিল্পের সাধারণ পরিচয়। জাগতিক রূপে ও অরূপে একটা সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু তাঁহার ছবির জগতে কেবল রূপটাই আছে, কোনো অরূপলোকের সঙ্গে তাহাকে equate করা, সম্বন্ধযুক্ত করা, সম্ভব নহে। ইহা কি তাঁহার প্রতিভার ঐকান্তিক অরূপসাধনার nemesis?

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অবচেতনের আকস্মিক অভ্যুদয়ের কারণ কি? তাঁহার পূর্বতন রচনা উচ্চেতনামূলক, তাহার লক্ষণ শান্তি সংযম ও শালীনতা। তাহাদের স্থলে অধীরতা ও উদ্দামতার বিকাশের কারণ কি? সারাজীবনের সাধনালব্ধ ভারসাম্য হঠাৎ নষ্ট হইতে গেল কেন? অবচেতনলোকের সংবাদ আবর্তিত হইয়া উপরিতলে উঠিবার ফলেই অবশ্য এমন ঘটিয়াছে। কিন্তু সহসা এই আবর্তন কেন? বৃদ্ধবয়সে সজ্ঞান চেতনার মুষ্টি শিথিল হইলে অনেক সময়ে এমন হইয়া থাকে। সচেতন মনের মতো অচেতন মনেরও একটা দাবি আছে। বৃদ্ধবয়সের সাধারণ দাবি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আরও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথের যে কঠিন পীড়া হইয়াছিল, সেই সময়ে লুপ্তচৈতন্য অবস্থায় অবচেতন মনে অবগাহনের যে অভিজ্ঞতা তাঁহার ঘটিয়াছিল, সেটাকেও একটা কারণ বলিয়া মনে হয়। এই পীড়ার পরে প্রান্তিক কাব্যের অধিকাংশ কবিতা লিখিত। কাব্যখানিতে এমন-সব কবিতা আছে, কেবল সজ্ঞান মনের পরিপ্রেক্ষিতে যাহা দুর্বোধ্য। অবচেতন

মনে অবগাহনজনিত অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখিলে তবেই তাহাদের বুঝিয়া উঠা সম্ভব।

বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে…
কোন্ ক্ষণে নটলীলা-বিধাতার নব নাট্যভূমে
উঠে গেল যবনিকা…
বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

এ সেই অচেতনলোক।

এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
নিরাসক্ত নির্মমের পানে।

এ দেশ অবচেতনলোক।

সত্য মোর অবলিপ্ত সংসারের বিচিত্র প্রলেপে,
বিবিধের বহু হস্তক্ষেপে, অযত্নে অনবধানে
হারালো প্রথম রূপ, দেবতার আপন স্বাক্ষর
লুপ্তপ্রায়; ক্ষয়ক্ষীণ জ্যোতির্ময় আদিমূল্য তার।

সজ্ঞান দৃষ্টি অবচেতনলোককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল—এবারে সেই অজ্ঞাত লোকের সন্ধান পাওয়া গেল।

রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে দীপশিখা

*   *   *

দেখিলাম—অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতি-পুঞ্জ।

*   *   *

মৃত্যুদূত এসেছিল হে প্রলয়ঙ্কর, অকস্মাৎ
তব সভা হতে। নিয়ে গেল বিরাট প্রাঙ্গণে তব,
চক্ষে দেখিলাম অন্ধকার।

সজ্ঞান চৈতন্যের দীপ নিবিল, অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায় দেহখানা তাহার অভ্যস্ত অনুভূতিপুঞ্জ বহন করিয়া অবচেতনলোকের বিরাট প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইল। ব্যাধির বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরে কবি পুনরায় সজ্ঞান মনের অভ্যস্ত ক্ষেত্রে ফিরলেন বটে, কিন্তু কিছু সঙ্গে করিয়াও আনিলেন।

পশ্চাতের নিত্য সহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার।

প্রেতভূমিচারী অতৃপ্ত তৃষ্ণার ছায়ামূর্তির মতো অকৃতার্থ অতীতের স্মৃতি কবির সঙ্গে সজ্ঞান মনের ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাঁহার পরবর্তী অনেক রচনায় তাহাদেরই পদচিহ্ন।

এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে,
বিকারের রোগীসম অকস্মাৎ ছুটে যেতে চাওয়া
আপনার আবেষ্টন হতে।

পূর্বোক্ত প্রেতের হাতছানিই তাঁহাকে বারংবার অভিজ্ঞতার অভ্যস্ত ক্ষেত্র হইতে উধাও করিয়া দিয়াছে—আর তাহারই ইঙ্গিতচারী কবি সোহিনীর অভিনব অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

প্রান্তিক রবীন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন না হইতে পারে, কিন্তু নিঃসংশয়ে ইহা একটি পতাকীস্থান, সজ্ঞান মন ও অবচেতন মনের সীমান্তে এই পতাকা প্রোথিত। এই সাধারণ কথাটি মনে রাখিলে পরবর্তী অনেক রচনার রহস্য প্রকাশ সহজ হইবে। বৃদ্ধবয়সের দরুণ

সজ্ঞান চৈতন্যের মুষ্টি শিথিল হওয়াতে পূর্ব হইতেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে ও চিত্রে অবচেতন সৃষ্টির চিহ্ন দেখিতে পাই, আর ১৯৩৭-এর ব্যাধির অভিজ্ঞতায় অবচেতনলোকের সহিত মুখোমুখী হইবার পরে উভয় মনের সিংহদ্বার খুলিয়া যাওয়াতে তিন সঙ্গীর গল্পগুলিকে পাই। এই নূতন অভিজ্ঞতার চরম সোহিনী-চরিত্রে। সোহিনী অকৃতার্থ অতীতের সুযোগ্য প্রতিনিধি। প্রান্তিক কাব্যে যাহার নির্গুণ তত্ত্ব, ল্যাবরেটরি গল্পে তাহার সগুণ মূর্তি। সুদীর্ঘ কবিজীবনের ইহা যে উপান্ত রচনা, তাহা বোধ করি নিরর্থক নয়; কারণ ইতিপূর্বে তাঁহার হাত হইতে পাইয়াছি চেতন মনের ও উচ্চেতন মনের সৃষ্টি, অবচেতন মনের সৃষ্টি না পাইলে রবীন্দ্রকীর্তি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। রূপের সাধনা হইতে অরূপের সাধনায় যিনি পৌঁছিয়াছিলেন, গত রূপের সাধনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া অভিজ্ঞতার জপমালা-আবর্তন তিনি সুসমাপ্ত করিলেন। সোহিনী-চরিত্র সমাপ্তির সেই সন্ধিস্থান—সেই হিসাবেই তাহার চরম মূল্য।

বিবিধ-বিষয়ক

রবীন্দ্রসাহিত্যে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস

বাল্মীকির রামায়ণের শ্রেষ্ঠ চরিত্র রামচন্দ্র। রামায়ণে অনেক বৃহৎ ও বিচিত্র নরনারী-চরিত্র আছে সত্য, কিন্তু রাম-চরিত্র সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, বাল্মীকির কল্পনায় তিনি আদর্শ মানব। আবার মহাভারতেও অনেক বৃহৎ ও বিচিত্র নরনারী আছে সত্য, কিন্তু কৃষ্ণ-চরিত্র সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কল্পনায় কৃষ্ণই আদর্শ মানব। ভারতবর্ষীয় কবিকল্পনা রাম ও কৃষ্ণের চরিত্রে তুঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে; আজ পর্যন্ত এ দুটি চরিত্রেই ভারতীয় কল্পনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। রামায়ণের রাম-চরিত্র একটি অম্লান শুভ্র রাজচ্ছত্রের ন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষের মাথার উপরে বিস্তৃত থাকিয়া কত শোকতাপ নিবারণ করিতেছে! আবার কৃষ্ণ-চরিত্র সমগ্র ভারতখণ্ডের আকাশে কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের মতো চিরবিরাজমান থাকিয়া যুগে যুগে কত-না রস বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে!

রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু ইহা জানি তাঁহারা কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তির চেয়ে কম সত্য নহেন, বাস্তব সত্য এখানে কল্পনার সত্যের কাছে পরাজিত।

বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পরে কালিদাস ও তুলসীদাস আর দুইজন ভারতীয় মহাকবি। নানা কারণে পৌরাণিক যুগের কবিদের সহিত ঐতিহাসিক কালের কবিদের তুলনা করা সঙ্গত নয়। আর চরিত্রসৃষ্টিতেই যে কবিত্বের একমাত্র বিকাশ তাহাও নয়। এ-সব কথা মনে রাখিয়াও বলিতে পারা যায় যে, তাঁহারা কেহই পৌরাণিক কবিযুগলের কাছে ঘেঁষিতে পারেন নাই। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র উমা ও শকুন্তলা। তাহারা দুইজনেই অতিশয় কোমল ও স্পর্শকাতর, সূক্ষ্মশিরা তন্তুতে তাহাদের দেহ গঠিত; সীতা ও দ্রৌপদীর সুমহৎ বীর্যের অধিকারিণী তাহারা নয়। কালিদাসের কালে নূতনতর সীতা বা দ্রৌপদী গড়া সম্ভব ছিল না, মানুষের মন অনেক সূক্ষ্মরসগ্রাহী

হইয়া উঠিয়াছিল। তুলসীদাসের রামচরিতমানসের রামের কল্পনা বাল্মীকির কল্পনাশ্রিত, তাহাতে তুলসীদাসের মৌলিক কৃতিত্ব বিশেষ কিছু নাই।

কালিদাস ও তুলসীদাসের পরে এ দেশে মহাকবির সন্ধান করিতে গেলে একেবারে রবীন্দ্রনাথে আসিয়া পড়িতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা বিশ্বস্পর্ধী—অনেক ক্ষেত্রেই তিনি প্রাচীন কবিগণের সহিত সার্থকভাবে প্রতিস্পর্ধা করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও বলিতে হয় যে, তিনি রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মতো নিখিলমানবরসসম্পন্ন চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন নাই। খুব সম্ভব তাঁহার কালে তাহার সমর্থন ছিল না, খুব সম্ভব তাঁহার প্রতিভার প্রকৃতি অন্যরূপ। আর আগেই তো বলিয়াছি যে, কবিত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ যে মহৎ চরিত্র কল্পনার পথেই হইবে এমন কথা নাই।

রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ -চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সর্বব্যাপী ও সর্বরসের আধার, এবং এই দুটি গুণের ফলেই হাজার হাজার বছর ধরিয়া তাঁহারা এই মহাদেশোপম ভূখণ্ডের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছেন, আদর্শের তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করিতেছেন। এ দুটি চরিত্রের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠতর জানি না; গান্ধীজি বলিবেন—রামচন্দ্র; বঙ্কিমচন্দ্র বলিবেন, শ্রীকৃষ্ণ। সে গূঢ় তর্কে প্রবেশ না করিয়াও অনায়াসে বলা যায় যে, মানুষের মনে পূর্ণ মানবের যে আদর্শ বিরাজিত এ দুটি চরিত্র প্রায় তাহার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে, পূর্ণমানবপরিকল্পনার মানুষ বোধ করি সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিক কালে ভারতবর্ষে কত-না মহামানব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; বুদ্ধ আছেন, অশোক আছেন, আরও কতজন আছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই মহাকবির লেখনীযোগে অমরত্ব লাভ করেন নাই, বাস্তব সত্যের বলেই অমর হইয়া রহিয়াছেন। রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সেইরূপ বলা যায় কি না সন্দেহ। তাঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ওকালতিই প্রমাণ

হইয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি রূপে চালাইয়া দেওয়া কত কঠিন। অন্তত কোনো ঐতিহাসিক তাঁহাদের ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কিন্তু এখানেই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। তাঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, তৎসত্ত্বেও সত্য, কারণ সত্য ইতিহাস-নিরপেক্ষ। 'রামজন্মের পূর্বে রামায়ণ-রচনা' প্রবাদে ইহারই সমর্থন। অর্থাৎ বাল্মীকি ও ব্যাস রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ -চরিত্র অঙ্কনে বাস্তব সত্যের অনুসরণ করেন নাই, সুমহৎ কবিকল্পনার ইঙ্গিতের শরণ লইয়াছিলেন। কল্পনার সত্যকে তাঁহারা এমন ভাবে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাহা বাস্তব সত্যের চেয়েও এমন অধিকতর প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন লোকে তাঁহাদের ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করে। আমার এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কবিকল্পনা যাহাকে সত্য মনে করে তাহাই সত্য, বাস্তব সত্য তাহার তুলনায় গৌণ। আরও একটি কথা, বাল্মীকি ও ব্যাস স্ব-স্ব কালে ঐরূপ এক-একটি পূর্ণমূর্তি সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন তাহা আর সম্যক্ বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাঁহাদের কালের তথ্যপরিবেশ এখন চিরকালের জন্য অবলুপ্ত; কেবল সত্য হইয়া রহিয়াছে তাঁহাদের কালের বেদনা-সঞ্জাত ঐ মহামানবের চরিত্র।

এবারে বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ের প্রত্যক্ষ আসরে আসা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ব্যাস বা বাল্মীকির মতো সর্বব্যাপী ও সর্বরসাধার চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই সত্য, কিন্তু বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত এমন-সব ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেগুলিকে একটি পরিকল্পনার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত করিলে একটি সুমহৎ চরিত্রের আভাস যেন পাওয়া যায়। কোনো একটা ইঙ্গিত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, কিন্তু সবগুলিকে পর পর বিন্যস্ত করিলে একটি অখণ্ড ধারণার সৃষ্টি করে। একটি ইঙ্গিত ও অপরটির মধ্যে অনেক সময়ে দীর্ঘ কালের ব্যবধান, কিন্তু তাহাতেই কি

বুঝিতে পারা যায় না যে, চরিত্রের আদর্শটি একেবারে কবিকল্পনার উৎস-মূলে আশ্রিত? আবার কোনো ইঙ্গিতটিকেই সচেতন চরিত্র-সৃষ্টিপ্রয়াস বলা যায় না। কিন্তু মহৎ কবিকল্পনা যে সচেতনপ্রয়াস নয়, ইহা তো অত্যন্ত সুবিদিত।

কেন এমন হইল? প্রথম কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথের কালের বেদনা তাঁহাকে একটি মহৎ আদর্শমানবের জন্য উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যাস ও বাল্মীকির সৃষ্টিপ্রয়াস সম্বন্ধে যাহা এখন আর জানিতে পারা যায় না, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপ্রায়াস সম্বন্ধে তাহা জানিতে পাইতেছি; আমরা রবীন্দ্রনাথকেও জানি, আবার রবীন্দ্র-নাথের কালকেও জানি। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাস্তব সত্য অনেক সময়েই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবার আগেই কবিকল্পনার দর্পণে নিজেকে আভাসিত করিয়া তোলে—সেইজন্যই 'রামজন্মের পূর্বে রামায়ণরচনা' একেবারে অসম্ভব নয়।

এখন, এ দুটি কারণ স্মরণে রাখিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত পূর্বোক্ত ইঙ্গিতগুলিকে যদি পর পর কালানুক্রমে বিন্যাস করিয়া লই, তবে একটি মহামানবের আভাস চোখে পড়িবে। এবং সেই মহামানবের কাল্পনিক আভাসের সঙ্গে এ যুগের একজন মহামানবের বাস্তব রূপের অপ্রত্যাশিত সাদৃশ্য দেখিতে পাইব। সেই বাস্তব—মহামানব গান্ধী। গান্ধীর নামটিও জানিবার আগে রবীন্দ্রনাথ আভাসে গান্ধী-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। রামজন্মের পূর্বে আর একবার রামায়ণ লিখিত হইয়াছে, এবং এই দাবির বলে নবীন ভারতের মহর্ষিকবি প্রাচীন ভারতের কবি-মহর্ষিদ্বয়ের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

২

এবারে রবীন্দ্রসাহিত্যের গদ্য-পদ্য হইতে কতক উদ্ধার করিব। গান্ধী-চরিত্র সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তিনিই ঐ-সব

অংশের সহিত গান্ধীচরিত্রের ঐক্য দেখিতে পাইবেন—সে ঐক্য এমনি প্রকট যে, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

এখানে বলিয়া রাখি, এখানে কেবল সেই দৃষ্টান্তগুলিই উদ্ধৃত হইবে যাহা লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির নামটি পর্যন্ত জানিতেন না; কেবল একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইবে, যখন তিনি নামটি জানিয়াছেন, কিন্তু তখনো মানুষটিকে চাক্ষুষ দেখেন নাই। আর-একটি কথা। গান্ধীজিকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার পরে এই শ্রেণীর আভাস রবীন্দ্রসাহিত্যে আর পাওয়া যায় না, কেন যায় না বোঝা কঠিন নয়, আভাস তখন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, বাস্তবরূপে যে-মানুষ ভারতবর্ষে বিচরণ করিতেছে কবির লেখনী তখন তাহাকে দেখাইবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি লইয়াছে। আরও একটি কথা, এই-সব ইঙ্গিত যে গান্ধী-চরিত্রের পূর্বাভাস, এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানিতেন না। জিজ্ঞাসিত হইলেও খুব সম্ভব অস্বীকার করিতেন। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না; কবিত্বের ব্যাখ্যায় কবিকে অস্বীকার করা অন্যায় নয়, বিবাহের আয়োজন ব্যাপারে বেচারা বরই সবচেয়ে উপেক্ষিত হইয়া থাকে। এ-সব ইঙ্গিত কবির সচেতন অভিপ্রায় নয় বলিয়াই এগুলির মূল্য সমধিক, এ কথা কিছুতেই ভোলা উচিত হইবে না।

প্রথম উদাহরণ :

মানসী কাব্যের অন্তর্গত গুরুগোবিন্দ কবিতাটি প্রথম উদাহরণ। রচনাকাল ১৮৮৫; গান্ধীজির নাম তখন তাঁহার পরিবারের বাহিরে কে জানিত?

গুরুগোবিন্দ তাঁহার শিষ্যদের কাছে নিজের সাধনোত্তর সার্থকতার কথা বলিতেছেন—

'আয়, আয়, আয়, ডাকিতেছে সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।

বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙ্গে বাহিরায় সব পরিবার,
সুখ সম্পদ মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে।

*　　　*　　　*

যত আগে চলি, বেড়ে যায় লোক
ভ'রে যায় ঘাট বাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান-অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।

*　　　*　　　*

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব
পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ।

নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগু-পিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ
নাই তার কাছে জীবন মরণ
নাই, নাই আর কিছু।
হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মতো—

উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখো কতদূর হ'তে
তোমার কাছেতে ধরা দেবে ব'লে
আসে লোক কত শত।'

গুরুগোবিন্দ সিংহ মহাপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু নিরক্ষেপ ঐতিহাসিক মাত্রেই বলিবেন যে, এক্ষেত্রে কবিকল্পনা বাস্তব সত্যকে অনেকদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আবার গান্ধীচরিত্রজ্ঞাতা পাঠককে বলিতে হইবে যে, এ ক্ষেত্রে বাস্তব সত্য কল্পনাকে পিছনে ফেলিয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। কবির বর্ণিত চিত্র গান্ধী-চরিত্র ও গান্ধীকীর্তি সম্বন্ধে যেমন সত্য, এমন গুরু গোবিন্দ সম্বন্ধে নয়। বস্তুত কবির কাছে গুরুগোবিন্দ উপলক্ষ্য মাত্র, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ একজন মহামানবের চিত্র আঁকিতেছিলেন এবং সে অঙ্কনপ্রয়াসের মূলে ছিল তাঁহার কালের বেদনা ও আকাঙ্ক্ষা।

'আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ'

ইহা গুরুগোবিন্দ সিংহের পক্ষে আকাঙ্ক্ষা, কবির পক্ষে কল্পনা, কিন্তু গান্ধীজির পক্ষে ইহা বাস্তব সত্য, এবং তাহা আমাদের চোখের উপরেই এমন ভাবে ঘটিয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের আর-কোনো মহামানব নিজের জীবনকালে এমন সার্থক দাবি করিতে পারেন নাই। তাই বলিয়াছিলাম যে, এ ক্ষেত্রে বাস্তব-সত্য কল্পনাকে ডিঙাইয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ :

নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭২, ৭৭, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬ সংখ্যক চতুর্দশপদীগুলি। নৈবেদ্য গ্রন্থের প্রকাশ-কাল ১৯০১ সাল।

গুরুগোবিন্দ কবিতায় যাহা চিত্রাকারে এবং চরিত্রাকারে ব্যক্ত এখানে তাহা আইডিয়া বা ভাবাকারে প্রকাশিত। চিত্র বা চরিত্রের

যে মূল্য দিতেছি, আইডিয়ার মূল্য এ ক্ষেত্রে তত নয়, কারণ আইডিয়া স্বভাবতই অনেকটা নির্গুণ; চিত্র যেমন রঙে রসে ভাবকে প্রকাশ করিতে সক্ষম, অপেক্ষাকৃত নির্গুণ আইডিয়া তেমন পারে না। তৎসত্ত্বেও বর্তমান প্রসঙ্গের মধ্যে এই কবিতাগুলিকে নিক্ষেপ করিয়া দেখিলে একটা বিশেষ অর্থ পাওয়া যায় এবং পরবর্তী কালে দৃষ্ট গান্ধীচরিত্রের মহিমার এক দিক উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

নূতন ভারতের জীবনাদর্শ, পাশ্চাত্ত্যের জীবনাদর্শের সঙ্গে কোথায় তাহার প্রভেদ, এবং লোভদ্বন্দ্বঈর্ষাসঙ্কুল বর্তমান পৃথিবীতে নূতন ভারত কর্তৃক আশার বাণী দান—ইহাই কবিতাগুলির মর্ম' এখন গান্ধীজির কীর্তি ও বাণী নূতন ভারতকে যে প্রতিষ্ঠানভূমি দিয়াছে এবং পৃথিবীর চোখে ভারতকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে তাহার সঙ্গে মিলাইয়া যদি কবিতাগুলি পড়ি, তবে মনে না হইয়া পারে না যে, বাস্তব সত্য রূপ পরিগ্রহ করিবার আগেই কবির কল্পনা যেন গান্ধী-বাণীকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্যের প্রতি আমাদের যে সূক্ষ্ম মোহ ছিল, গান্ধী যাহার প্রতি শেষ আঘাত হানিয়াছিলেন, এই কবিতাগুলিতে যেন তাহার পূর্বাঘাত ধ্বনিত হইতেছে।

তৃতীয় উদাহরণ :

"মনে হইতেছে, আমাদের মধ্যে কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, যিনি ভারতবর্ষের সম্মুখে ভারতবর্ষের পথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবেন, যিনি আমাদের অন্তরের মধ্যে এই কথা ধ্বনিত করিয়া তুলিবেন যে, আমরা ভারতবাসী, আমরা ফিরিঙ্গি নই, আমরা বর্বর নই, আমাদের লজ্জার কোনো কারণ নাই। যিনি ঘোষণা করিবেন ভারতের কাম্য মুক্তি।" (১৯০২ সাল)

চতুর্থ উদাহরণ :

এবার তিনটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি; প্রথম দুটি 'রাজা-প্রজা' গ্রন্থ হইতে আর শেষেরটি 'স্বদেশ'-গ্রন্থ-ভুক্ত। দু'খানি

গ্রন্থেরই প্রকাশকাল দেখিতেছি ১৯০৮ সাল; রচনাকালও খুব বেশি আগে নয়।

"শিখদিগের শেষ গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানাজাতির নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতিসাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সমস্ত দেশ অনিবার্য বেগে অন্ধকারে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহু যত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিতজ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে, তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন **আমাদের চিরপরিচিত ভাষায়** আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হোক সহসা চৈতন্য হইবে, একদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সঙ্কটের পথে চলিতেছিলাম, সেইটাই পতনের উপত্যকা। আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই; তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে, মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন; কোনো একটা বিশেষ আইন সংশোধন বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের কোনো যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে, আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে আকর্ষণ করিতেছেন।"[১]

---

১ ইংরাজ ও ভারতবাসী, রাজা-প্রজা, প্রকাশকাল ১৯০৮ সাল।

এখন এই অংশটিকে যদি নিতান্ত আক্ষরিকভাবে গ্রহণ না করি, তবে ইহা নিঃসংশয়ে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাসবর্ণনা-রূপে প্রতিভাত হইবে। কারণ তিনিই প্রথম সুদীর্ঘ আত্মপ্রস্তুতির পরে ভারতীয় সমাজকে 'চিরপরিচিত ভাষায়' আহ্বান করিলেন, আর তিনিই প্রথম আইন সংশোধন ও আইন সভার ভরসা পরিত্যাগ করিয়া দেশের দুর্গতির মূলে অনুপ্রবেশ করিলেন, ব্যাপকভাকে বুঝাইয়া দিলেন, প্রকৃত দুর্গতি মনুষ্যত্বের অভাবে।

এবারে আর-একটি উদাহরণ :

"ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব, আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধন করিব যাহাতে শত্রুমিত্র ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়, যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে ক্ষমার বীর্যে প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ, আমরা তাহাকে কখনোই অসাধ্য বলিয়া জানিব না, তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য করিয়া লইব।"[১]

এই ভাবটিই গান্ধীজি ভাষান্তরে বলিতে পারিতেন, কতবার বলিয়াছেন। মহাকবি যেন মহাযোগীর মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া আগেভাগে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

এবারে তৃতীয় উদাহরণটি উদ্ধৃত হইতেছে। এটি আগের দুইটির চেয়ে অধিকতর অর্থসম্পন্ন। আগের দুটি বাণী, এটি চিত্র ; আগের দুটি ভাব, এটি দেহী। এখানে কবি আশ্চর্য কৌশলে ভারতবর্ষ ও ভারতপুরুষকে সমরেখায় আঁকিয়াছেন, দেহ ও আত্মাকে সমবন্ধনে বাঁধিয়া মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

"আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না, জানিতে পারিতেছি না, ইংরাজি স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাসমাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতি

১ পথ ও পাথেয়, রাজা-প্রজা।

পটতালে সভায় সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না, তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ, ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠভীষণ, তাহা দারুণসহিষ্ণু, উপবাসব্রতধারী; তাহার কৃশ পঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনো জ্বলিতেছে। আর, আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যা বাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের একমাত্র সত্য একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি, তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশ দিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব, ঐ অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্ত চক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজূট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে; যখন ঝড়ের গর্জনে অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝঙ্কার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব; যাহা স্তব্ধ তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন তাহাকে অবিশ্বাস করিব না, যাহা বিদেশের বিপুল বিলাসসামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিব না, এবং নিঃশব্দে তাহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।"[১]

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত এই সন্ন্যাসী কে? ভারতবর্ষ, না গান্ধী? একাধারে দুই-ই। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত এই চিত্র কি ভারতের দেহের না আত্মার? একাধারে দুয়েরই। ভারতবর্ষের আর কোনো মহাপুরুষ এমনভাবে সমগ্র দেশের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে একাত্ম হইয়া যাইতে পারিয়াছেন কি? ত্রিশ বৎসরকাল গান্ধীই ছিল

১ নববর্ষ, স্বদেশ, প্রকাশকাল ১৯০২ সাল।

ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষই ছিল গান্ধী! কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, সেই মানুষটিকে চর্মচক্ষে দেখিবার অনেক আগে মনশ্চক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া লইয়াছিলেন। গান্ধীজি তখন ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, ছিলেন আত্মপ্রস্তুতির পথে এবং ভারতক্ষেত্রে প্রবেশের ভূমিকায় পূর্বোক্ত সন্ন্যাসীর চিত্র পড়িয়া যাহার গান্ধীজির কথা মনে না হইবে তাহাকে বৃথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

পঞ্চম উদাহরণ :

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী।[১]

এই সময়কার অনেক প্রবন্ধাদিতে আমাদের মতের সমর্থক অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। সে সমস্তের বিস্তৃত উল্লেখ বাহুল্য, কৌতূহলী পাঠক পড়িয়া লইলেই দেখিতে পাইবেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর মন্ত্র অহিংসা ও অভয়। রাজার আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করিলে প্রকারান্তরে হিংসারই জয় হইয়া থাকে ; ভয় না করিয়া আঘাতকে প্রেমের সহিত বহন করিলে আঘাতকারীর মনের পরিবর্তন হইয়া থাকে, এই শিক্ষাই ধনঞ্জয় বৈরাগী তাহার অনুচরদের শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহা স্পষ্টত গান্ধীজির বাণীর পূর্বাভাস। ১৯০৯ সালে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির বাণীর সহিত পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তখন এবং তাহার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি এই বাণীর প্রচার সুরু করিয়াছেন ; দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় তিনি এই সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মুক্তধারা নাটকেও[২] ধনঞ্জয় বৈরাগীর দেখা পাই। দুটি নাটকেই একই চরিত্র। তবু কিছু প্রভেদ আছে। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর শিক্ষার ঝোঁকটা অহিংসার প্রতি ; মুক্তধারা নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর শিক্ষার ঝোঁকটা যন্ত্রের নিষ্ঠুরতাকে প্রাণের দ্বারা শোষণের

---

১ প্রায়শ্চিত্ত নাটকের প্রকাশকাল ১৯০৯ সাল।

২ প্রকাশ ১৯২২ সাল।

প্রতি; মুক্তধারাতে অহিংসার বাণী আছে, তবে ঝোঁকটা স্থান-কাল-পাত্রের তাগিদে অন্যত্র পড়িয়াছে; ইহা স্পষ্টত গান্ধীজির প্রভাব-ধর্মী। কিংবা বলা যাইতে পারে, এই চরিত্রটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ নিজেকে এবং গান্ধীজিকে রূপ দিয়াছেন; প্রায়শ্চিত্ত নাটক লিখিবার কালে গান্ধীজিকে জানিবার আগেই দিয়াছেন ইহা বিস্ময়কর কিন্তু প্রতিভা সব সময়েই বিস্ময়ের আকর।

ষষ্ঠ উদাহরণ:

বলাকা কাব্যের 'পাড়ি' নামক কবিতা।[১]

রবীন্দ্রনাথকৃত বলাকা কাব্যের ব্যাখ্যায় এই কবিতাটি যে ভাবেই ব্যাখ্যাত হোক, বর্তমান প্রসঙ্গে ইহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইবে।

মত্ত সাগর পাড়ি দিয়া নেয়ে বা নাবিক আসিতেছে। তাহার 'নাইকো মানিক, নাই রতনের হার,' শুধু 'একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার।' ধনী বা মানীর গৃহকে লক্ষ্য করিয়া নেয়ে আসিতেছে না; দীন, হীন, সর্বপরিত্যক্তের গৃহের উদ্দেশে নাবিক যাত্রা করিয়াছে। যখন নাবিক তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইবে—

বাজবে নাকো তূরী ভেরী, জানবে নাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক পরশ পেয়ে।
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আসবে নেয়ে॥

রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যানুসারে নেয়ে বা নাবিক যিনিই হোন, বর্তমান প্রসঙ্গের সূত্রে গ্রথিত হইয়া ইহার নূতন অর্থ মনে উদিত হয়, বিশেষ যখন জানিতে পারি যে ঠিক এই সময়েই গান্ধীজি

১ রচনাকাল ৫ই ভাদ্র, ১৩২১—আগস্ট, ১৯১৪ সাল।

শেষবারের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া লণ্ডনের পথে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। কবিতাটির রচনাকালে তিনি নেয়ের মতো হয় সমুদ্রে রহিয়াছেন, নয় কেবল লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। তিনি আমাদের জন্য ধনমানের বোঝা আনিতেছিলেন না; তাঁহার সঙ্গে ছিল একটি রজনীগন্ধার গুচ্ছ, তাহা অহিংসায় শুভ্র, প্রেমে অম্লান এবং নিশীথান্ধকারের মধ্যে শ্বেতচন্দ্রের অভয় তিলক।

এই কবিতাটি লিখিবার কালে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে দেখেন নাই; কিন্তু উভয়ের পরিচয় ঘটিয়াছে। ইহার কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহে তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে কবি এণ্ডরুজ ও পিয়ার্সন নামে দুইজন বন্ধুকে পাঠাইয়াছিলেন। মুখ্যত এণ্ডরুজের মাধ্যমেই দুজনে পরস্পরকে জানিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে যতগুলি অংশের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে কেবল এই কবিতাটি লিখিবার আগেই তিনি গান্ধীবাণীর সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। সেইজন্যই বর্তমান সূত্রে কবিতাটির মূল্য অত্যন্ত বেশি। তৎসত্ত্বেও আমি নিজেই স্বীকার করিতেছি যে, এটি লিখিবার কালে কবির মনে নিশ্চয় কোনো ব্যক্তিবিশেষের কথা ছিল না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, কারণ কবি ভাবিয়া বা কিছু না ভাবিয়াই লিখুন প্রসঙ্গসূত্রে তাহাতে নূতন অর্থ প্রকাশ হইয়া পড়ে। মহৎ শিল্পের এটি একটি মূলগত ধর্ম।

ইহার কয়েকমাস পরে ১৯১৫ সালের বসন্তকালে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটে। তাহার পর হইতে উভয়ের বন্ধুত্বের ও মিলনের ইতিহাস সর্বজনবিদিত।

এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এই যে, চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিবার পরে পূর্বোক্ত শ্রেণীর ইঙ্গিত রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরল; যাহা আছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সচেতন চিন্তার ফল, এবং সেইজন্যই তাহার শিল্পগত মূল্য অল্প।

এমন কেন হইল? কল্পনার বস্তু বাস্তবরূপ লাভ করিয়াছে বলিয়াই কি কবি আর তাহাকে পুনরঙ্কিত করিতে চাহেন নাই?

কিংবা বাস্তব কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়াই কি কবি তাহার ব্যর্থ অনুসরণ করিতে চাহেন না? কিংবা কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে ভেদ দেখিতে পাইয়া কবি বিড়ম্বিত বোধ করিয়াছেন? কারণ যাহাই হোক তাহা গবেষণাযোগ্য।

এখানেই বর্তমান প্রবন্ধের সমাপ্তি। নবীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির কল্পনায় নবীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কর্মযোগীর পূর্বাভাস সাহিত্যিকের, ঐতিহাসিকের ও মনস্তত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের যোগ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের মতো ভারতপুরুষ সর্বরসাধার মহামানব সৃষ্টি করেন নাই সত্য, কিন্তু আমার বর্তমান প্রচেষ্টা যদি সার্থক হইয়া থাকে তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি আর একজন ভারতপুরুষের অলৌকিক চরিত্র পূর্বাহ্ণে পূর্বাভাসে অঙ্কন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ বরাবর মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বিশেষ একটু আত্মীয়তাবোধ পোষণ করেছেন। খুব সম্ভব কৈশোরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি তথা বোম্বাই-বাসের স্মৃতিতে এই আত্মীয়তাবোধের উৎস, তার পরে, কালক্রমে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও দৃষ্টি-প্রসার ঘটবার ফলে এই আত্মীয়তা-বোধ একটি আদর্শের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। অর্থাৎ গোড়ায় যা ছিল নিতান্তই একটা ব্যক্তিগত অনুভূতি, পরবর্তীকালে তা সর্বজনীন অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছে। এই বিষয়টিকেই যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করবো। কিন্তু তার আগে একটা ভূমিকা আবশ্যক। ভূমিকার পটের উপরে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সম্বন্ধটি স্থাপন করতে পারলে দেখতে পাওয়া যাবে বিষয়টি ক্ষুদ্র বা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়—ওর একটা ভারত-জোড়া সার্থকতা আছে, আর সেই সার্থকতা আছে এই বিশ্বাসেই রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের কাছে তা উত্থাপন করতে সাহসী হয়েছি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কবি, মনীষী ও ধর্মগুরুদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এ দেশের মহাকবি, মনীষীরা যেমন সর্বাঙ্গীণভাবে এ দেশকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন তার অনুরূপ বোধ করি আর কোনো দেশে পাওয়া যাবে না। প্রাচীন গ্রীসে হোমার ছিলেন আবার হেরোডোটাস ছিলেন ; এ দেশে বেদব্যাস একাধারে হোমার ও হেরোডোটাস ; মহাভারত একাধারে কাব্য ও ইতিহাস। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস যে লিখিত হয় নি, তার কারণ সে অভাব তেমন করে কেউ বোধ করেন নি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কালিদাসের কাব্য ও তুলসীদাসের রামচরিতমানস প্রভৃতি ইতিহাসের অভাব দূর করে এসেছে আর খুব সম্ভব গতানুগতিক ইতিহাসের চেয়ে অধিক পরিতৃপ্তি দান করতে সমর্থ

হয়েছে। এইজন্যেই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস তার বিশ্বাসের ইতিহাস, তার আদর্শের ইতিহাস তার আইডিয়ার ইতিহাস; সন-তারিখ সন্ধি-বিগ্রহ শর্ত-চুক্তি ও রাজা-মন্ত্রীদের নামাবলীর ইতিহাস নয়।

মহাকবি, মনীষী ও ধর্মগুরুগণ রূপান্তরে এ দেশের ইতিহাস-স্রষ্টা বলে এ দেশ, এই ভারতবর্ষ তাঁদের মনের মধ্যে সর্বদা স্পষ্ট ও সত্যভাবে বিরাজমান ছিল। তাঁদের কাছে এই দেশটি একই সঙ্গে জন্মভূমি কর্মভূমি ও ধর্মভূমি ছিল, সেইজন্য এ দেশ সম্বন্ধে একটি বিশেষ মমত্ববোধ, বিশেষ একটি পবিত্রতাবোধ তাঁরা অনুভব করতেন, নিছক জন্মভূমি সম্বন্ধে যা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য নয়। তাঁদের কাছে এ যেন একটি দেবমন্দির তুল্য ছিল। এ দেশে পূজা সাঙ্গ করবার পরে দেবমন্দির প্রদক্ষিণ বিধেয়। এ দেশের ধর্মগুরুগণ বুঝি সেই মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই বারংবার এ দেশ প্রদক্ষিণ করেছেন। আচার্য শঙ্করের ভারতপ্রদক্ষিণ, মহাপ্রভু চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করে উত্তরভারতে গমন, এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত-পরিব্রাজকতা সমস্তই এই মনোভাব-প্রসূত। গান্ধীজির ভারত-ভ্রমণও মূলতঃ এই পর্যায়ের। আর রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে যে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ পাওয়া যায়—তারও মূল কথাটি এই, কোনো-একটা উপলক্ষে সামাজিকদের কাছে ভারত-বর্ষের সামগ্রিক রূপটা তুলে ধরা। কালিদাস লঙ্কা থেকে অযোধ্যা, আর রামগিরি থেকে অলকা অর্থাৎ দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত ভারতের ছবিটি এঁকে গিয়েছেন। আবার রঘুর দিগ্বিজয়ী সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে গিয়েছেন বাংলাদেশ ছাড়িয়ে আসাম পর্যন্ত। এ দিকেও আঁকা হল পুবে পশ্চিমে ভারতের ছবি। এ হচ্ছে গিয়ে মহাকবিদের মানসভ্রমণ, ধর্মগুরুদের পায়ে হেঁটে চলার সঙ্গে তাল রক্ষা করে এঁরা কলমে ভর দিয়ে ভারতভ্রমণ করেছেন।

মধ্যভারতের মহাকবি রবীন্দ্রনাথকেও ভারতভ্রমণ করতে হয়েছে,

শুধু কায়িকভাবে নয়, সে কাজ তো এ যুগে সহজ, তাঁকে ভারত প্রদক্ষিণ সমাধা করতে হয়েছে 'কায়েন মনসা বাচা'। বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের মোটামুটি পরিচয় আছে তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে বিরাট ভারতে কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, বোম্বাই থেকে আসাম—এমন কোনো প্রধান রাজ্য নেই, নগর নেই, তীর্থ নেই যেখানে বসে কিছু-না-কিছু তিনি না লিখেছেন, যার কোনো-না-কোনো উল্লেখ তাঁর রচনায় না আছে। মনের মধ্যে যে ভারতবোধ তাঁর সতত জাগ্রত ছিল পূর্বোক্ত উপায়ে তাকেই যেন পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে স্পর্শ করবার আকাঙ্ক্ষা। আবার ভারতের যাবতীয় অঞ্চলের মধ্যে মহারাষ্ট্রকেই যেন তিনি সবচেয়ে নিবিড়-ভাবে স্পর্শ করেছেন। ভারতের যিনি মহাকবি হবেন ভারতের সমস্ত অঙ্গরাজ্য থেকে তাঁকে রস আহরণ করতে হবে, সমস্ত রাজ্য তাঁকে যোগাবে রস, সমগ্র দেশকে তাঁর করতে হবে রস-ভিত্তি। এ ক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া যায় যে মহারাষ্ট্রের ইতিহাস, ও জীবন থেকেই যেন তিনি সবচেয়ে বেশি রস আহরণ করেছেন—মহারাষ্ট্রই যেন সবচেয়ে বেশি পুষ্ট করে তুলেছে কবির মানস-প্রকৃতিকে। অবশ্য এই বিচারের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্বভাবতঃই বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে বিচার করতে হবে।

নব্য ভারতের মহাকবি ভারতের বিচিত্র জীবনকে যেন গণ্ডূষ পান করেছেন। এই রস বলাধান করেছে তাঁর মনে, আর বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যকে নব্যভারতের নূতন মহাভারতে পরিণত হতে সাহায্য করেছে। বৈদিক ভারত, পৌরাণিক ভারত, বৌদ্ধ ভারত, গুপ্তসম্রাটগণের ভারত, মধ্যযুগের ও মুঘলযুগের ভারত যুগিয়েছে তাঁকে রস ও কাব্যের উপাদান। রাজস্থানের বীর্য ও ত্যাগ, শিখের শৌর্য, মহারাষ্ট্রের মহত্ত্ব ও আদর্শবাদে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন—তাঁর কাব্যে তারা স্থান লাভ করেছে। আজকে বিশেষভাবে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ ও বিচিত্র সম্পর্ক বর্ণনাই আমাদের লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যম অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম সিভিলিয়ান। কর্মক্ষেত্ররূপে তিনি নির্বাচন করে নিয়েছিলেন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি। তিনি যখন আমেদাবাদে জজ, তখন তিনি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেলেন সেখানে। তাঁর ইচ্ছা ছিল এখানে কিছুদিন থেকে ইংরাজিটা ভালো করে শিখে নিলে ভাইকে বিলাতে পাঠিয়ে দেবেন। আমেদাবাদের শাহীবাগ প্রাসাদে বাস করবার কালেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম সঙ্গীত রচনা করেন। এর পরেই ঘটনা-চক্রে তাঁর যোগ ঘটলো বোম্বাই তথা মহারাষ্ট্রের সঙ্গে। শেষ বয়সে লিখিত 'ছেলেবেলা' নামে স্মৃতি-কথায় এ বিষয়ে তিনি যা বলেছেন এখানে উদ্ধার করে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন—

"এখানে কিছুদিন থাকার পর মেজদাদা মনে করলেন বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেই-সব মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরাজি ভাষা শেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছু-দিনের জন্য বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম। সেই বাড়ির কোনো একটি এখনকার কালের পড়াশুনাওয়ালা মেয়ে ঝকঝকে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে। আমার বিদ্যা সামান্যই। আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারতো না। তা করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যা ফলাবার মতো পুঁজি ছিল না। তাই সুবিধা পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো মূলধন। যাঁর কাছে নিজের এই কবি-আনার জানান দিয়েছিলেম তিনি সেটা মেপেজুখে নেন নি। মেনে নিয়েছিলেন। কবির কাছে থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম যুগিয়ে, সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেম সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটা কাব্যের গাঁথুনিতে। শুনলেন সেটা ভোরবেলাকার ভৈরবী সুরে,

বললেন, কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধহয় আমার মরণ-দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি। এর থেকে বোঝা যাবে, মেয়েরা যাকে আদর জানাতে চায় তার কথা একটু মধু মিশিয়ে বাড়িয়েই বলে। সেটা খুশি ছড়িয়ে দেবার জন্যেই। মনে পড়ছে তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকতো।

যেমন একবার আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন, একটা কথা আমার রাখতেই হবে, তুমি কোনোদিন দাড়ি রেখো না—তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে। তাঁর এই কথা আজ পর্যন্ত রাখা হয় নি সে কথা সকলেরই জানা আছে। আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

আমাদের এই বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা সুর নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবন-যাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে। শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাজের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দাম দিয়ে যায় বাড়িয়ে।" [ছেলেবেলা]

ঘটনার পর ষাট বছরেরও বেশি অতিক্রম করা সত্ত্বেও যাঁর স্মৃতি এমন মমতা মাধুর্য আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, বুঝতে হবে তিনি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যা লিখেছেন এখানে তা উদ্ধার করে দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে আশা করা যায়।

"কয়েকমাস আমেদাবাদে রাখিয়া সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে

বোম্বাইয়ে তাঁহাদের এক বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন······বিলাতে যাইবার পুর্বে তাঁহাকে ইংরেজি চালচলনে ও কথাবার্তায় পাকা করা দরকার। বোম্বায়ের পাণ্ডুরঙ্গ পরিবার ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজিয়ানার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের বিলাত-ফেরত কন্যা আন্না তড়খড়-এর ছিল ইংরেজিতে অসাধারণ দখল। রবীন্দ্রনাথ হইতে বয়সে তিনি কিছু বড়। ইঁহার নিকট তিনি ইংরেজি বলা-কওয়ার পাঠ লইতেন।”

[রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড]

খুব সম্ভব এই মহিলাটিই বাংলাদেশের বাহিরে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম অনুরাগিণী। তখন রবীন্দ্রনাথ কীই বা লিখেছিলেন—তবু তিনি অস্ফুট উষার মধ্যে আভা দেখতে পেয়েছিলেন মধ্যাহ্ন সূর্যের। এও এক রকম প্রতিভা। অল্প বয়সেই এই তরুণীর মৃত্যু হয়। শুনতে পেলাম এই প্রতিভাময়ী রমণীর নশ্বরদেহ যেখানে সমাহিত—তা জীর্ণ, জঙ্গলাকীর্ণ এবং সম্পূর্ণ অবহেলিত। কবির জন্ম-শতবার্ষিকীর সময় রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম অনুরাগিণীকে ভুললে চলবে না। তাঁর সমাধি যাতে সুরক্ষিত হয়, সুচিহ্নিত হয়—তার দায়িত্ব মহারাষ্ট্রের, বাংলা দেশের, তথা রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উদ্যোক্তাগণের।

বিলাত থেকে ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথ—কিন্তু মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হল না—যোগসূত্ররূপে রইলো সত্যেন্দ্রনাথের কর্মজীবন। কখনো পুণায়, কখনো শোলাপুরে, কখনো কারোয়ারে এসে বাস করেছেন তরুণ কবি মধ্যমাগ্রজের আশ্রয়ে। তার মধ্যে কারোয়ার বাসের স্মৃতিটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে মধুর মনে হয়েছিল। অনেককাল পরে ‘জীবনস্মৃতি’ নামে আত্মচরিত লিখবার সময়, বর্ণনা করেছেন কারোয়ারের সমুদ্রের, ঝাউগাছের অরণ্যের আর ক্ষুদ্র কালানদীর সমুদ্র-সঙ্গমের। এখানেই প্রকৃতির প্রতিশোধ নামে একটি নাট্যকাব্য তিনি রচনা করেন। “অর্ধ-চন্দ্রাকারে বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু

প্রসারিত” করে দিয়ে সীমা যেন অসীমকে আলিঙ্গন করতে চেষ্টা করছে। হয়তো এই নৈসর্গিক দৃশ্যটি ‘প্রকৃতির প্রতিশোধের’ মূল ভাবটিকে সমর্থন করেছিল। নাট্যখানির মূল কথা সীমা ও অসীমের সম্বন্ধের রহস্যময় তত্ত্ব।

এর পরে কবি বিবাহ করে সংসার-জীবনে প্রবেশ করলেন। তখনও মাঝে মাঝে এসেছেন মহারাষ্ট্রে। এই রকম একবার পুণাতে এসে রমাবাঈ-এর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন। রমাবাঈ কোঙ্কন প্রদেশের মহিলা, বাগ্মী ও পণ্ডিত। তিনি আর্য-মহিলা-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। রমাবাই সম্বন্ধে তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল মহারাষ্ট্র দেশটার উপরে। ১৮৮৯ সালে একখানি চিঠিতে লিখছেন—“খিড কি স্টেশনের কাছাকাছি আমাদের সেই ক্ষেত, গাছের সার, টেনিস ক্ষেত্র। কাঁচের জানালামোড়া বাড়ি দেখতে পেলুম, দেখে মনটা হঠাৎ কেমন হু হু করে উঠল। এই এক আশ্চর্য।” বাড়ি ছেড়ে, দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময়ে মানুষ যে মাধুর্যময় মমত্ব অনুভব করে এ হচ্ছে তাই।—

১৮৯১ সালে উড়িষ্যা থেকে লিখছেন—“এখানকার খালটি দেখে পুণার ছোট্ট নদীটি মনে পড়ে।” আবার ১৮৯২ সালে বাংলাদেশ থেকে লিখিত একখানি পত্রে রেলগাড়িতে করে মহারাষ্ট্রে যেতে গেলে পথের মধ্যে যে-সব দৃশ্য দেখা যায় তার বর্ণনা করে মানস-ভ্রমণের আনন্দ অনুভব করেছেন তিনি।

এখন কবি কর্মজীবনের দায়িত্বে বদ্ধ, মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যাতায়াতের যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আর সত্যেন্দ্রনাথও চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে ফিরে এসেছেন কলকাতায়। কিন্তু মহারাষ্ট্রের সঙ্গে কবির যোগ ছিন্ন হল না, হল তার রূপান্তর। যে সম্বন্ধের সূচনা হয়েছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে

এবারে ব্যাপক ও গভীর হয়ে সর্বজনীন রূপ গ্রহণ করলো। যে ঝরনা ছিল পাহাড়ের খেলবার সামগ্রী এখন সমতলে নেমে এসে তা নদীরূপ গ্রহণ করলো, তা ক্ষেতে যোগাচ্ছে চাষের জল, ঘাটে যোগাচ্ছে স্নানের জল, তাতে চলাচল করছে বাণিজ্যের নৌকা।

রবীন্দ্রনাথের বয়স অনেকদিন ত্রিশ পেরিয়েছে, এখন চল্লিশের কাছাকাছি। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। প্রাচীন কাব্য-শাস্ত্র ও ইতিহাস থেকে ভারতের যে আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—তার কোনো সমর্থন পাচ্ছেন না বর্তমানের মধ্যে। এ রকম উদ্বেগজনক অভিজ্ঞতা সকল মনীষীকেই ভোগ করতে হয়—রবীন্দ্রনাথকেও হল। কিন্তু নীরবে সহ্য করে তো শান্তি নেই। তিনি দেশের ইতিহাস ও পুরাণ থেকে কাহিনী নিয়ে তাঁর আদর্শকে কাব্যরূপ দিতে চেষ্টা করলেন।

মহারাষ্ট্র যুগিয়েছে এমন কয়েকটি উদাহরণ। প্রতিনিধি কবিতায় (১৮৯৭) আঁকলেন রাজসন্ন্যাসী ছত্রপতি শিবাজীর চিত্র, তিনি সমগ্র রাজত্ব দানপত্র করে সমর্পন করলেন গুরু রামদাসের পায়ে। গুরু শিষ্য পরস্পরের যোগ্য। গুরু ফিরিয়ে দিলেন রাজত্ব, বললেন, এখন থেকে তুমি আমার প্রতিনিধি মাত্র,—

“তোমারে করিলা বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন ;
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।”

তার পরে আরও বলেন—

“বৎস, তবে এই লহ মোর আশীর্বাদসহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস,
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো ;
কহিলেন গুরু রামদাস।”

এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রাজার আদর্শ, আদর্শরাজা।

তার পর ন্যায়দণ্ডের মহিমা বর্ণনা করেছেন 'বিচারক' কবিতায় (১৮৯৯)। রঘুনাথ রাও ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব রাও নারায়ণকে হত্যা করে নিজে পেশবা হলেন। কিন্তু তাঁর খেয়াল হয় নি যে রাজ্যের প্রধান বিচারক হচ্ছেন রামশাস্ত্রী। রামশাস্ত্রী তাঁকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করলে রঘুনাথ তাঁকে পদচ্যুত করলেন। নির্ভীক ব্রাহ্মণ রাজরোষ ও রাজদাক্ষিণ্যে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে পদত্যাগ করে স্বগ্রামে ফিরে গেলেন।

কহিলা শাস্ত্রী—'রঘুনাথ রাও
যাও করো গিয়ে যুদ্ধ।
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।

এই রকম রাজা, এই রকম বিচারককে অবলম্বন করেই জাত বড় হয়ে ওঠে।

১৮৯৭ সালে একটি মারাঠী গাথা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'সতী' নামে এক নাট্যকাব্য রচনা করেন—এটি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।

বিনায়ক রাও-এর কন্যা অমাবাঈয়ের সঙ্গে একটি মারাঠী যুবকের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়। বরযাত্রীগণ যখন আসছে, পথের মধ্যে তাদের পরাজিত করে বিজাপুররাজের এক মুসলমান সভাসদ সদলে এসে অমাবাঈকে কেড়ে নিয়ে গেল বিয়ে করে। অমাবাঈ তাকে পতি বলে স্বীকার করে নিল। এ দিকে বিনায়ক রাও, তার পত্নী রমাবাঈ এবং পরাজিত মনোনীত বর জীবাজী প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টায় রইলো। অনেকদিন পর রণক্ষেত্রে পিতামাতার সঙ্গে সদ্য-বিধবা কন্যার সাক্ষাৎকার—যুদ্ধে জীবাজী এবং অমাবাঈয়ের

স্বামী দুজনেই নিহত হয়েছে। বিনায়ক ও তার পত্নী চায় যে কন্যা জীবাজীর সঙ্গে সহমৃতা হোক। অমাবাঈ বলে তা সম্ভব নয়, কেননা জীবাজী পরপুরুষ। তখন রমাবাঈ-এর আদেশে সৈন্যগণ কন্যাকে বলপূর্বক জীবাজীর চিতায় আরোহণ করতে বাধ্য করলো।

ঘটনার এই কঙ্কাল থেকে কাব্যের মহত্ত্ব বুঝতে পারা যাবে না। এখানে দ্বন্দ্ব বেধেছে লৌকিক ধর্ম আর নিত্যধর্মের মধ্যে। লৌকিক ধর্মের বিচারে অমাবাঈ পতিত, নিত্যধর্মের বিচারে সে সতী। কবির সমর্থন নিত্যধর্মের দিকে। রবীন্দ্রনাথের মন তখন ধর্মের স্বরূপ চিন্তা করছে—এই নাটকটি তার একটি দৃষ্টান্ত।

ইতিমধ্যে দেশের রাজনীতি আবেদন-নিবেদনের নিরাপদ পথ পরিত্যাগ করেছে। অনিশ্চিত দুর্গমের দিকে শুরু হয়েছে তার যাত্রা। রাজপুরুষের রক্তচক্ষুর প্রতিক্রিয়ায় দেশের দিগন্তেও রক্তরাগ দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। রাজনীতিতে আত্মশক্তিনিয়োগের পথে মহারাষ্ট্র ভারতে অগ্রণী, মহারাষ্ট্রের একচ্ছত্র নেতা লোকমান্য টিলক।

পুণাতে প্রথম প্লেগ দেখা দিলে রোগের চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ হয়ে উঠল রোগের প্রতিকার-চেষ্টা। দুজন ইংরাজ রাজকর্মচারী নিহত হল। লোকমান্য রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হলেন। তখন তাঁর মামলার ব্যয় বাবত চাঁদা তুলবার কাজে কলকাতায় যাঁরা অগ্রসর হলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে প্রধান। সতেরো হাজার টাকা ও তিনজন কৌঁসুলী প্রেরিত হল লোকমান্যের সাহায্যার্থে। তার পরে ১৮৯৮ সালে সিডিশ্যন বিল বিধিবদ্ধ হয়—এই উপলক্ষে রচিত হল রবীন্দ্রনাথের 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ।

১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মণ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে ইংরাজ প্রভু কর্তৃক একজন মারাঠি ব্রাহ্মণের লাঞ্ছনার প্রতিবাদ জানালেন। তাঁর ধারণা এই যে, ব্রাহ্মণের লাঞ্ছনা ব্যক্তিবিশেষের

মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না—দেশের একটি পবিত্র ঐতিহ্যের উপরে গিয়ে পড়ে।

১৯০৪ সালে কলকাতায় শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রেরণা ১৮৯৭ সালে লোকমান্য কর্তৃক মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত শিবাজী উৎসব—আর এর প্রধান উদ্যোক্তা সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে একজন মহারাষ্ট্রী বাঙালী। তাঁরই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'শিবাজী উৎসব' নামে বিখ্যাত কবিতাটি। সেটি কলকাতার টাউন হলে পঠিত হয়েছিল। শোনা যায় সে কবিতাটির মারাঠী অনুবাদ পাঠ করে লোকমান্য কবিকে লেখেন যে তাঁর এই কবিতাই 'বঙ্গ-মারাঠারে এক করি দিবে বিনা রণে।'

দেশাত্মবোধের উন্মেষের সেই প্রথম প্রহরে লোকের মন দেশের ইতিহাসের মধ্যে বীরের সন্ধানে বের হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটিতে সেই বীরের আবিষ্কার। সে বীর ছত্রপতি শিবাজী। তিনি 'এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে' বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বিদেশী ঐতিহাসিকের পুঞ্জীভূত লাঞ্ছনা অপসারিত করে স্বকীয় মহিমায় আজ প্রতিষ্ঠিত। তিনি সমগ্র ভারতকে স্বারাজ্যে উদ্বোধিত করেছেন। সেই কথা স্মরণ করে কবি বিশেষভাবে একত্র আহ্বান করেছেন মহারাষ্ট্র ও বাংলাকে—

"মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালী, এক কণ্ঠে বলো
জয়তু শিবাজী,
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালী, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

ছত্রপতি মহারাজের রাষ্ট্রীয় আদর্শ কি ছিল তা বিচারের যোগ্যতা আমার নেই—সে বিচার এই কবিতার লক্ষ্যও নয়। সেদিন লোকে বিশ্বাস করতে ভালোবাসতো যে ঐ রকম একটি বীর আছেন নিকট-ইতিহাসের মধ্যেই। মারাঠীর সঙ্গে বাঙ্গালীর বোধ হয় একটা আন্তরিক মিল আছে, দুই সমাজই মধ্যবিত্ত-প্রধান, চিত্ত-সম্পদে ধনী, ভাবুক ও আদর্শবাদী। খুব সম্ভব এই মিল স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ মারাঠী ও বাঙালীকে একত্র আহ্বান করেছিলেন। নব্য মহারাষ্ট্রের ভাবমূর্তি লোকমান্য টিলকের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অশেষ শ্রদ্ধা ছিল, কেননা তিনি শুধু লোকমান্য ছিলেন না, তিনি ছিলেন লোকরাজ। টিলকও রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। টিলককে কবি কি চক্ষে দেখতেন রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি—

"এই উপলক্ষে একটি কথা আমার মনে পড়ছে। তখন লোকমান্য টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে নন্-কো-অপারেশন আরম্ভ হয় নি বটে কিন্তু পোলিটিক্যাল আন্দোলনের তুফান বইছে। আমি বললুম—'রাষ্ট্রীক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপ যেতে পারব না।' তিনি বলে পাঠালেন—আমি রাষ্ট্রীক চর্চায় থাকি, এ তাঁর অভিপ্রায়বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ, এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি। আমি জানতুম জনসাধারণ টিলককে পোলিটিক্যাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারি নি। তার পরে, বোম্বাই শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, 'রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার

থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারেন, এর চেয়ে বড় আর কিছু আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশাই করি না।' আমি বুঝতে পারলুম টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন সে কাজে তাঁর অধিকার ছিল; সেই অধিকার মহৎ অধিকার।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড]

এ ঘটনা ১৯১৮ সালের।

প্রসঙ্গ দীর্ঘ হয়ে পড়ছে, এবারে ক্ষান্তির সময় এলো। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছিলাম আশা করি তার একটা আভাস দিতে সক্ষম হয়েছি। শুধু একটি কথা। মহারাষ্ট্র তার এই মহান আত্মীয়টিকে চিনতে ভুল করে নি, এখান থেকে তিনি সম্মান, সমাদর ও সম্বর্ধনা যথেষ্ট পেয়েছেন। এঁরা বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে দাক্ষিণ্য দেখাতেও ভোলেন নি। কবির শেষজীবনের এ-সব বিবরণ এখনও জীবিত স্মৃতির মধ্যেই আছে, বিস্তার অনাবশ্যক। 'ঘ' পরিশিষ্টে কয়েকটি মাত্র তথ্যের উল্লেখ করলাম।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহারাষ্ট্রের রাজধানী বোম্বাই নগরীতে। দুর্লভ উপলক্ষ নিঃসন্দেহ। এখানে কিছু হাতে করে উপস্থিত হতে হলে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রীতির সম্বন্ধই যোগ্যতম বিষয়। সেই ভরসায় আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষ একটি ভূখণ্ড মাত্র নয়—একটি মহৎ আইডিয়া। আর সে আইডিয়া বিচিত্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চরিতার্থতার দিকে এগিয়েই চলেছে—স্থাণু স্থির জড়ধর্মী বস্তু এ নয়—এ চির ভূয়মান। সারা জীবন ধরে এই তত্ত্বটি তিনি দেশকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, দেশ যে সম্পূর্ণভাবে বুঝে উঠেছে এমন মনে হয় না। অথচ ঐ পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর তো উপায় নেই—ইতিহাসের প্রেরণাই ঐ দিকে। রবীন্দ্র-

জন্মশতবার্ষিকী কবির এই শিক্ষা স্মরণ করবার উপলক্ষ। তাতে করে শুধু মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশ নয়—ভারতের প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য পরস্পরের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা ও পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা অনুভব করবে। একেই নামান্তরে বলতে পারা যায় ভারতবর্ষ। নব্য ভারতের বেদব্যাসকে আমরা প্রণাম করতে সমবেত হয়েছি, ভারতের চিরন্তন মূর্তি সার্থক হয়ে উঠুক, উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, সত্য হয়ে উঠুক আমাদের সম্মুখে।

এই প্রবন্ধের অনেক উপাদান শ্রীঅমল হোম ও শ্রীপুলিনবিহারী সেনের [illegible] প্রাপ্ত।

পরিশিষ্ট

ক

মহারাষ্ট্রের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত কবিতা ও নাটক

১ প্রতিনিধি। ১৮৯৭

ছত্রপতি শিবাজী-কর্তৃক গুরু রামদাসকে রাজ্য সমর্পণের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

॥ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭ম খণ্ড।

২ সতী। ১৮৯৭

"মিস ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠী গাথ সম্বন্ধে অ্যাকওয়ার্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধ-বিশেষ হইতে বর্ণিত ঘটনা সংগৃহীত।"

॥ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫ম খণ্ড।

৩ বিচারক। ১৮৯৯

রঘুনাথ রাও কর্তৃক ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব রাও নারায়ণ নিহত হলে, রঘুনাথ রাও পেশব পদে অধিষ্ঠিত হন। তখন মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রধান বিচারপতি রামশাস্ত্রী রঘুনাথকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করেন। উত্তরে রঘুনাথ তাঁকে পদচ্যুত করলে রামশাস্ত্রী প্রধা বিচারপতির পদ ত্যাগ করে স্বগ্রামে ফিরে যান। এই ঘটনাটি অবলম্বন করে 'বিচারক' কবিতাটি লিখিত। ॥ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭ম খণ্ড॥

৪ শিবাজী উৎসব। ১৯০৪

লোকমান্য টিলকের প্রেরণায় সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে মারাঠী সাহিত্যিকের উদ্যোগে ১৯০৪ সালে কলিকাতায় শিবাজী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।—তদুপলক্ষে কবিতাটি লিখিত। ॥ সঞ্চয়িতা॥

খ

মহারাষ্ট্রের ইতিহাস ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে লিখিত প্রবন্ধাদি

১ সুবিচারের অধিকার। ১৮৯৪

"সংবাদপত্র-পাঠকগণ অবগত আছেন অল্পকাল হইল সেতারা জিলায় বাই নামক নগ তেরো জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জেলে গিয়াছেন। তাঁহারা অপরাধ করিয়া থাকিবেন, আইনমতেও হয়তো তাঁহারা দণ্ডনীয়—কিন্তু ঘটনাটি সমস্ত হিন্দুর হৃদয়ে আঘ করিয়াছে এবং আঘাতের ন্যায্য কারণও আছে।"

॥ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড॥

। ১৮৯৮

সিডিশন বিল পাস হইবার পূর্বদিনে টাউন হলে পঠিত।

॥ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড ॥

"কেশরীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা দীর্ঘকাল চলিবার পর টিলকের দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল (১৮৯৮)। এই ব্যাপারে সমস্ত দেশময় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল, তাহা গভর্নমেণ্ট যাহা চাহিয়াছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত; দিকে দিকে প্রবল অসন্তোষ নানাভাবে ছড়াইয়া পড়িল; সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে নূতন আইন হইল। এই আইন সিডিশন বিল, ১৮৯৮ পাস হইবার পূর্বদিন কলিকাতার টাউনহলের প্রতিবাদসভায় রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা 'গভর্নমেণ্ট…পুণা শহরের বক্ষের উপর রাজদণ্ডের যে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন' তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে।"

(বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক, অমল হোম, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬৩)

এই প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে দণ্ডিত নাটু সর্দারগণের উল্লেখ আছে।

৩ প্রসঙ্গ কথা। ১৮৯৮

প্লেগ মহামারীর চিকিৎসা ও প্রতিরোধ উপলক্ষে পুণা ও কলিকাতার কর্তৃপক্ষের মনোভাবের তুলনামূলক আলোচনা।

॥ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০ম খণ্ড ॥

৪ ব্রাহ্মণ। ১৯০১

"সকলেই জানেন, সম্প্রতি কোনো মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণকে তাঁহার ইংরেজ প্রভু পাদুকাঘাত করিয়াছিল—তাহার বিচার উর্ধ্বতন বিচারালয় পর্যন্ত গড়াইয়াছিল—শেষ বিচারক ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।"

॥ রবীন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড ॥

৫ শিবাজী ও মারাঠা জাতি। ১৯১০

শিবাজী মহারাজের প্রতিভায়, নেতৃত্বে ও আদর্শবাদে মারাঠাজাতি কি ভাবে একটি নেশনে দানা বেঁধে উঠল তারই ব্যাখ্যা। ॥ ইতিহাস ॥

৬ শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ। ১৯১০

মহারাষ্ট্রের ও শিখসমাজের মহানায়কদের তুলনামূলক আলোচনা।

॥ ইতিহাস ॥

৭ বোম্বাই শহর। ১৯১২

বোম্বাই শহরের চারিত্রিক ও আর্থিক বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ।

॥ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬শ খণ্ড ॥

৮ লোকমান্য টিলক সম্বন্ধে মন্তব্য। ১৯২৪

॥ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮শ খণ্ড ॥

গ

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে সন্ত তুকারামের অনেকগুলি অভঙ্গের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে প্রদত্ত হল।*

১

আমারি বেলায় উনি যোগী
নিজের তো বাকি নাই সুখ,
সব সুখ ঘরে আসে, শুধু
আমারি ত ঘুচিল না দুখ।
ঘরে মোর অন্ন নেই বলে
বল দেখি যাই কার দ্বার,
এই পোড়া সংসারের তরে,
আপদ সহিব কত আর ?
অন্ন অন্ন করে রাত দিন
ছেলেগুলো খেলে যে আমায় !
মরণ তাদের হয় যদি
সকল বালাই ঘুচে যায়।
সকলি ঝেঁটিয়ে নিয়ে যান
তিলমাত্র ঘরে থাকা ভার।
তুকা বলে, 'দূর পোড়ামুখী,
আপনি মাথায় নিলি ভার।
এখন তাহার তরে মিছে
কাঁদিলে কি হবে বল আর !'

—নবরত্নমালা, পঞ্চম ভাগ, পৃ ৮
—অভঙ্গ ৫৬৬

বোধ হয় এ পাষণ্ড,
পূর্বজন্মে ছিল মোর অরি।
এ জনমে স্বামী হয়ে
বৈর সাধিতেছে এত করি।

*শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কত দুঃখ সব আর,
কত ভিক্ষা মাগি পর দ্বারে,
বিঠোবার মুখে ছাই—
কি ভাল কল্লেন এ সংসারে ?
তুকা বলে, "স্ত্রী আমার
রাগিয়া কতই কটু ভাষে,
কভু বা কাঁদিয়া মরে,
কভু বা আপন মনে হাসে।"

—অভঙ্গ ৫৬৭

৩

ঘরে দুটা অন্ন এলে
ছেলেদের দেব কোথা খেতে।
হতভাগা তা দেবে না,
সকলি পরেরে যান দিতে।
তুকা বলে, 'অতিথিরে
যখনি গো দিতে যাই ভাত,
রাক্ষসীর মতো এসে
হতভাগী ধরে মোর হাত।
না জানি যে পূর্ব জন্মে
কতই করিয়াছিলি পাপ।'
তুকা বলে, 'এ জনমে
তাই এত পেতেছিস্ তাপ।'

—অভঙ্গ ৫৬৮

৪

খাবার কোথায় পাবি বাছা,
বাপ তোর থাকেন মন্দিরে—
মাথায় জড়ান তিনি মালা,
ঘরে আর আসেন না ফিরে।

নিজের হলেই হল খাওয়া
আমাদের দেখেন না চেয়ে।
খর্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু
মন্দিরে বেড়ান গেয়ে গেয়ে।
কি করিব বল্ দেখি, বাছা,
কিছুই ত ভেবে নাহি পাই।
ঘরে না বসেন একরতি,
চলে যান অরণ্যে সদাই।
তুকা বলে, "ধৈর্য ধরো মনে
এখনো সকল ফুরায় নাই।"

—অভঙ্গ ৫৬৯

৫

গেছে সে আপদ গেছে,
ঘরেতে থাকিবে শুধু রুটি,
যা হোক্ তা হোক্ করে
পেট ভরে খেতে পাব ছুটি।
বোকে বোকে দিনু এল্যে
জ্বালাতন হনু হাড়ে মাসে,
তুকা বলে, 'যদিও সে
দিবানিশি কত কটু ভাষে।
তুকারে তুকার স্ত্রী যে
মনে মনে তবু ভালো বাসে।'

—অভঙ্গ ৫৭০

৬

ঘরে আর আসে না সে,
কোনো পরিশ্রম নাহি করে,
নিজে নাকি খেতে পায়
রোজ রোজ সুখে পেট ভরে।

না উঠিতে শয্যা হতে—
মিলি দলবল গুলা সাথে
করতাল বাজাইতে
আরম্ভ করেন অতি প্রাতে।
খেয়েছে লজ্জার মাথা,
জ্যান্তে তারা মড়ার মতন,
ঘরে আছে ছেলেপিলে,
তাদের ত না করে যতন।
স্ত্রী তাদের পড়ে আছে —
হতভাগী লাজ দুঃখ ভরে,
অভিশাপ দিতে দিতে
মাথায় পাথর ভেঙে মরে।
'ভাগ্যে যাহা আছে তাহা'
তুকা বলে, 'থাক সহ্য করে।'

—অভঙ্গ ৫৭১

৭

হেথা কেন আসে লোকগুলা,
তাদের কি কাজ নাই হাতে?
তুকা কহে, 'ঈশ্বরের তরে,
ব্রহ্মাণ্ড মিলেছে মোর সাথে।
ভাল বুঝে দু-চারিটা কথা,
না জানি তাহে কি ক্ষতি আছে;
কোথাও যায় না যারা কভু,
ভালবেসে আসে মোর কাছে।
এও সে বাসে না ভাল হায়,
ভাগ্য কিবা আছে এর বাড়া—
সকল লোকের পাছে পাছে
কুকুরের মত করে তাড়া।'

—অভঙ্গ ৫৭২

ঘ

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে বোম্বাই তথা মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ :

১ ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আমন্ত্রণে আমেদাবাদ যাওয়ার পথে বোম্বাই স্টেশনে রবীন্দ্রনাথের বিপুল সম্বর্ধনা। বনিতা আশ্রমে নারীমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে কবির ভাষণ।

২ ১৯২২ সালে পুণায় কিরলোসকর থিয়েটারে 'ইণ্ডিয়ান রেনেসাঁস' সম্বন্ধে কবির বক্তৃতা। টিলকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

৩ ঐ সালেই দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরবার পথে বোম্বাই শহরে কবি ইণ্ডো-ইরানিয়ান্স্ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

৪ ১৯৩২ সালে পুণা জেলে অনশন-ব্রতী গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার উদ্দেশ্যে কবির পুণা গমন। মহাত্মাজির জন্মদিন উপলক্ষে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন, প্রবন্ধটি মালব্যজি কর্তৃক শিবাজী-মন্দিরে পঠিত হয়।

৫ ১৯৩৩ সালে বোম্বাই নগরীতে রবীন্দ্র-সপ্তাহ উদ্‌যাপন। সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে কবি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। এই উপলক্ষেই রিগ্যাল থিয়েটারে 'দি চ্যালেঞ্জ অফ জাজমেণ্ট' নামে কবি এক বক্তৃতা দেন। ২৯শে নভেম্বর মালাবার হিলে শ্রীমতী তাতিয়া বেগমের বিরাট উদ্যানে কবির সম্বর্ধনা। ২রা ডিসেম্বর সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে কবির 'দি প্রাইস অফ ফ্রিডম' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

কবিজীবনের উল্লেখযোগ্য তথ্যপঞ্জী

১৮৬১—৭ই মে (২৫শে বৈশাখ ১২৬৮) সোমবার শেষরাত্রে কলকাতার জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়িতে জন্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশ সন্তান এবং অষ্টম পুত্র। জননী সারদাদেবী।

১৮৬৮—প্রথম বিদ্যালয়ে প্রবেশ, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্র। পরিবারে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত কাদম্বরী দেবীর বিবাহ।

১৮৬৯—বিচ্ছিন্ন কবিতাচর্চার চেষ্টা।

১৮৭০—নর্মালস্কুলে একবৎসর পাঠ, গৃহে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা।

১৮৭১—বেঙ্গল একাডেমী নামক ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ কিন্তু বিদ্যালয়-পাঠে অমনোযোগ।

১৮৭২—কলিকাতায় ডেংগুজ্বরের প্রকোপ হওয়ায় কিছুকাল নগরের উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে আত্মীয়স্বজনসহ বাস এবং প্রকৃতির সহিত প্রথম স্বাধীন পরিচয়।

১৮৭৩—উপনয়ন, পিতার সহিত উত্তরভারত ও হিমালয় ভ্রমণ, প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় বিদ্যালয় গমন।

১৮৭৪—সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে কিছুকালের জন্য অধ্যয়ন ও পরে পুনরায় নানাভাবে গৃহশিক্ষার আয়োজন; অনুবাদচর্চা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ।

১৮৭৫—হিন্দুমেলায় কবিতাপাঠ ও পত্রিকায় প্রকাশ। জননীর মৃত্যু। নিয়মিত কবিতা রচনা ও গীতরচনা, জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বনফুল কাব্য প্রকাশ।

১৮৭৬—স্কুলে যাত্রা বন্ধ। পত্রিকায় কাব্য, সমালোচনা প্রভৃতি একাধিক রচনা প্রকাশ।

১৮৭৭—স্বদেশ-প্রেমাত্মক কিছু কিছু গান ও কবিতা রচনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের জন্য গীতরচনা ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ। ভারতী পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ, প্রথম উপন্যাস রচনার চেষ্টা।

১৮৭৮—কবিকাহিনী রচনা। বিলাত যাইবার পূর্বে আমেদাবাদ ও বোম্বাই বাস, আন্না তরখড়ের সহিত পরিচয়। বিলাতযাত্রা, ব্রাইটনের স্কুলে প্রবেশ।

১৮৭৯—লণ্ডনে পড়াশুনা ও নানাস্থানে বাস, কয়েকটি রচনা এবং ধারাবাহিকভাবে বিলাতবাস সম্বন্ধে পত্রপ্রেরণ, ভারতীতে প্রকাশ।

১৮৮০—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও নানা সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ।

১৮৮১—বাল্মীকিপ্রতিভা রচনা ও অভিনয়। আরও কিছু কিছু কাব্য, কাব্য-নাট্য ও গদ্যরচনা। বিলাতযাত্রার পুনরায়োজন ও যাত্রা, কিন্তু মধ্যপথ হইতে প্রত্যাবর্তন। কিছুদিন চন্দননগরে বাস।

১৮৮২—বৌঠাকুরানীর হাট ও সন্ধ্যাসংগীত ও প্রভাতসংগীতের কবিতাবলী রচনা, কালমৃগয়া রচনা ও অভিনয়। বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক কবিকে প্রশস্তি-জ্ঞাপন। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রচনা, কিছুকাল দার্জিলিঙে বাস।

১৮৮৩—সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বোম্বাইসন্নিকট কারোয়ার শহরে কিছুকাল অবস্থান, প্রকৃতির প্রতিশোধ রচনা। ছবি ও গানের পর্ব। মৃণালিনী দেবীর সহিত কবির বিবাহ।

১৮৮৪—কড়ি ও কোমলের কবিতা রচনার পর্ব, নানা ধরনের গীতরচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর শোচনীয় মৃত্যু (১৯ এপ্রিল, ৮ বৈশাখ ১২৯১), কবির গভীর শোকবেদনা। তৃতীয় অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে রবীন্দ্রনাথ, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ।

১৮৮৫—সারস্বতকৃত্যে প্রবলতা, ব্রহ্মসংগীত রচনা, রামমোহন রায় সম্বন্ধে সিটি কলেজ সভায় অভিভাষণ। বালক পত্রিকার দায়িত্বগ্রহণ ও মুকুট রাজর্ষি প্রভৃতি শিশুসাহিত্য রচনা। কিছুকাল বোম্বাইয়ে অবস্থান।

১৮৮৬—গীতরচনায় সমান আগ্রহ; জাতীয় কংগ্রেসে স্বকণ্ঠে সংগীত পরিবেশন, প্রথমা কন্যা মাধুরীলতার জন্ম।

১৮৮৭—মায়ার খেলা ও মানসী কাব্যপর্বের সূচনা। সমকালীন সামাজিক কোনো ব্যাপার লইয়া চন্দ্রনাথ বসুর সহিত কবির প্রবল মতবিরোধ।

১৮৮৮—সপরিবারে কিছুকাল গাজিপুরে বাস। শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৯—বোম্বাই পুণা ও শোলাপুরে কিছুকাল অবস্থান ও রাজা ও রানী রচনা। শিলাইদহ পদ্মাতীরে কিছুকাল বাস।

১৮৯০—শিলাইদহ কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে সাময়িকভাবে বাস, শেষের দিকে একমাসের জন্য লণ্ডন গমন।

১৮৯১—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের উপর স্থায়ী ভাবে জমিদারি পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ। পদ্মাতীরে ধারাবাহিকভাবে বাসকালে ছোটগল্প ও কবিতার সৃষ্টি।

১৮৯৪—কয়েকমাসের জন্য সাধনা পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ।

১৮৯৬—জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বাদশ অধিবেশনে কবি কর্তৃক বন্দেমাতরম্ গান।

১৮৯৮—সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে গৃহীত সরকারী সিডিশন বিলের প্রতিবাদে টাউন হলে কণ্ঠরোধ প্রবন্ধ পাঠ।

১৯০১—নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকভার গ্রহণ।

১৯০২—কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু।

১৯০৩—মধ্যমকন্যা রেণুকার মৃত্যু।

১৯০৫—পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু। কবি-কর্তৃক ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ ও রাজনৈতিক আলোচনা; স্বদেশী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, কবির স্বদেশচিন্তা ও স্বদেশী সংগীতরচনা। ১৬ অক্টোবর কার্জন-কর্তৃক বঙ্গচ্ছেদ ও সেই উপলক্ষে রাখীবন্ধন উৎসব প্রবর্তন এবং বিপুল উদ্দীপনা।

১৯০৭—কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যু।

১৯০৮—বাঙলা দেশের চারি দিকে জাতীয় উত্তেজনা ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ, গুপ্ত বিপ্লবীদের নানাবিধ প্রচেষ্টা, হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যার উদ্ভব। শান্তিনিকেতনে গঠনমূলক কর্মে কবির আত্মনিয়োগ।

১৯১০—গীতাঞ্জলির সংগীতরচনার পর্ব, শান্তিনিকেতনে খ্রীস্ট জন্মোৎসব উদ্‌যাপন।

১৯১১—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকপদ গ্রহণ, শান্তিনিকেতনে কবির পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান। সম্রাট ৫ম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার। এই বৎসরই কলিকাতায় কংগ্রেসের ২৭তম অধিবেশনে 'জনগণমন-অধিনায়ক' গান গীত হয়।

১৯১২—গীতাঞ্জলি-পর্বের গান ও কবিতার ইংরাজি তর্জমা, ১৬ই জুন বিলাত গমন এবং ইয়েট্‌স্ প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের সহিত পরিচয়, ইংরাজি গীতাঞ্জলির জন্য সর্বত্র কবির সমাদর। রাজা ও ডাকঘরের

ইংরাজি অনুবাদ। ইয়েট্সের ভূমিকাসহ ইংরাজি গীতাঞ্জলির গ্রন্থাকারে প্রকাশ। লণ্ডন হইতে কবির মার্কিন দেশে যাত্রা।

১৯১৩—১৩ই নভেম্বর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ, ডিসেম্বরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডি. লিট্ উপাধি প্রধান।

১৯১৪—প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ও কবির আশীর্বাদপুষ্ট হইয়া সবুজ পত্রের প্রকাশ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার ফিনিক্স্ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের সহিত শান্তিনিকেতনের সংযোগ। বলাকার যুগ আরম্ভ।

১৯১৫—গান্ধীজীর প্রথম শান্তিনিকেতনে আগমন। সম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথকে স্যার উপাধি প্রধান।

১৯১৬—জাপান ও মার্কিন মুলুকে ভ্রমণ ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা।

১৯১৮—জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার মৃত্যু। বিশ্বভারতী গৃহের ভিত্তিস্থাপন।

১৯১৯—দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত মতবিরোধ, জালিয়ানাবাগে ইংরাজ সরকারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্যার উপাধি বর্জন করিয়া লর্ড চেম্স্ফোর্ডের নিকট খোলা চিঠি প্রেরণ।

১৯২০—ইংলণ্ড ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে সফর, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কবির স্যার উপাধি ত্যাগের ঘটনায় ইংলণ্ডের সুধীসমাজে কবির প্রতি নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা। আমেরিকা যাত্রা।

১৯২১—পুনরায় ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ, জনসংযোগ, বক্তৃতা, মনীষীদের সহিত আলাপ-পরিচয়, দেশে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ।

১৯২২—দক্ষিণ ভারত ও সিংহল সফর।

১৯২৩—পশ্চিম ভারত আসাম প্রভৃতি ভারতের আরও নানা স্থানে ক্রমাগত পর্যটন। সমকালীন বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার আন্দোলন।

১৯২৪—চীন যাত্রা, চীনে বিপুল কবিসম্বর্ধনা। জাপান ভ্রমণ। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় পেরুর পথে আর্জেন্টিনায় অসুস্থতার জন্য কিছু কাল অবস্থান, রাজধানী বুয়েনস এয়ারিসে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্য গ্রহণ।

১৯২৫—ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং গান্ধীজীর চরকা ও খদ্দরনীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ।

১৯২৬—পুনরায় ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, চেক, অস্ট্রিয়া, হাংগেরি প্রভৃতি রাষ্ট্রে ভ্রমণ, বক্তৃতা, বিচ্ছিন্ন সাহিত্যসৃষ্টি ও বিপুল সম্বর্ধনা লাভ।

১৯২৭—পশ্চিম ভারত, আসাম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সিঙাপুর, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা, জাভা, বালী, শ্যাম প্রভৃতি অঞ্চলে সফর। কবির চিত্রাঙ্কন-প্রয়াস।

১৯২৯—কানাডা ও জাপান সফর।

১৯৩০—উত্তর ও পশ্চিম ভারত সফর, বিলাতের পথে ফরাসী দেশে। প্যারিসে কবির প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী। অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির হিবার্ট বক্তৃতা, বিষয় 'মানুষের ধর্ম'। ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণ ও কবির বিস্ময়। ইউরোপ ঘুরিয়া আমেরিকা আগমন। আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে কবির চিত্রপ্রদর্শনী ও বিভিন্ন মনীষীর সহিত সাক্ষাৎকার।

১৯৩১—লণ্ডনে বার্নার্ড শ-র সহিত দীর্ঘ আলোচনা। ভারতে প্রত্যাবর্তন। হিজলী বন্দীনিবাসে বন্দীদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পীড়িত শরীরেও মনুমেন্টের জনসভায় যোগদান ও শাসকবর্গের প্রতি কবির ধিক্কার। টাউন হলে কবিসম্বর্ধনার সপ্তাহব্যাপী আয়োজন।

১৯৩২—ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থায় উদ্বেগ। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, বিনা বিচারে কারাদণ্ড ও স্বদেশী আন্দোলন দমনের জন্য নিষ্ঠুর দুঃশাসনের প্রতি কবির বিদ্রূপ ও ক্ষোভ কবিতায় সঞ্চারিত। পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ। বাস্তবধর্মী আধুনিক সাহিত্যের প্রতি কবির আগ্রহ, গদ্যছন্দে কাব্যরচনার উদ্যম। জার্মানীতে দৌহিত্র নীতীন্দ্রের মৃত্যু। গান্ধীজীর অনশনের সংবাদে পুণায় কারাগারে গিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ।

৩৩—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানুষের ধর্ম'-বিষয়ক কমলা-বক্তৃতামালা। বোম্বাইয়ে সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে কবিকে সম্বর্ধনা প্রদান। অন্ধ্র ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ, বহুবিধ কর্মে ব্যস্ততা।

১৯৩৪—পুনরায় সিংহল যাত্রা এবং মাসাধিককাল পরে কলিকাতায়

প্রত্যাবর্তন, মাদ্রাজে নানাস্থানে বক্তৃতা ও গীতাভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা।

১৯৩৫—বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডক্টর উপাধি প্রদান, এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট ভাষণ, লাহোর লখ্নৌ হইয়া প্রত্যাবর্তন। শান্তিনিকেতনে শ্যামলী নামক নবনির্মিত মৃন্ময় গৃহে কবির বাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কবিসম্বর্ধনা।

১৯৩৬—চিত্রাঙ্গদা অভিনয়গোষ্ঠী লইয়া অর্থসংগ্রহের জন্য ভারতের নানা স্থানে সফর। দিল্লি পৌরসভা কর্তৃক কবিসম্বর্ধনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডক্টর উপাধিদান।

১৯৩৭—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাঙলায় ভাষণপ্রদান। যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থার সভাপতিপদ গ্রহণ। শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি ও আলমোড়ায় বিশ্রামগ্রহণ। আন্দামানের রাজবন্দীদের উপর সরকারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদসভায় সভাপতিত্ব। উত্তরায়ণে আকস্মিক অসুস্থতা ও কয়েক দিনের জন্য সংজ্ঞালোপ।

১৯৩৮—বিশ্বের বিভিন্ন মনীষীর শান্তিনিকেতন পরিদর্শন। রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা। বেশ কিছুদিন মংপুতে বিশ্রাম গ্রহণ। ইউরোপ ও জাপানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রমবর্ধমান যুদ্ধায়োজনে কবির উদ্বেগ।

১৯৩৯—পুরীভ্রমণ। মংপুতে গ্রীষ্মযাপন। সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগিতায় মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের উদ্বোধন।

১৯৪০—শান্তিকুঞ্জে গান্ধীজীর সম্বর্ধনা, অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবি[জীর] ডক্টর উপাধিদান। কবির জীবৎকালে শান্তিনিকেতনে শেষ বর্ষা-উৎ কালিম্পঙে থাকাকালীন গুরুতর পীড়া ও অসুস্থ কবিকে কলিক আনয়ন, দুই মাস পীড়ার পর শান্তিনিকেতন প্রত্যাবর্তন।

১৯৪১—নববর্ষ উৎসবে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ রচনা। ত্রিপুরা সমাগত কর্তৃক ভারতভাস্কর উপাধি প্রদান। শারীরিক অবস্থার অবনতি কলিকাতায় আনয়ন। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ ইংরাজি ৭ অগস্ট দ্বিপ্র[হরে] জোড়াসাঁকোয় কবির জীবনাবসান।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সংকলিত রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী হইতে এই ঘটনাবলীর তালিকা প্রণয়[নে] সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী

বিকাহিনী—প্রথম মুদ্রিত আখ্যানকাব্য ১৮৭৮ (১২৮৫)
নফুল—আখ্যানকাব্য ১৮৮০ (১২৮৬)
াল্মীকি-প্রতিভা—গীতিনাট্য ১৮৮১ (১২৮৭)
দ্রচণ্ড—আখ্যানকাব্য ১৮৮১ (১২৮৭)
গ্নহৃদয়—নাট্যকাব্য ১৮৮১ (১২৮৮)
রোপ-প্রবাসীর পত্র—১৮৮১ (১২৮৮)
ন্ধ্যাসংগীত—কাব্য ১৮৮২ (১২৮৮)
ালমৃগয়া—গীতিনাট্য ১৮৮২ (১২৮৯)
ঠাকুরানীর হাট—উপন্যাস ১৮৮৩ (১২৯০)
ভাতসংগীত—কাব্য ১৮৮৩ (১২৯০)
বিধ প্রসঙ্গ—প্রবন্ধ ১৮৮৩-৮৪ (১২৯০)
ব ও গান—কাব্য ১৮৮৪ (১২৯০)
কৃতির প্রতিশোধ—নাট্যকাব্য ১৮৮৪ (১২৯১)
লনী—গদ্যনাট্য ১৮৮৪ (১২৯১)
শবসংগীত—কাব্য ১৮৮৪ (১২৯১)
নুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—১৮৮৪ (১২৯১)
লোচনা—প্রবন্ধ ১৮৮৫ (১২৯২)
বিচ্ছায়া—সংগীত-সংকলন ১৮৮৫ (১২৯২)
ড় ও কোমল—কাব্য ১৮৮৬ (১২৯৩)
জর্ষি—উপন্যাস ১৮৮৭ (১২৯৩)
িপত্র—পত্রাকারে প্রবন্ধ ১৮৮৭ (১২৯৪)
লোচনা—প্রবন্ধ ১৮৮৮ (১২৯৪)
ার খেলা—গীতিনাট্য ১৮৮৮ (১২৯৪)
া ও রানী—নাট্যকাব্য ১৮৮৯ (১২৯৪)
র্জন—নাট্যকাব্য ১৮৯০ (১২৯৭)
-অভিষেক—প্রবন্ধ ১৮৯০ (১২৯৭)
সী—কাব্য ১৮৯০ (১২৯৭)
প-যাত্রীর ডায়ারি ১ম—ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৮৯১ (১২৯৮)
াঙ্গদা—নাট্যকাব্য ১৮৯২ (১২৯৯)

গোড়ায় গলদ—প্রহসন ১৮৯২ (১২৯৯)

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি ২য়—ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৮৯৩ (১৩০০)

বিদায়-অভিশাপ—নাট্যকাব্য ১৮৯৪ (১৩০০)

সোনার তরী—কাব্য ১৮৯৪ (১৩০০)

ছোটগল্প
বিচিত্রগল্প
কথা-চতুষ্টয়
গল্পদশক } ছোটগল্প-সংকলন ১৮৯৩-৯৬ (১৩০০-১৩০২)

চিত্রা—কাব্য ১৮৯৬ (১৩০২)

চৈতালি—কাব্য ১৮৯৬ (১৩০৩)

মালিনী—নাট্যকাব্য ১৮৯৬ (১৩০৩)

বৈকুণ্ঠের খাতা—প্রহসন ১৮৯৭ (১৩০৩)

পঞ্চভূত—প্রবন্ধ ১৮৯৭ (১৩০৪)

কণিকা—ক্ষুদ্র কবিতা ১৮৯৯ (১৩০৬)

কথা
কাহিনী } —কাব্য ১৯০০ (১৩০৬)

উপনিষদ ব্রহ্ম—প্রবন্ধ ১৯০০ (১৩০৭)

কল্পনা—কাব্য ১৯০০ (১৩০৭)

ক্ষণিকা—কাব্য ১৯০০ (১৩০৭)

গল্পগুচ্ছ—ছোটগল্প-সংকলন ১৯০০-০১ (১৩০৭)

ব্রহ্মমন্ত্র—প্রবন্ধ ১৯০১ (১৩০৮)

নৈবেদ্য—কাব্য ১৯০১ (১৩০৮)

স্মরণ—কাব্য ১৯০২ (১৩০৯)

চোখের বালি—উপন্যাস ১৯০৩ (১৩০৯)

আত্মশক্তি ও ভারতবর্ষ—প্রবন্ধ ১৯০৫-০৬ (১৩১২)

স্বদেশ—কাব্য ১৯০৫-০৬ (১৩১২)

বাউল—গান ১৯০৫-০৬ (১৩১২)

খেয়া—কাব্য ১৯০৬ (১৩১৩)

নৌকাডুবি—উপন্যাস ১৯০৬ (১৩১৩)

বিচিত্র প্রবন্ধ, চারিত্রপূজা, প্রাচীনসাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য,

আধুনিক সাহিত্য—প্রবন্ধ ১৯০৭ (১৩১৪)

হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক—প্রহসন ১৯০৭ (১৩১৪)

প্রজাপতির নির্বন্ধ—উপন্যাস ১৯০৮ (১৩১৪)

রাজাপ্রজা, সমূহ, স্বদেশ, সমাজ, শিক্ষা, শব্দতত্ত্ব ও ধর্ম—প্রবন্ধ ১৯০৮-০৯ (১৩১৫)

কথা ও কাহিনী—কাব্য ১৯০৮-০৯ (১৩১৫)

মুকুট ও শারদোৎসব—নাটক ১৯০৮ (১৩১৫)

শান্তিনিকেতন ১ম-৩য়, বিদ্যাসাগর চরিত্র—প্রবন্ধ ১৯০৯-১০ (১৩১৬)

প্রায়শ্চিত্ত—নাটক ১৯০৯ (১৩১৬)

চয়নিকা—কাব্যসংকলন ১৯০৯-১০ (১৩১৬)

শিশু—কাব্য ১৯০৯ (১৩১৬)

গোরা—উপন্যাস ১৯১০ (১৩১৬)

গীতাঞ্জলি—কাব্য ১৯১০-১১ (১৩১৭)

রাজা—নাটক ১৯১০ (১৩১৭)

শান্তিনিকেতন ৪র্থ-১০ম—প্রবন্ধ ১৯১০ (১৩১৭)

আটটি গল্প ও গল্প-চারিটি—ছোটগল্প-সংকলন ১৯১১-১২ (১৩১৮)

ডাকঘর—নাটক ১৯১২ (১৩১৮)

জীবনস্মৃতি—আত্মস্মৃতি ১৯১২ (১৩১৯)

ছিন্নপত্র—পত্রসাহিত্য ১৯১২ (১৩১৯)

অচলায়তন—নাটক ১৯১২ (১৩১৯)

উৎসর্গ—কাব্য ১৯১৪ (১৩২১)

গীতিমাল্য ও গীতালি—কাব্য ১৯১৪ (১৩২১)

শান্তিনিকেতন—প্রবন্ধভাষণ ১৯১৫-১৬ (১৩২২)

ফাল্গুনী—নাটক ১৯১৬ (১৩২২)

ঘরে বাইরে ও চতুরঙ্গ—উপন্যাস ১৯১৬ (১৩২৩)

সঞ্চয় ও পরিচয়—প্রবন্ধ ১৯১৬ (১৩২৩)

বলাকা—কাব্য ১৯১৬ (১৩২৩)

গল্পসপ্তক—ছোটগল্প-সংকলন ১৯১৬ (১৩২৩)

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—প্রবন্ধ ১৯১৭ (১৩২৪)

গুরু—নাটক ১৯১৮ (১৩২৪)

পলাতকা—কাব্য ১৯১৮ (১৩২৫)

জাপান-যাত্রী—ভ্রমণ ১৯১৯ (১৩২৬)

অরূপরতন—নাটক ১৯২০ (১৩২৬)

ঋণশোধ—নাটক ১৯২১ (১৩২৮)

মুক্তধারা—নাটক ১৯২২-২৩ (১৩২৯)

লিপিকা—গদ্যকথিকা ১৯২২ (১৩২৯)

শিশু ভোলানাথ—কাব্য ১৯২২ (১৩২৯)

বসন্ত—গীতিনাট্য ১৯২৩ (১৩২৯)

পূরবী—কাব্য ১৯২৫ (১৩৩২)

গৃহপ্রবেশ—নাটক ১৯২৫ (১৩৩২)

প্রবাহিণী—গানের সংকলন ১৯২৫-২৬ (১৩৩২)

চিরকুমার সভা—নাটক ১৯২৬ (১৩৩২)

শেষবর্ষণ—গীতিনাট্য ১৯২৬ (১৩৩৩)

রক্তকরবী, শোধবোধ ও নটীর পূজা—নাটক ১৯২৬ (১৩৩৩)

লেখন—ক্ষুদ্র কবিতা ১৯২৭ (১৩৩৪)

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা—গীতিনাট্য ১৯২৭ (১৩৩৪)

শেষরক্ষা—প্রহসন ১৯২৮ (১৩৩৫)

যাত্রী—ভ্রমণ ১৯২৯ (১৩৩৬)

পরিত্রাণ ও তপতী—নাটক ১৯২৯ (১৩৩৫-৩৬)

যোগাযোগ—উপন্যাস ১৯২৯ (১৩৩৬)

শেষের কবিতা—উপন্যাস ১৩২৯ (১৩৩৬)

মহুয়া—কাব্য ১৯২৯ (১৩৩৬)

ভানুসিংহের পত্রাবলী—পত্র ১৯২৯ (১৩৩৬)

নবীন—গীতিনাট্য ১৯৩১ (১৩৩৭)

রাশিয়ার চিঠি—ভ্রমণ ১৯৩১ (১৩৩৮)

বনবাণী—কাব্য ১৯৩১ (১৩৩৮)

গীতবিতান—গীতসংকলন ১৯৩১ (১৩৩৮)

শাপমোচন—গীতিনাট্য ১৯৩১ (১৩৩৮)

সঞ্চয়িতা—কাব্যসংকলন ১৯৩১ (১৩৩৮)
পরিশেষ—কাব্য ১৯৩২ (১৩৩৯)
কালের যাত্রা—নাটক ১৯৩২ (১৩৩৯)
পুনশ্চ—কাব্য ১৯৩২ (১৩৩৯)
দুইবোন—উপন্যাস ১৯৩৩ (১৩৩৯)
মানুষের ধর্ম—প্রবন্ধ ১৯৩৩ (১৩৪০)
বিচিত্রিতা—কাব্য ১৯৩৩ (১৩৪০)
চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, বাঁশরী—নাটক ১৯৩৩ (১৩৪০)
ভারতপথিক রামমোহন রায়—প্রবন্ধ ১৯৩৩-৩৪ (১৩৪০)
মালঞ্চ—উপন্যাস ১৯৩৪ (১৩৪০)
শ্রাবণগাথা—গীতিনাট্য ১৯৩৪ (১৩৪১)
চার অধ্যায়—উপন্যাস ১৯৩৪ (১৩৪১)
শেষ সপ্তক—কাব্য ১৯৩৫ (১৩৪২)
সুর ও সংগতি—পত্রপ্রবন্ধ ১৯৩৫ (১৩৪২)
বীথিকা—কাব্য ১৯৩৫ (১৩৪২)
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা—নৃত্যনাট্য ১৯৩৬ (১৩৪২)
পত্রপুট—কাব্য ১৯৩৬ (১৩৪৩)
ছন্দ—প্রবন্ধ ১৯৩৬ (১৩৪৩)
জাপানে-পারস্যে—ভ্রমণ ১৯৩৬ (১৩৪৩)
শ্যামলী—কাব্য ১৯৩৬ (১৩৪৩)
সাহিত্যের পথে—প্রবন্ধ ১৯৩৬ (১৩৪৩)
খাপছাড়া—ছড়া ১৯৩৭ (১৩৪৩)
কালান্তর—প্রবন্ধ ১৯৩৭ (১৩৪৪)
সে—গল্প ১৯৩৭ (১৩৪৪)
ছড়ার ছবি—কাব্য ১৯৩৭ (১৩৪৪)
বিশ্বপরিচয়—প্রবন্ধ ১৯৩৭ (১৩৪৪)
প্রান্তিক—কাব্য ১৯৩৮ (১৩৪৪)
চণ্ডালিকা—নৃত্যনাট্য ১৯৩৮ (১৩৪৪)
পথে ও পথের প্রান্তে—ভ্রমণ ১৯৩৮ (১৩৪৫)

প্রহাসিনী ও সেঁজুতি—কাব্য ১৯৩৮-৩৯ (১৩৪৫)

বাঙলাভাষা-পরিচয়—প্রবন্ধ ১৯৩৮ (:৩৪৫)

আকাশপ্রদীপ—কাব্য ১৯৩৯ (১৩৪৬)

শ্যামা—নৃত্যনাট্য ১৯৩৯ (১৩৪৬)

পথের সঞ্চয়—ভ্রমণ ১৯৩৯ (১৩৪৬)

নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়—কাব্য ১৯৪০ (১৩৪৭)

আরোগ্য—কাব্য ১৯৪১ (১৩৪৭)

ছেলেবেলা—আত্মস্মৃতি ১৯৪০ (১৩৪৭)

তিনসঙ্গী—ছোটগল্প ১৯৪০ (১৩৪৭)

জন্মদিনে—কাব্য ১৯৪১ (১৩৪৮)

গল্পসল্প—গল্প ১৯৪১ (১৩৪৮)

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, সভ্যতার সংকট—প্রবন্ধ ১৯৪১ (১৩৪৮)

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত

শেষলেখা—কাব্য ১৯৪১ (১৩৪৮)

ছড়া—ছড়া ১৯৪১ (১৩৪৮)

স্মৃতি—পত্র ১৯৪১ (১৩৪৮)

চিঠিপত্র ১ম, ২য়, ৩য়—১৯৪২ (১৩৪৯)

আত্মপরিচয়—প্রবন্ধ ১৯৪৩ (১৩৫০)

সাহিত্যের স্বরূপ ১৯৪৩ (১৩৫০)

চিঠিপত্র ৪র্থ—১৯৪৩ (১৩৫০)

স্ফুলিঙ্গ—ক্ষুদ্র কবিতা ১৯৪৫ (১৩৫২)

চিঠিপত্র ৫ম—১৯৪৫ (১৩৫২)

মহাত্মা গান্ধী—প্রবন্ধ ১৯৪৮ (১৩৫৪)

মুক্তির উপায়—নাটক ১৯৪৮ (১৩৫৪)

গীতবিতান ৩য়—সংগীত-সংকলন ১৯৫০ (১৩৫৭)

বিশ্বভারতী—প্রবন্ধ ১৯৫১ (১৩৫৮)

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম—প্রবন্ধ ১৯৫১ (১৩৫৮)

বৈকালী—গান ও কবিতা ১৯৫১ (১৩৫৮)
সমবায় নীতি—প্রবন্ধ ১৯৫৪ (১৩৬০)
চিত্র-বিচিত্র—কাব্য ১৯৫৪ (১৩৬১)
ইতিহাস—প্রবন্ধ ১৯৫৫ (১৩৬২)
বুদ্ধদেব—প্রবন্ধ ১৯৫৬ (১৩৬৩)
চিঠিপত্র ৬ষ্ঠ – ১৯৫৭ (১৩৬৪)
খৃস্ট—প্রবন্ধ ১৯৫৯ (১৩৬৬)
চিঠিপত্র ৭ম—১৯৬১ (১৩৬৭)
বিচিত্রা—রচনাসংকলন ১৯৬১ (১৩৬৮)
দীপিকা—রচনাসংকলন ১৯৬৩ (১৩৭০)
চিঠিপত্র ৮ম—১৯৬৩ (১৩৭০)
চিঠিপত্র ৯ম—১৯৬৪ (১৩৭১)
রূপান্তর—অনুবাদ কবিতা ১৯৬৫ (১৩৭২)
সংগীতচিন্তা—প্রবন্ধ ১৯৬৬ (১৩৭৩)

বিষয়-নির্বিশেষে প্রথম প্রকাশের কাল-অনুক্রমে তালিকাবদ্ধ এ গ্রন্থপঞ্জীতে পুনর্মুদ্রণের সময়ে পরিবর্তিত, পূর্বে খণ্ড খণ্ড আকারে কিন্তু প একত্রে সংকলিত বা একাধিক গ্রন্থের সংযোজনে নূতন নামে সৃষ্ট কোনে গ্রন্থ ধরা হয় নাই। ছোটখাট মুদ্রিত ভাষণ ইত্যাদিও যথাসম্ভব বাদ দেও হইয়াছে। এই তালিকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী ১৫শ খণ্ড ২৪১—২৫২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 'রবীন্দ্রনাথ-রচিত গ্রন্থের তালিকা' সাহায্যে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রজীবনী এবং বিশ্বভারত প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়াংশ অবলম্বনে প্রণীত।

শব্দসূচী